ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স
কলিকাতা ৯
১৯৮৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের নৃতত্ত্ববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক

স্বর্গত বন্ধুবর তারকচন্দ্র দাস

স্মরণে

পরিষদের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ১৫ই অগষ্ট ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল ভারতীয়দের হাতে। সারা বিশ্বে ঘোষিত হল ভারতের স্বাধীনতার কথা। ভারতের মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল কর্মের উন্মাদনা। এই উন্মাদনাকে সঠিকপথে চালিত করতে হলে, ভারতের সীমিত সম্পদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে চাই বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা। আবার পরিকল্পনাগুলিকে যথোচিত বাস্তবায়িত করতে হলে চাই গ্রামে-গঞ্জে শহরে প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা। বিজ্ঞান সচেতনতাই মানুষকে করে তোলে যুক্তিবাদী, অন্ধসংস্কার বিরোধী। সর্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে শুধু এই কথাগুলি অনুধাবন করেননি, তাঁর দূরদৃষ্টি চিন্তাধারাকে রূপায়িত করার জন্যে তরুণ ও প্রবীণ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগীদের নিয়ে স্থাপিত করেন **বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ** ১৯৪৮ সালে। এই বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সহজ সরলভাবে বিজ্ঞানের কথাগুলিকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানালেন মাতৃভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করতে। তাঁর আহ্বানের ফসল এই পুস্তিকা। আচার্য বসু তাঁর জীবিতকালে পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই পুস্তকটি প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় ও অর্থাভাবে বহুদিন পরিষদের জনপ্রিয় পুস্তকগুলি অপ্রকাশিত থাকে। এই সংকটকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করে একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করছে বলে আমরা মনে করি। আশা করব পরিষদ ও পর্ষদের উদ্দেশ্য পুস্তকগুলির বহুল প্রচারের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতবর্ষকে অঞ্চল হিসাবে ভাগ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের পরস্পরের নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে। কিছু ঐতিহাসিক পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়ের ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন যুগে বিদেশে, প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে, ভারতবাসীর কর্মোদ্যমের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী, অর্থাৎ আকামেনী যুগের ইরাণের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংযোগ ঘটিবার সময় হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে বৈদেশিক আগন্তুকগণের কথা কিছু বলা হইয়াছে।

গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইগুলি সংশোধন এবং বহু নূতন উপকরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইল।

এই গ্রন্থ রচনায় যে সকল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, গেজেটিয়ার-লেখক এবং প্রবন্ধকারের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পরিশিষ্টে ইঁহাদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

৭১, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

॥ ১ ॥

উপক্রমণিকা

ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা

ভারতবর্ষে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের দুইটি বিভাগ আছে, ফিজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি এবং সোশাল ও কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি। প্রথম বিভাগের কাজ জাতিতত্ত্ব ও জাতিসংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয় বিভাগের কাজ সমাজ ব্যবস্থা এবং কৃষ্টিতত্ত্ব ও কৃষ্টি সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা। ভারতবর্ষে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানেব গবেষণার কাজ আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাব বয়েল এশিযাটিক সোসাইটির চেষ্টায় এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যর উইলিযাম জোন্সের উৎসাহে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেরণায় যে গবেষণা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, তাহার প্রথম ফল কর্ণেল ড্যালটনের *Descriptive Ethnology of Bengal* (১৮৭১)। ইহার পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে Anthropological Society স্থাপিত হয়। ড্যালটনের গ্রন্থ এবং তাহার পরে প্রকাশিত সার ডেনজিল ইবেটসন, সাব উইলিযাম ক্রুক ও সার হারবার্ট রিজ্‌লের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের (Tribes and Castes of Bengal) আলোচ্য বিষয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত। এই সকল গ্রন্থে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী, বিশেষ করিয়া অনুন্নত শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রথা, বিধি-নিষেধ, কিংবদন্তী, রূপকথা, ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইবেটসন, ক্রুক ও রিজ্‌লের পরে মধ্য ভারত, দক্ষিণ ভারত ও আসামের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডাগোষ্ঠীর কতকগুলি জাতি সম্বন্ধে রাঁচীর শরৎচন্দ্র রায়ের গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

অনেকে হয়ত জানেন না যে, এই কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতির প্রয়োজন ও প্রেরণা হইতে। অধীন, অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীদিগের জীবনের সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা শাসকজাতিগুলির পক্ষে প্রয়োজন, যাহাতে তাহাদের সামাজিক জীবনের ব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া ও অহেতুক বিরোধের সৃষ্টি না করিয়া সহানুভূতির সঙ্গে শাসনকার্য নির্বিঘ্নে চালাইতে পারা যায়। Colonial Administration-এর এই প্রযোজন মিটাইবার জন্য এশিয়া, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, পলিনেশিয়া ও মেলানেশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত মনুষ্যগোষ্ঠী সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ (প্রধানতঃ সাম্রাজ্যভোগী জাতিগুলির) বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানতঃ ঐরূপ প্রেরণা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের Castes and Tribes সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ইংরেজেরা যে সেই সকল গ্রন্থ রচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ইহার তাৎপর্য এই যে, শাসনকার্যের সুবিধা করা এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু গোড়ায় উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের অনেকে যে সকল প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসার ভাগ দিতে বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে এদেশবাসীরা কৃপণতা করেন নাই।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের প্রথম বিভাগের (Physical Anthropology) কাজও আরম্ভ হয় স্যর হারবার্ট রিজ্‌লের হাতে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় সেন্সাস কমিশনার নিযুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার রিপোর্টের শেষে যে Ethnographic Appendix জুড়িয়া দেন, তাহাই *The people of India* নামে পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯০৮)। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্ব ও তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে তাঁহার সংগৃহীত তথ্য ও নিজস্ব মতামত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই প্রথম প্রামাণ্য বিবরণ।

তাহার পরে এই বিভাগের কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। এই কাজে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ, ইটালীয়ান, আমেরিকান ও ভারতীয় পণ্ডিত আছেন। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের

উভয় বিভাগের কাজে ভারতীয় পণ্ডিতগণেব মধ্যে রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র রায়, অনন্তকৃষ্ণ আয়ার, ডাঃ বিবজা গুহ, ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠীর সম্বন্ধে আলোচনায অগ্রসর হইবার পূর্বে নৃ-বিজ্ঞানের কাজের প্রণালীর একটু ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পাবে।

জাতিসংমিশ্রণ নির্ণয়ে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের কাজের প্রণালী

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ কতকগুলি নির্বাচিত দৈহিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করিয়াছেন। এই সকল লক্ষণ হইল—মস্তকের আকৃতি বা গঠন, নাসিকার গঠন, মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশেব গঠন, কেশের রং ও প্রকৃতি, চক্ষুর রং ও গঠন, গাত্রবর্ণ, দেহের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। গাত্রবর্ণ, কেশের প্রকৃতি, মস্তকের গঠন, চক্ষুর গঠন—এই প্রধান কয়েকটি লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া সাধারণতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী মানব সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। গাত্রবর্ণ শাদা (Leucodermic), পীত (Xanthodermic), কালো (Melanodermic) বা ইহাদের মধ্যবর্তী কোন বর্ণের হইতে পারে। মস্তকের গঠন লম্বা (Dolichocephalic), গোল (Brachyocephalic) বা মধ্যমাকৃতির (Mesocephalic) হইতে পারে। কেশের বৈশিষ্ট্য তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—সরল কেশ (Leitrichy), মসৃণ, কুঞ্চিত বা ঢেউখেলানো (Cymotrichy) এবং পশমের মত (Wooly, Ulotrichy)।

পশমের মত চুল সাধারণতঃ দেখা যায় আন্দামান, মালয়, পূর্ব সুমাত্রার কতকগুলি গোষ্ঠী ও নিউগিনির তাপিরোদের মধ্যে। ইহাদিগকে নেগ্রিটো বলা হয়। আফ্রিকার নিরক্ষ অঞ্চলের অরণ্যের নেগ্রিলো, কালাহারি মরুভূমির বুশম্যান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হোটেনটটদের মধ্যে পশমের মত চুল দেখা যায়। আফ্রিকার নেগ্রিটান, নিলোট এবং নিগ্রোলয়েডগণের চুল ঐরূপ।

নাসিকার গঠন চেপ্টা (Platyrrhine), মধ্যমাকৃতির (Mesorrhine), সরল ও উন্নত (Leptorrhine) হইতে পারে। শ্বেতকায় গোষ্ঠীরা লেপ্টোরাইন, পীতকায় গোষ্ঠীরা মেসোরাইন এবং কৃষ্ণকায় গোষ্ঠীরা প্ল্যাটিরাইন।

চক্ষুর গঠন মোটামুটি সরল (Horizontal and more or less full),

বাদামের মত আকৃতির (Almond-shaped) এবং তির্যক আকৃতির ("Mongolian eye") হইতে পারে। চক্ষুতারকার বর্ণ ধূসর, বাদামি বা কালো হইতে পারে।

তাহার পরের কাজের প্রণালীর ব্যাখ্যা করা হইতেছে। দেহের দৈর্ঘ্য, মস্তক, নাসিকা, মুখমণ্ডল প্রভৃতির নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের নির্দিষ্ট সূত্রমতে মাপ ও গাত্রবর্ণ, চক্ষু, কেশ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের দৈহিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার ফলের মধ্যে মোটামুটি যে সকল মিল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলিকে সাধারণ মানরূপে ব্যবহার করিয়া সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে মূল বা প্রধান টাইপ স্থির করা হয়। এই সাধারণ মান হইতে ব্যতিক্রমগুলি সংমিশ্রণের ফল বলিয়া অনুমান করা হয় এবং লক্ষণগুলি মিলাইয়া পার্শ্ববর্তী বা দূরবর্তী কোন্ টাইপের সঙ্গে সংমিশ্রণ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর এই যে কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হইল, এই কার্যক্রম সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিবার আছে। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী যে প্রণালীতে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করেন, সে প্রণালী কোন জীবিত মনুষ্যের বেলায় খাটে। এখন প্রশ্ন উঠে, মৃত মনুষ্যের বেলায় ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনুষ্যের বেলায় এই প্রণালী কি করিয়া অনুসরণ করা যাইতে পারে? ভারতবর্ষীয় জাতি প্রাগৈতিহাসিক যুগে গঠিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের বিশেষ সার্থকতা আছে। মৃত ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনুষ্যের বেলায় মাত্র করোটি বা কঙ্কাল বা কঙ্কালের অংশ লইয়া টাইপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা হয় এবং এই কাজে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীকে বিশেষভাবে প্রত্নজীববিজ্ঞানীর (Palaeontologist) উপর নির্ভর করিতে হয়। এই কথা বলা বাহুল্য যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি পরীক্ষা করিয়া এই টাইপ স্থির করিতে হইলে কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই অনুমান বৈজ্ঞানিক মনোভাবপ্রসূত হইতে পারে, কিন্তু অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ব্যাখ্যা, তাহা কতকটা ব্যক্তিগত মতামত বটে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে যে মূল্য দেওয়া হয়, উহাকে সে মূল্য দেওয়া যায় না।

আর একটা ত্রুটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই ত্রুটি জীবিত মনুষ্যের টাইপ নির্ণয়ের ব্যাপারেও দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সূত্রমতে মাপ ও পর্যবেক্ষণের ফলে সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে টাইপ ও সংমিশ্রণ নির্ণয় করা যায় কি না, এই প্রশ্ন আজকাল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে উঠিয়াছে। এই সন্দেহের কারণ রেশিয়াল টাইপ যে পরিবর্তিত হইতে পারে ও হইতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন, সংমিশ্রণ ইত্যাদির ফলে টাইপ বা জাতির পরিবর্তন হইতেছে। কাজেই পৃথিবীতে কোন অমিশ্র জাতি বা গোষ্ঠী আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী হেডনের মতে "A race type exists only in our minds." টাইপ স্থির করিবার ফরমূলা কষিয়া কোন জাতির যে শ্রেণীবিভাগ (Racial classification) করা হইয়া থাকে তাহার কতটা বিজ্ঞানসম্মত, এই প্রশ্নও আলোচিত হইতেছে। কেহ কেহ Anthropometry-র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

উদ্বেগ প্রকাশ করিবার আর একটা বিশেষ কারণ আছে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছুটা অনুমানের অবসর আছে, এই কথা একটু আগে বলা হইয়াছে। এই অনুমানের উপর ব্যক্তিগত মনোভাবের প্রভাব আসিয়া পড়া অসম্ভব বা আশ্চর্য নহে। সমস্যা এই যে, বৈজ্ঞানিক ঠাট আগাগোড়া বজায় থাকে বলিয়া বৈজ্ঞানিক অনুমান কখন ব্যক্তিগত মতে রূপান্তরিত হয় এবং রূপান্তরের মূলে কি প্রকার উদ্দেশ্য কাজ করে, তাহা ধরিতে সময় লাগে বা ধরা প্রায় অসম্ভব হয়। মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, Racial theory ব্যাখ্যার ব্যাপারে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত নানাভাবে প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার পূর্বে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনায় এই সতর্কতার মাত্রা বাড়াইবার প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সম্পর্কে Racial theory-র অপপ্রয়োগ এবং কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ যে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর দৃষ্টি এড়ায় নাই, তাহা একজন বিদেশী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইতেছে: "Our science has been debased in the interest of false racial theories……Anthropology is regarded with some suspicion in India. There are several reasons for this. The attempt of

certain scholars and politicians to divide the aboriginal tribes from the Hindu Community at the time of the census created the impression that science could be diverted to political and communal ends." (Dr. Verrier Elwin, Presidential address, Section of Anthropology and Archeology, Indian Science Congress, 1944.)

(অনুবাদঃ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানকে ভিত্তিশূন্য রেসিয়াল থিওরী প্রচারের কাজে ব্যবহার করিয়া তাহার সুনাম ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। ইহার কতকগুলি কারণ আছে। লোকগণনার সময়ে কয়েক জন পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ্ আদিবাসীদিগকে হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা করেন, তাহার ফলে এই ধারণার উৎপত্তি হয় যে, বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে)।

সুতরাং ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্বের আলোচনায় সতর্কতার মাত্রা যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে শাদা, কালো, পীত নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এদেশে, এখনও ঘটিতেছে। ঐতিহাসিক যুগে উত্তর-পশ্চিম পর্বতপ্রাকারের মধ্যের পথগুলি দিয়া মধ্য এশিয়া হইতে নানা জাতির নূতন নূতন প্রবাহ আসিয়া ভারতবর্ষের জনসমুদ্রে পড়িয়াছে। উত্তর-পূর্ব হইতে পীত জাতির প্রবাহ এই সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। এই বিশাল জনসমুদ্র যেন একটা বেওয়ারিশ ও অজ্ঞাত দরিয়া। :ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব ও সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচার করা হইয়াছে, সেই সকল মতবাদকে অজ্ঞাত ও বেওয়ারিশ দরিয়ার দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই কথা বলা বাহুল্য যে, এই প্রকার অভিযান ছাড়া অজ্ঞাত দরিয়ার সঙ্গে পরিচিত হইবার সহজ উপায় নাই। কাজেই ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্বের ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়ে এইরূপ অভিযানের কাহিনী পাওয়া যাইবে। এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত, সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছাইতে বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের রেশিয়াল ক্লাসিফিকেসন সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, আমাদিগের পথ নির্দেশ

করিবার জন্য সেই সকল মতবাদের প্রকৃত ভিত্তি কিরূপ, তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এখন ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দেখা যাউক, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা পৃথিবীর মানবসমাজকে দৈহিক লক্ষণ মতে যে সকল প্রধান গোষ্ঠীতে বা রেসে ভাগ করিয়াছেন, পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চল তাহাদের প্রধান বাসভূমি।

এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান নাই, পরবর্তী আলোচনা অনুসরণ করিবার জন্য মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লওয়া দরকার।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানে মানবসমাজকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করিবার অন্য লক্ষণগুলির কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু ত্বকের বর্ণ ধরিয়া ভাগ করিলে কিরূপ চিত্র পাওয়া যায়, দেখা যাইতে পারে।

গাত্রবর্ণ অনুসারে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন; যথা—শ্বেত (Leucodermic), পীত (Xanthodermic) ও কৃষ্ণ (Melanodermic)। এই তিনটি শ্রেণী ছাড়া মিশ্রবর্ণের মানুষের সংখ্যা কম নহে। মিশ্রবর্ণের উৎপত্তির কারণ ভিন্ন, গাত্রবর্ণের দুইটি বা ততোধিক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইতে পারে, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকের দরুণ মূলবর্ণের ক্রমিক পরিবর্তন হইতে পারে। মানুষের গাত্রবর্ণ প্রথমাবধি শাদা, কালো, পীত প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের ছিল অথবা উহা প্রথমে এক রকমের ছিল এবং আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে গাত্রচর্মের নিম্নের কোষসমূহের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে, ইহা লইয়া অনেক আলোচনা চলিয়াছে ও চলিতেছে এবং অনেক প্রকার মতবাদের প্রচার হইয়াছে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে শারীরবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইবে। আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক ইত্যাদির প্রভাবে ত্বকের রঙের পরিবর্তন হয়, ইহা মানিয়া লইলে সংমিশ্রণ ছাড়াও যে মানুষের গাত্রবর্ণের পরিবর্তন হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে গাত্রবর্ণ অনুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করিবার ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা, এই প্রশ্ন উঠে। সে যাহা হউক, মনে রাখা আবশ্যক যে, গাত্রবর্ণ অনুসারে মনুষ্যগোষ্ঠীর যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়, তাহার অর্থ এই নহে যে, এক প্রকার গাত্রবর্ণের পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অধিবাসী এক জাতি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীভুক্ত।

কৃষ্ণ, পীত, শ্বেতকায় গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীগুলির বাসভূমি

কৃষ্ণকায় (Melanodermic) গোষ্ঠী

ভাবতবর্ষে ক'। পবে বলা হইবে। ভাবতবর্ষ বাদে কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যগোষ্ঠী দেখিতে পাওযা যায প্রধানতঃ ভাবতবর্ষেব দক্ষিণে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। পূর্ব দিকে আবও অগ্রসব হইলে পূবভাবতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা দ্বীপময ভাবত, মালয উপদ্বীপ, ফিলিপাইন দ্বাপপুঞ্জ, মাইক্রোনেশিযা, নিউগিনি, মেলানেশিযা নামে পবিচিত পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগবীয দ্বীপগুলিতে এবং অষ্ট্রেলিযায। নিউজিল্যাণ্ড ও তাসমেনিযাব আদিবাসীবা এই গোষ্ঠীভুক্ত। নীলনদেব উপত্যকাব উত্তব অঞ্চল, সাহাবা মরুভূমিব দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকাব বিস্তৃত অঞ্চল কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যগোষ্ঠীব বাসভূমি। আফ্রিকাব কৃষ্ণবর্ণেব জাতিগুলিব মধ্যে পড়ে নিগ্রো, নিগ্রোযেট নিলোট, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকাব বাণ্ট, ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলি। দেখা যাইতেছে যে, ভাবতবর্ষেব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগব এবং ভাবত মহাসাগবেব দ্বীপসমূহ দক্ষিণ-পূবে মধ্য ও দক্ষিণ মালয়, পূর্বভাবতীয় দ্বীপপুঞ্জেব সুমাত্রা ও আবও পূর্বে নিউগিনি, অষ্ট্রেলিযা ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগবেব কতকগুলি দ্বীপ পর্যন্ত কৃষ্ণবর্ণেব মনুষ্যগোষ্ঠীব অঞ্চলগুলি অবস্থিত। পূর্ব দিকে এই অঞ্চল মেলানেশিযা পর্যন্ত গিযাছে। ভাবতবর্ষেব পশ্চিমে এই অঞ্চল আফ্রিকাব গিনি উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রশ্ন উঠে, বহুদূবব্যাপী ও বিচ্ছিন্নভাবে এই দ্বীপগুলিতে উহাবা কোথা হইতে আসিয়াছিল? এই বিষযে সন্দেহ নাই যে, কোন না কোন প্রধান ভূভাগ হইতে সরিযা আসিয়া ইহারা এই সকল অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখা যায, পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি ও মেলানেশিয়া লইযা কৃষ্ণবর্ণেব মনুষ্যগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি অঞ্চল ও পশ্চিমে আফ্রিকা আব একটি প্রধান অঞ্চল। ইহা হইতে অনুমান কবা যাইতে পারে যে, হয়ত এই দুইটি প্রধান ভূভাগই উহাদেব আদি বাসভূমি ছিল। এই অনুমানেব অন্য কোন ভিত্তি আছে কিনা, পরে দেখা যাইবে।

পীতকায় (Xanthodermic) গোষ্ঠী

পীত, পীতাভকায় এবং সবলকেশ মনুষ্যগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল বহু বিস্তৃত। এশিয়ার একটি বৃহৎ মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে পীত ও পীতাভ রং এবং সরল কেশের সঙ্গে আরও কতকগুলি দৈহিক লক্ষণ এক সঙ্গে দেখা যায়। এই সকল লক্ষণকে

মোঙ্গলীয় লক্ষণ (Mongolian characters) বলা হয়। এই সকল বিশিষ্ট লক্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মুখমণ্ডলের গঠন, চোখের গঠন, নাসিকার গঠন ও কেশ। ইহাদের চুল কালো ও সবল, মুখে ও গায়ে চুল কম, গণ্ডাস্থি উচ্চ, মুখের গঠন চ্যাপ্টা, নাকের গোড়া নীচু, মধ্যভাগ মোটা ও চওড়া, নাকের পাটা চওড়া, চোখ টেরছা (Oblique) এবং চোখের পাতার উপর একটি চামড়ায় ভাঁজ থাকে (Epicanthic fold)। প্রকৃত মোঙ্গলগোষ্ঠী গোলমুণ্ড, কিন্তু এমন অনেক গোষ্ঠী আছে, যাহাদের অন্যান্য মোঙ্গলীয় লক্ষণ থাকিলেও মস্তকের গঠন ভিন্ন প্রকারের। সে যাহা হউক, মোটামুটি যাহাদের গাত্রবর্ণ পীত বা পীতের সহিত অন্য বর্ণের মিশ্রণ আছে এবং উপরে বর্ণিত দৈহিক লক্ষণগুলির কোন কোনটি আছে, তাহাদিগকে এক বা সমগোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মানিয়া লইলে দেখা যায় যে, উত্তর এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বাস করিতেছে। কতকগুলি শাখা বহু পূর্বে ইয়ুরোপের নানা অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং কোন কোন শাখা আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কোন কোন স্থানে এই গোষ্ঠীর সমগোষ্ঠীভুক্ত যে সকল জাতি বাস করে তাহাদের কথা পরে বলা হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে উহাদের সমগোষ্ঠীভুক্ত জাতি দেখিতে পাওয়া যায় উত্তরে তিব্বত, উত্তর-পূর্বে চীন, এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ব্রহ্ম, শানদেশ, থাইদেশ, ইন্দোচীনের কাম্বোজ, আনাম, টংকিন প্রভৃতি অঞ্চলে। উত্তর মালয় ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, কোরিয়া ও জাপ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী (আইনু বাদে) এই গোষ্ঠীভুক্ত। মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসী ও ট্রান্সবৈকালিয়ার টুঙ্গুজগণ মোঙ্গল গোষ্ঠীর। তিয়েনসান পর্বতমালার উত্তরে জুঙ্গেরিয়া ও তাহার পূর্বে মঙ্গোলিয়ার কালমুক, তরাঞ্চি তোরগোদ ও তেলেঙ্গেত মোঙ্গল গোষ্ঠীয়। পূর্ব তুর্কীস্থানের হামী তুরফান, অক্সু ইত্যাদি ও তারিম অববাহিকার কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ ইত্যাদির অধিবাসীদিগের মধ্যে কিছু কিছু মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায়।

সাইবেরিয়ায় লেনা নদীর অববাহিকায় ইয়াকুট ও তাতার নামে পরিচিত গোষ্ঠীগুলি, তুর্কীস্থানের কিরগিজ, কাজাক ও উজবেগ, কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের তুর্কম্যান এবং এশিয়া মাইনর ও ইয়ুরোপীয় তুর্কীর তুর্কগণ

বৃহৎ তুর্কী গোষ্ঠীভুক্ত। প্রাচীন উগুজ ও উইগুর জাতি তুর্কী গোষ্ঠীভুক্ত। তুর্কী গোষ্ঠীতে কিছু পরিমাণ মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায়। এই গোষ্ঠীকে আসোনা হুনদিগেব একটি শাখা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই গোষ্ঠীর একটি শাখাকে পেলিয়ার্টিকাস বা উগ্রিয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা অতি প্রাচীন কালে সাইবেরিয়ার পথে ইয়ুবোপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার বিভিন্ন জাতি, স্যামেয়েদ ও লাপ জাতি, আমুর নদ অঞ্চলের গিলিয়াক ও উত্তর শাখালিনের অধিবাসী এই শাখাভুক্ত। পারমিয়াক, মর্দভিন প্রভৃতি শাখা রুশিয়ার অভ্যন্তরে ও লাপগণ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। ফিন, এস্ত, লিভোনীয়ান প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় জাতি এই শাখাভুক্ত।

এই গোষ্ঠীব একটি দলকে দক্ষিণ মোঙ্গলীয় নামে অন্যান্য শাখা হইতে পৃথক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিব্বত, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন ও জাপানের অধিবাসীদিগকে এই দক্ষিণ মোঙ্গলীয় দলভুক্ত বলা হয়। এই দলভুক্ত যে শাখার লোক পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে প্রোটোমালয় বা Oceanic Mongol নামও দেওয়া হয়।

হাওয়াই হইতে নিউজিল্যাণ্ড ও সামোয়া হইতে ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত অঞ্চলকে পলিনেশিয়া বলে। পলিনেশিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে নানা গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে। কেহ কেহ তাহাদিগকে প্রোটোমালয় আবার কেহ কেহ নেসিয়ট (Nesiot) নাম দিয়াছেন এবং এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্বেতকায় মনুষ্যগোষ্ঠীভুক্ত।

আমেরিকার আদি অধিবাসী (Amerind) সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত এইরূপ যে, প্রাচীন কালে বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি গোষ্ঠী উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার পথে আমেরিকার উপকূলভাগে উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। আমেরিকার আদি অধিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি গোষ্ঠী সরলকেশ, পীত বা পীতাভকায়, গোল বা লম্বামুণ্ড, কিন্তু অন্যান্য মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত নহে। তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এশিয়ার একটি মূলগোষ্ঠী হইতে বিভিন্ন শাখা গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই সকল শাখা গোষ্ঠীর একটি মোঙ্গলীয় ও অন্য একটি আমেরিকান। ব্রিটিশ গায়েনার ওয়াবান,

আরওয়াক, ওয়ানিয়ান ক্যারিব জাতিগুলির মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের বাহিরে পূর্বে আসাম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম, শানদেশ, থাইদেশ, ইন্দোচীনে, দক্ষিণ-পূর্বে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর-পূর্বে তিব্বত ও চীন হইতে মোঙ্গলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও জাপান পর্যন্ত মোটামুটি সমগোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন জাতির বাসভূমি অবস্থিত। পামীর পর্বতমালার পূর্বে পূর্বতুর্কীস্থান ও উত্তরে ও পশ্চিমে তুর্কম্যানিস্থান পর্যন্ত তুর্কীগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার বাস। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে উরল পর্বতশ্রেণী হইতে পূর্বে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাইবেরিয়ায় সরলকেশ, পীতাভ রঙের কোন কোন মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায়। বেরিং প্রণালীর অপর কূলে আমেরিকা মহাদেশের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অংশে, ব্রিটিশ গায়েনা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপগুলিতে এই বৃহৎ গোষ্ঠীর সম্পর্কিত বিভিন্ন জাতি প্রবেশ করিয়াছে।

শ্বেতকায় (Leucodermic) গোষ্ঠী

এখন শ্বেতকায় (Leucodermic) মনুষ্যগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা এই গোষ্ঠীভুক্ত, তাহাদের কথা এখানে বলা হইতেছে না।

শ্বেতকায় মনুষ্যগোষ্ঠী বলিতে যাহাদের গায়ের রং শাদা, গোলাপী, কটা, বাদামী বা শ্যাম, যাহাদের চুল ঢেউতোলা বা কুঞ্চিত, চোখ সরল ও সম্পূর্ণ খোলা (Straight and widely open), নাক উচ্চ ও তীক্ষ্ণ (Leptorrhine and prominent), গণ্ডাস্থি উচ্চ নয় এবং যাহাদের মধ্যে কোন প্রকার মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায় না, এইরূপ মনুষ্যগোষ্ঠী বুঝায়। চুলের রং সোনালী, কালো বা বাদামি হইতে পারে, চোখের তারা কালো, ধূসর বা নীল হইতে পারে, মস্তক গোল, লম্বা বা মধ্যমাকৃতি হইতে পারে, কিন্তু মোটামুটি উপরের লক্ষণগুলি যাহাদের মধ্যে দেখা যায়, তাহাদিগকে এই গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়।

হেডনের মতে, শ্বেতকায় (Leucodermic) মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ইয়ুরোপীয় জাতিগুলি এবং তাহাদের বংশধর জাতিগুলি ছাড়া পশ্চিম এশিয়া, উত্তর

আফ্রিকা, পলিনেশিয়ার অধিবাসী, শ্যামবর্ণের (Brown) জাতিসমূহ, হেমাইট, দ্রাবিড়িয়ান ও অধিকাংশ আমেরিণ্ড গোষ্ঠী পড়ে।

আরবের সেমাইটগণ এই গোষ্ঠীভুক্ত। দক্ষিণ আরবের জাতিগুলিকে হিম্যারাইট ও উত্তর আরবের জাতিগুলিকে বেদুইন শাখাভুক্ত বলা হয়। সেমাইট গোষ্ঠী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আরব, ইরাক, হেজাজ, নেজ্দ, ইমেন, ট্রান্সজর্ডান, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেষ্টাইন সেমাইট গোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ। ইহুদী জাতি উত্তর-সেমাইট গোষ্ঠীর একটি প্রাচীন শাখা। অতি প্রাচীন যুগ হইতে এমোরাইট, হিটাইট, ফিলিষ্টাইনদের মধ্যে এই জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকা হইতে আইবেরিয়ান উপদ্বীপের পথে সেমাইটগণ ইয়ুরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।
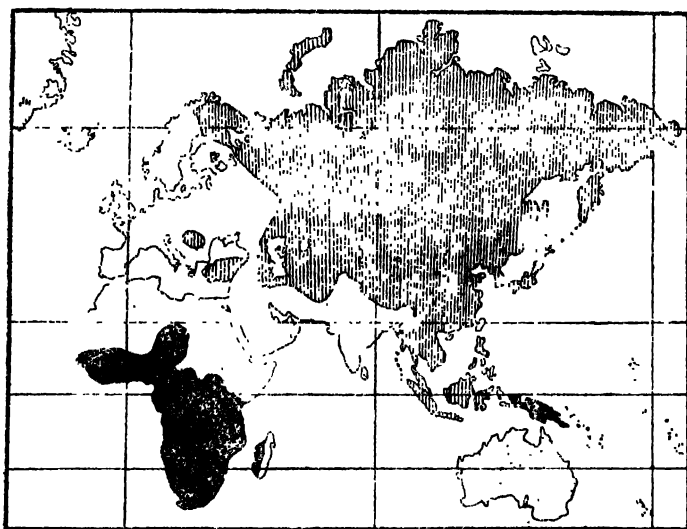
কেশের বৈশিষ্ট্য ও গাত্রবর্ণ অনুসারে বিভক্ত তিনটি মনুষ্যগোষ্ঠীর বাসভূমি

(Dudley Stamp, *The World* হইতে গৃহীত)

আর্মেনিয়া, কুর্দীস্থান, ককেশাসের পূর্ব অঞ্চলের মোঙ্গল-তুর্ক গোষ্ঠীর জাতিগুলি বাদে অন্য কতকগুলি জাতি (জর্জিয়ান বা কার্তালিয়ান গোষ্ঠীর

জাতি, আদিখে বা সিরকাসিয়ান, ওসেট ইত্যাদি) শ্বেতকায় গোষ্ঠীভুক্ত। ইরাণের অধিবাসী এই গোষ্ঠীভুক্ত। ইরাণের অধিবাসী জাতিগুলির মধ্যে আরব ও তুর্কম্যানের সংমিশ্রণে কতকগুলি উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পামীরের কারাতেগিন, সিগনান, বোশান, ওয়াখান প্রভৃতি উপত্যকার অধিবাসীরা এই গোষ্ঠীভুক্ত। ইহারা ইরাণের তাজিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা। বোখারার (এখন তাজিকীস্থান) অধিবাসীদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ তাজিক গোষ্ঠীয়, বাকী অংশ তুর্ক গোষ্ঠীয় উজবেগ শাখা। আফগানীস্তান এবং পশ্চিম ও পূর্ব হিন্দুকুশ পর্বতমালার উপত্যকাগুলির অধিবাসী বিভিন্ন জাতি শ্বেতকায় গোষ্ঠীভুক্ত। ইহার পরে আমরা ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করি।*

* মানব গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীগুলির বিস্তৃতি ও নামকরণ সম্বন্ধে মোটামুটি ডাঃ হেডনের (A. C. Haddon, F.R.S.) অনুসরণ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসী

॥ ২ ॥

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে যে সকল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত নিজেদের অনুসন্ধানের ফলে লব্ধ তথ্য প্রচার করিয়াছেন ডাঃ বিরজা শঙ্কর গুহ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার *Racial Elements in Population* (Oxford University Press, 1944) নামক পুস্তিকায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর (রেশিয়াল টাইপের) মানুষের ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের যে বিবরণ দিয়াছেন, সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বলিয়া সেই বিবরণ অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

ডাঃ গুহের সঙ্কলিত ভারতবর্ষে অনুপ্রবিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীর তালিকাটি এইরূপ:

১। নেগ্রিটো।

২। প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড

৩। মোঙ্গলয়েড

(১) প্যালি মোঙ্গলয়েড

(ক) লম্বামুণ্ড ও

(খ) গোলমুণ্ড টাইপ

(২) তিব্বতী মোঙ্গলয়েড

৪। মেডিটারেনীয়ান—

(১) প্যালি-মেডিটারেনীয়ান

(২) মেডিটারেনীয়ান

(৩) ওরিয়েণ্টাল টাইপ

৫। পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড—

(১) আলিপনয়েড

(২) দিনারিক

(৩) আর্মেনয়েড

৬। নর্ডিক

ডাঃ গুহের এই তালিকা এবং তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন সকল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী তাহা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার বর্ণিত গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর নামগুলিও গ্রহণ করেন নাই। ধারাবাহিক আলোচনার সময়ে উভয় পক্ষের যুক্তিতর্কের উল্লেখ করা হইবে।

নেগ্রিটো গোষ্ঠী

ডাঃ গুহ এবং কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত মনে করেন, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর যে স্তরবিন্যাস দেখা যায় তাহার মধ্যে প্রথম স্তর নেগ্রিটো। তাঁহাদের মত এইরূপ যে, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল নেগ্রিটো গোষ্ঠী। যে ভাবেই হউক ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এই গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নেগ্রিটো গোষ্ঠীর লোক, ডাঃ গুহের এই মত অনেক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রথম আপত্তি, যাহাকে নেগ্রিটো লক্ষণ বলা হয় সেই সকল লক্ষণ সম্বন্ধে। তাঁহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে এই সকল লক্ষণের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নেগ্রিটো ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। এই দলের কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ নাই। কেহ কেহ আবার বলেন, যেটুকু সংমিশ্রণ দেখা যায়, তাহা ভারতবর্ষের বাহিরে নেগ্রিটো অঞ্চল হইতে আসিয়াছে।

এই সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের দুই পক্ষের যুক্তি ও মতের সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে। এই আলোচনার ফলে কিরূপ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব, দেখা যাইবে।*

দক্ষিণ ভারতের অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের কাদার, পুলায়ান প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতির কোন কোন লোকের মধ্যে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর কোন কোন

* দুই পক্ষের প্রমাণ ও যুক্তি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সূত্র মতে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের *Races of India* নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (*Anthropological papers, New Series No. 4, 1935, Calcutta University* দ্রষ্টব্য)।

দৈহিক লক্ষণের সহিত কিছু সাদৃশ্য de Quatrefages, Deniker প্রভৃতির নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর ক্রমে এই মত দানা বাঁধিতে থাকে যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনতম স্তর নেগ্রিটো গোষ্ঠী। Giuffrida-Ruggeri, Huising, Biasutti ও Sergi-র অভিমত মানিয়া লইয়া নেগ্রিটো-বাদের সমর্থনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইঁহাদের পরে বাঙ্গালী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ নূতন করিয়া দক্ষিণ ভারতে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কার করিবার দাবি করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া বলা যায় যে, Giuffrida-Ruggeri-র *First Outlines of Systematic Anthropology of Asia*-র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। ১৯২৮ ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে Nature পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া ডাঃ গুহ বলিতেছেন যে, তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে সর্বপ্রথম কাদার, মলয় প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কৃত হয় ("....disclosed for the first time the presence of a negrito racial strain among these tribes")। আসামের ভূতপূর্ব ডেপুটি কমিশনার ও প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হাটন, ডাঃ গুহের এই দাবি মানিয়া লইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর মানুষের উপস্থিতি ডাঃ গুহ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। শুধু এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও কৃষ্টি, নেগ্রিটো গোষ্ঠীর মানুষের নিকট কি পরিমাণে ঋণী তাহাও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতের পেরাম্বিকুলাম ও আন্নামালাই পর্বত অঞ্চলে কাদার, পুলায়ান প্রভৃতি উপজাতিকে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি লোকের কেশের বৈশিষ্ট্যের (Spirally curved hair) জন্য। ডাঃ হাটন বলেন, দক্ষিণ ভারত ছাড়া আসাম ও ব্রহ্মের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নেগ্রিটোর অনুরূপ কেশবিশিষ্ট (Frizzly hair) লোক অঙ্গমী নাগাদের মধ্যে দেখা যায়। তারপর রাজমহল অঞ্চলে পশমের মত কেশবিশিষ্ট (Wooly hair) এক বাগ্দী আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেগ্রিটো গোষ্ঠীর অন্যান্য দৈহিক লক্ষণের কথা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া শুধু কেশের বৈশিষ্ট্যের জন্য এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের অঙ্গমী নাগা, রাজমহলের বাগ্দী ও দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি উপজাতি নেগ্রিটোগণের বংশধর।

নেগ্রিটো গোষ্ঠীর অন্যান্য দৈহিক লক্ষণ ইহাদের মধ্যে কতখানি দেখা যায়, তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। Sergi ও Biasutti উভয়েই কাদারদিগের মধ্যে পশমের মত চুল, চ্যাপ্টা নাক ও নিগ্রোলক্ষণযুক্ত মুখ দেখিতে পাইয়াছেন। ডাঃ গুহের বর্ণনা ইহাদের বর্ণনার সঙ্গে মিলে না। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদিগকে প্রকৃত নেগ্রিটো বলা হয়। ডাঃ গুহের মত এইরূপ যে কাদারদিগের দৈহিক লক্ষণের সহিত আন্দামানের নেগ্রিটো অপেক্ষা মালয়ের সেমাং ও মেলানেশিয়ার (নিউগিনি) আদিম অধিবাসীদের দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্য বেশী দেখা যায়। ডাঃ হাটন নিজে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তে যে নেগ্রিটো প্রাচীন স্তরের কথা বলা হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের পরিচয় বলা যাইতে পারে। রাজমহলের আবিষ্কারেও কেশের বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তার গুহ, হাটন প্রভৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে, দক্ষিণ ভারত ও আসাম ব্রহ্ম সীমান্তের উল্লিখিত উপজাতিগুলির মধ্যে নেগ্রিটো অপেক্ষা মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এইভাবে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই সংমিশ্রণ কিভাবে আসিল। যাঁহারা নেগ্রিটোবাদের সমর্থন করেন, উল্লিখিত প্রমাণের উপর থিওরী দাঁড় করাইবার জন্য তাঁহাদিগকে বলিতে হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর লোক ছিল আদিম অধিবাসী। বাস্তবিক আসাম ও ব্রহ্মের সীমান্ত অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে ও বঙ্গদেশের সীমান্তে রাজমহল পাহাড়ে আবিষ্কৃত নেগ্রিটো সংমিশ্রণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে এরূপ অনুমান করিতে হয় যে, এক কালে সমগ্র ভারতবর্ষে এই গোষ্ঠীর মানুষ ছড়াইয়া ছিল। ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদের প্রচারে এইভাবে তিনটি পর্যায় দেখা যাইতেছে। প্রথমে শুধু দক্ষিণ ভারতের প্রান্ত সীমায়, তারপর ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলে নেগ্রিটো সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে। শেষ পর্যায়ে দেখা যাইতেছে, নেগ্রিটো গোষ্ঠী ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি, কঙ্কাল প্রভৃতি মনুষ্যদেহের যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এই অনুমান

সমর্থিত হয় না। এই জন্য এই থিওরী সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহ দূর করিতে পারে এরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া নেগ্রিটোবাদের সমর্থনকারী পণ্ডিতগণ অন্য পথে গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, নেগ্রিটো গোষ্ঠী শুধু ভারতবর্ষের নহে, পরন্তু সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদিম অধিবাসী।

এই প্রসঙ্গে Huising-এর অনুসরণ করিয়া Giuffrida-Ruggeri যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদিগের আনুমানিক স্তরবিন্যাস হইতে ভারতবর্ষে নেগ্রিটোর উপস্থিতির সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার মতে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় পড়ে এরূপ দৈহিক লক্ষণযুক্ত (With equatorial characters) আদিম অধিবাসীদের অস্তিত্বের প্রমাণ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। Huising-এর মতে উপকূল ভাগের অধিবাসী একটি নেগ্রিটো জাতিকে ভারতবর্ষ ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসীরূপে দেখা যায়। ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকাল পর্যন্ত সুসীয়ানায় পশমের মত কেশবিশিষ্ট নেগ্রিটোগণ বর্তমান ছিল। Huising আরও বলেন যে, ইরাণের প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতিও ছিল। Huising-এর এই অনুমানকে ভিত্তি করিয়া Giuffrida-Ruggeri মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইরাণ হইতে দ্রাবিড় ও নেগ্রিটোগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ ভারতে যে গোলমুণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণের মানুষ দেখা যায়, তাহারা নেগ্রিটো গোষ্ঠীভুক্ত বা নেগ্রিটোর সহিত সংমিশ্রণের ফল। ইহার পর তিনি বলিতেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় বিস্তৃত অঞ্চলে, সম্ভবতঃ আরবেও নেগ্রিটো গোষ্ঠীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় ("A band of Negritos is spread along the southern regions of Asia, and probably also Arabia")। এখানে Southern regions of Asia-এর অর্থ এশিয়ার বৃহৎ ভূভাগের দক্ষিণের সামুদ্রিক অঞ্চল। এই প্রসঙ্গে আরবের উল্লেখ সম্পূর্ণ অনুমানমূলক এবং এই উল্লেখ করিবার কারণ এশিয়ার ভৌগোলিক সংস্থানে দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপ ও আরব উপদ্বীপের অবস্থানের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহার পর তিনি বলিতেছেন যে, শুধু আরবের অধিবাসীদের মধ্যে নহে হিব্রুদিগের (তাঁহার মতে Proto-Semites) মধ্যেও

নেগ্রিটো সংমিশ্রণ রহিয়াছে। Giuffrida-Ruggeri-র এই নেগ্রিটোবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার মতে দক্ষিণ এশিয়ার এই নেগ্রিটো গোষ্ঠী আফ্রিকা হইতে আসে নাই ('According to my opinion Africa did not intervene at all in peopling Asia')।

সে যাহা হউক, দক্ষিণ ভারতের নেগ্রিটো লক্ষণযুক্ত বলিয়া বর্ণিত অধিবাসীদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জানা যাইতেছে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ হয় সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে অথবা স্থলপথে ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

de Quatrefages দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণের কথা বলিতে গিয়া নেগ্রিটো গোষ্ঠীর দুইটি প্রধান লক্ষণ, গোলমুণ্ড ও পশমের মত বা গুটি-পাকানো কেশ আমলে আনেন নাই, কৃষ্ণবর্ণের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীদের মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আছে এবং দ্রাবিড় জাতিগুলির মধ্যেও এই সংমিশ্রণ রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বদিকের ইন্দোচীনের অধিবাসীদের মধ্যে এবং পশ্চিমে পারস্যের লুরীস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে নেগ্রিটো বা দ্রাবিড়ী সংমিশ্রণ বর্তমান। ডাঃ হেডনের মতে লুরীস্থানের অধিবাসী লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীভুক্ত। দ্রাবিড় জাতি যাহাদিগকে বলা হয়, তাহারাও অনেকে লম্বামুণ্ড। de Quatrefages নেগ্রিটো গোষ্ঠীর গোলমুণ্ড ও অন্য গোষ্ঠীর লম্বামুণ্ডের মধ্যে পার্থক্য উপেক্ষা করা তাঁহার থিওরীর পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে মনে করেন নাই।

Colonel Sewell-এর মত এইরূপ যে, এশিয়ার প্রধান ভূভাগ হইতে উত্তর-পূর্ব পথে মানুষ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং এই অভিযাত্রীদল ছিল গোলমুণ্ড নেগ্রিটো গোষ্ঠীর লোক।

এই পর্যন্ত ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনতম স্তর হিসাবে অথবা দক্ষিণ ভারতের প্রান্তসীমার পর্বত ও অরণ্যময় অঞ্চলের কয়েকটি উপজাতির মধ্যে সংমিশ্রণ হিসাবে যাঁহারা নেগ্রিটোবাদের সমর্থন করেন, তাঁহাদের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর এই মতের বিরোধী পণ্ডিতগণের যুক্তির উল্লেখ করা হইবে।

যে সকল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে নেগ্রিটো

সংমিশ্রণ জাতিসংমিশ্রণের (Ethnic stratilication) প্রথম স্তর, এই মত গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষের প্রথম কথা এই যে, দক্ষিণ ভারতের প্রান্তসীমার কাদার, পুলায়ান প্রভৃতি উপজাতিকে দৈহিক লক্ষণ অনুসারে নেগ্রিটো গোষ্ঠীভুক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ। তারপর প্রাগৈতিহাসিক আমলে যে সকল মনুষ্যগোষ্ঠী ভাবতবর্ষে উপস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়, সেই সকল গোষ্ঠীর বলিয়া স্বীকৃত করোটি প্রভৃতি নিদর্শন পাওয়া গেলেও নেগ্রিটোর বলিয়া স্বীকৃত প্রাগৈতিহাসিক আমলের করোটি, কঙ্কাল প্রভৃতি কোন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের তিনেভেলীর করোটি Dixon-এর মতে নিগ্রোয়েড, কিন্তু সাধারণ মত এই যে, উহা লম্বামুণ্ড প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড। যদিও গোটা ভারতবর্ষের কোথাও প্রাচীনযুগে বা বর্তমানে নেগ্রিটোর অস্তিত্বের সন্দেহাতীত কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, তথাপি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নেগ্রিটো গোষ্ঠীর বলা হইয়াছে এই কারণে যে, নেগ্রিটো গোষ্ঠীর যেরূপ কেশের বৈশিষ্ট্য (Ulotrichous) দেখা যায়, কতকটা সেইরূপ কেশের বৈশিষ্ট্য কয়েকজন লোকের মধ্যে দেখা গিয়াছে।

ফিলিপাইনস্, আন্দামান ও মলক্কায় নেগ্রিটোর অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া Meyer এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটোর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। Callamand-এর মতে ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদের সমর্থন দুঃসাহসিক মতবাদের "Une doctrine aventureure"-এর প্রচার বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইঁহাদের ও এই দলের অন্যান্যের মত এই যে, প্রকৃত নেগ্রিটোকে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী aboriginals বলিয়া কোনমতে স্বীকার করা যায় না।

জার্মাণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী Eickstedt এই দলের না হইলেও এই সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি জাতির মধ্যে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর দৈহিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও তাহাদের কেশের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি Proto-Negrito সংমিশ্রণের কল্পনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে Eickstedt যে সকল নূতন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার একটির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা

যাইতে পারে। তাঁহার মতে দক্ষিণ ভারতের মেলানিড জাতি (ইহার মধ্যে তামিল জাতি পড়িতেছে) Indo-Negrid বা Great Negro race-এর পূর্ব শাখার বংশধর। তিনি অনুমান করেন, এই ইন্দোনেগ্রিড জাতির প্রস্তরযুগের সভ্যতার সঙ্গে আফ্রিকার উত্তর কঙ্গো অঞ্চলের তুম্বা যুগের সভ্যতার সংযোগ থাকা সম্ভব। সংযোগ দেখান সম্ভব হউক বা না হউক, লক্ষ্য করিতে হইবে যে, দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম সভ্যজাতি (তামিল বা দ্রাবিড) তাহার মতে আফ্রিকা হইতে আগত নিগ্রোগোষ্ঠীর প্রবাসীদিগের উত্তর পুরুষ। এই মত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী সমাজে অনেকে গ্রাহ্য করেন নাই।

ভারতবর্ষে নেগ্রিটো সংমিশ্রণের প্রশ্নে আরও দুইজন পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্যর হারবার্ট রিজলে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (*Peoples of India*) দক্ষিণ ভারতে বা ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলে নেগ্রিটোর লক্ষণযুক্ত কোন জাতির অস্তিত্বের উল্লেখ করেন নাই। এডগার থার্স্টন তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থে (*Castes and Tribes of Southern India*) ভারতবর্ষের কোন জাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ স্বীকার করেন নাই। দক্ষিণ ভারতের জাতিগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যে পশমের মত চুল লইয়া এত বিতর্কের উৎপত্তি তাহার সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন "I have seen only one individual with wooly hair in Southern India and he was of mixed Tamil and African parentage."

ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদ প্রচারের প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

(১) নেগ্রিটোবাদ প্রচারের মূলে কি ধারণা থাকিতে পারে,

(২) দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আছে, একথা বলিবার প্রকৃত ভিত্তি কি ;

(৩) ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নেগ্রিটোর অস্তিত্ব বা সংমিশ্রণ প্রমাণিত হইয়াছে কি না ; এবং

(৪) নেগ্রিটো সংমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া যায় স্বীকার করিলে এই সংমিশ্রণের পরিমাণ কিরূপ ও কি ভাবে ইহা ঘটিয়াছে।

শেষের তিনটি বিষয়ের আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে

কাদার প্রভৃতি উপজাতিব মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ অনেকে অস্বীকার করেন। যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের পক্ষের একমাত্র প্রমাণ দাঁড়ায় কেশের বৈশিষ্ট্য। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় "The question of Negrito strain finally centres round the nature of the hair of the Kadars." তাঁহার মত এই যে, কাদার, অঙ্গমী নাগা প্রভৃতির কেশ নেগ্রিটোর কেশের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; frizzly hair ও wooly hair এক বস্তু নহে।[৫] তাহাদের মস্তকের গঠনও নেগ্রিটোর অনুরূপ নহে। অধিকন্তু frizzly hair দেখা যায়, এরূপ মাত্র অল্প কয়েকজন কাদার পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত তথ্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত কাহারও ব্যক্তিগত মতকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কারের ভিত্তি আরও দুর্বল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, প্রমাণ প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া কেহ কেহ ছোটনাগপুরের হো ও বিরহর দিগের মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কার করিয়াছেন। অঙ্গমী নাগা সম্বন্ধে ডাঃ হাটন নিজে প্রথমে নেগ্রিটো, পরে মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের কথা বলিয়াছেন। মেলানেশিয়ান ও নেগ্রিটোকে কেহ এক গোষ্ঠীভুক্ত বলেন না। তর্কের খাতিরে সামান্য পরিমাণ নেগ্রিটো সংমিশ্রণ দক্ষিণ ভারতে দেখা যায় স্বীকার করিলে, কি ভাবে এই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে অনেক রকম অনুমান করা হইয়াছে। একটি অনুমান এইরূপ যে, দক্ষিণ ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগের ফলে, ভূবিজ্ঞানের ইতিহাস এরূপ যোগাযোগের কথা বলে, উপকূলবাসী কোন কোন উপজাতির মধ্যে সামান্য পরিমাণে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব। এই স্বীকৃতির দ্বারা নেগ্রিটো গোষ্ঠী সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী, এই অনুমানের কিছুমাত্র পোষকতা করা হয় না।

উপরে যে চারিটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এইবার তাহার প্রথমটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নেগ্রিটো গোষ্ঠী ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী, এই মত প্রচার করিবার মূলে কি ধারণা থাকা সম্ভব? প্রকৃত প্রমাণের অবস্থা যাহা দেখা যায়, সেইরূপ প্রমাণের বলে এই ধরণের মত প্রচার করিবার হেতু কি হইতে

পারে? একটি হেতু এই যে, নেগ্রিটো প্রভৃতি গোষ্ঠীকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানবসমাজের মধ্যে প্রাচীনতম গোষ্ঠী বলিয়া মনে করা হয়। ভারতবর্ষে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ স্বীকার করিয়া লইলে নেগ্রিটোকে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী বলিবার একটা সূত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হেতুর কথা বলা হইতেছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগেব গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ কালো। য়ুরোপীয় গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, তাহাদের এক বৃহৎ অংশের ভাষা ইন্দো-য়ুরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত এবং তাহারা য়ুরোপীয় শ্বেতকায় জাতিদিগের জ্ঞাতি। প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহাদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ হইল কেন? উত্তরে বলা হইয়াছে, ইহার অন্যতম কারণ আর্যজাতির এই পূর্ব শাখার ভাবতবর্ষের কৃষ্ণবর্ণের আদিম অধিবাসীদিগের সহিত রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই কৃষ্ণবর্ণের আদিম অধিবাসী কাহারা? রমাপ্রসাদ চন্দের মতে তাহারা নিষাদ, Giuffrida-Ruggeri-র মতে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড, কোন কোন পণ্ডিতের মতে তাহারা দ্রাবিড় জাতি। মোট কথা, তাহারাই ভারতবর্ষের অনার্য আদিম অধিবাসী। শ্বেতকায় আর্যদিগের বংশধরগণের চর্মের কৃষ্ণত্বের জন্য ইহারাই দায়ী। এখন ভারতবর্ষের এই কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীদিগের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণে আন্দামানে নেগ্রিটো, সিংহলে বেদ্দা রহিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ায় রহিয়াছে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ও মেলানেশিয়ার অধিবাসী। পশ্চিমে রহিয়াছে আফ্রিকার নিগ্রো জাতিগুলি। ইহারা সকলেই কৃষ্ণকায়। কৃষ্ণকায় মনুষ্যগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই বিস্তৃত অঞ্চল প্রায় বলয়াকারে ভারতীয় উপদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে। ভারতবর্ষের কৃষ্ণকায় অধিবাসীদিগের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বসিয়া পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এই সকল কৃষ্ণকায় মনুষ্যগোষ্ঠীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই জন্য এই প্রসঙ্গে নিগ্রো, ইথিওপীয়ান, মেলানেশীয়ান, নেগ্রিটো, অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী প্রভৃতির ঘন ঘন উল্লেখ দেখা যায়। নেগ্রিটো গোষ্ঠীকে প্রাচীনতম মনুষ্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ধরা হয়। এই জন্য ভারতবর্ষে এই গোষ্ঠীই আদিম অধিবাসী, এই মত প্রচারিত হইয়াছে যুক্তিসহ প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়াই।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে কেহ মনে করিতে পারেন যে, সম্ভবতঃ এই সকল কৃষ্ণকায় জাতি তাহাদের বর্তমান বাসভূমি হইতে

ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিতগণের অনুমান অন্যরূপ। "The general tendency of migration and culture in South East Asia seems to have been from north to south, rather than from the islands to the mainland" (J. H. Hutton)। ইহার অর্থ এই যে, কৃষ্ণকায় মনুষ্যের যতগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষে দেখা যায় বা যাহাদের উপস্থিতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা সকলেই এশিয়ার প্রধান ভূভাগ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এখানে বসবাস করিবার পর তাহাদের বর্তমান বাসভূমিতে চলিয়া গিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। তাহাদের কেহ কেহ তাহাদের বর্তমান বাসভূমি হইতে জলপথে ভারতবর্ষের উপকূল অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা উপকূল অঞ্চলেই পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইরূপ অনুমান করা কেন চলিবে না তাহার সন্তোষজনক কারণ নির্দেশ করা হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের বেদ্দাগোষ্ঠীর কয়েকটি উপজাতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কাদার প্রভৃতি উপজাতির সঙ্গে আন্দামানের নেগ্রিটো অপেক্ষা মালয়ের সেমাং প্রভৃতি উপজাতির দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্যের কথা কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী তুলিয়াছেন, তাহাও এই অনুমানের পোষকতা করে। সুতরাং এই অনুমানকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটো গোষ্ঠী প্রাচীনতম অধিবাসী, এই মতবাদ প্রচারের মূলে কি ধারণা কাজ করিতেছে ও ইহার সপক্ষে কতখানি যুক্তিসহ প্রমাণ আছে। এই আলোচনা হইতে আরও জানা যাইবে যে, ভারতীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সম্পর্কে নূতন আবিষ্কারের বা নূতন মতবাদ প্রচার করিবার কৃতিত্ব দাবি করেন, তাহাদের দাবী অমূলক। তাঁহাদের পূর্বগামী ও পৃষ্ঠপোষক বহু য়ুরোপীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকে আবার এই মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের প্রান্তসীমায় অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে কোন কোন ক্ষেত্রে বহিরাগত নেগ্রিটো সংমিশ্রণ ঘটা অসম্ভব নহে, মাত্র এইটুকু বিনা বিধায় স্বীকার করা চলে, কিন্তু সন্দেহ থাকে এই সংমিশ্রণ বাস্তবিক নেগ্রিটো অথবা মেলানেশিয়ান (Pacific Negro)।

প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠী

ডাঃ গুহেব মতে নেগ্রিটো গোষ্ঠীব পরে প্রোটো-অষ্ট্রালযেড গোষ্ঠী ভাবতবর্ষে প্রবেশ কবিযাছিল।

এই গোষ্ঠীব প্রোটো-অষ্ট্রালযেড নাম দিবাব কাবণ ইহাদেব অনেকগুলি দৈহিক লক্ষণ অষ্ট্রেলিযাব আদিবাসী উপজাতিদেব দৈহিক লক্ষণেব সদৃশ। অষ্ট্রেলিযাব আদিবাসীরা কোথায হইতে আসিল এই প্রশ্ন উঠিযাছে। ডাঃ গুহেব উত্তব, ইহাদেব পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণ ভাবত হইতে সিংহল ও মেলানেশিযাব পথে অষ্ট্রেলিযায প্রবেশ কবিযা থাকিতে পাবে।

তিনি বলেন বর্তমানে এই প্রোটো-অষ্ট্রালযেড টাইপকে দক্ষিণ ও মধ্য ভাবতেব আদিবাসী (Tribal population) এবং উত্তব ভাবতেব অর্ধ-হিন্দু (Semi-Hinduised) উপজাতিদেব মধ্যে প্রধান টাইপ বলা যায। দেশেব অধিকাংশ অঞ্চলে হিন্দু সমাজেব Exterior castes প্রধানতঃ এই গোষ্ঠীভুক্ত। তিনি আরও বলেন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যে "নাসিকাহীন" (অনাস), কৃষ্ণবর্ণ, আচাবহীন, অবোধ্য ভাষাভাষী নিষাদ জাতির কথা বলা হইযাছে, তাহারা নিঃসন্দেহে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীব উপজাতি। (*Racial Elements in the Population*, 1944)

মোঙ্গলয়েড লক্ষণহীন অধিকাংশ আদিবাসী উপগোষ্ঠী প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীভুক্ত, ডাঃ গুহ এই মত প্রচাব কবিযাছেন। এই সম্পর্কে বিস্তাবিত আলোচনাব প্রযোজন আছে। প্রথমে দেশে আদিবাসী অঞ্চলগুলির কথা বলিযা দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তব ভাবতেব আদিবাসীদেব সম্বন্ধে আলোচনা কবা হইতেছে।

আদিবাসী গোষ্ঠী

ভাবতবর্ষেব অধিবাসীদিগেব মধ্যে সর্বপ্রাচীন স্তব যাহাদেব লইযা গঠিত মনে করা যাইতে পারে, তাহাবা এখনও ভাবতবর্ষেব জনসমষ্টিব মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করিয়া আছে। এই জনসমষ্টি ভাবতবর্ষেব আদিম অধিবাসী বা আদিবাসী। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ ইহাদেব সম্বন্ধে কি বলেন তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে সাধাবণ ভাবে ইহাদেব সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে।

ভারতবর্ষেব Census রিপোর্টগুলিতে আদিবাসীদিগকে Tribal population নাম দেওয়া হইযাছে। ধর্ম, ভাষা, সামাজিক অবস্থা, বর্ণ, বাসেব অঞ্চল

ইত্যাদি হিসাবে তাহাদের সংখ্যাকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মের যে সকল উপজাতি ভারতীয় জনসংখ্যার বিবরণীতে স্থান পাইয়াছে, তাহাদিগকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি হইবে। ইহাদের মধ্যে প্রায় এক কোটি লোক হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করে নাই এবং আপনাদিগের ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি মানিয়া চলে এবং বাকী এক কোটি মোটামুটি ভাবে হিন্দু ধর্ম মানিয়া চলে এবং আপনাদিগের সামাজিক রীতিনীতি মানিয়া চলিলেও হিন্দু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। মোটা-মুটি হিসাবে বাংলা ও বিহারের ১৭ লক্ষ সাঁওতালের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ হিন্দু, বিহারে ৫ লক্ষ, হো'র মধ্যে ১ লক্ষের উপর হিন্দু, সাড়ে পাঁচ লক্ষ মুণ্ডার মধ্যে দেড় লক্ষ হিন্দু, ৬ লক্ষ ওরাওঁর মধ্যে সওয়া দুই লক্ষ হিন্দু, ৩ লক্ষ খোন্দের মধ্যে দেড় লক্ষ হিন্দু। মধ্যপ্রদেশের গোন্দ প্রায় অর্ধেকের উপর হিন্দু, মধ্যভারত এজেন্সীর অধিকাংশ গোন্দ হিন্দু। মধ্যপ্রদেশের কোল, খারিয়া, করওয়া প্রভৃতির অধিকাংশ হিন্দু। মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত ষ্টেট এজেন্সী, রাজপুতানা, পশ্চিম ভারত ষ্টেট এজেন্সী ও আজমীর মাডবারের অধিকাংশ ভীল ও মীনা হিন্দু। আসামের গারো, খাশী, কুকী, লালুং, মেচ, মিকির, নাগা প্রভৃতির মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা প্রচুর। আসামের নাগা, কুকী প্রভৃতি ও ছোট নাগপুরের ওরাওঁ প্রভৃতির মধ্যে অনেকে খৃষ্টান মিশনারীদিগের উদ্যমে খৃষ্টান হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় ৬ কোটি ২৬ লক্ষ Exterior castes বা Scheduled caste-এর মধ্যে ও ছোটনাগপুরের ওরাওঁ প্রভৃতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে, এরূপ আদিবাসী উপজাতি অনেক পাওয়া যাইবে।

প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে দেশের নানাস্থানে ছোট বড় দলে ছড়াইয়া পড়িলেও আদিবাসীদিগের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাসভূমি আছে। নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন উপজাতির বা বড় বড় উপজাতিগুলির নিজস্ব এলাকা আছে। এই সকল এলাকায় নিজ নিজ প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করিয়া তাহারা বাস করে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির কথা জানিতে গেলে ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গলা দেশের পশ্চিম সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া একটি উচ্চ ভূমির অঞ্চল বিন্ধ্য, কৈমুর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে মালব মালভূমি। মধ্যভারতের মালভূমি মালবের উত্তরে আরাবল্লী

হইতে পূর্ব-ভারতের রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যভারতের এই মালভূমির পূর্বের অংশ ছোটনাগপুর মালভূমি। এই অংশের প্রাচীন নাম ঝাড়খণ্ড। ছোটনাগপুরের মালভূমি দক্ষিণ-পূর্বে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্য দিয়া মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের এই উচ্চভূমি, উত্তরে মধ্যভারতের ও দক্ষিণে ছোটনাগপুরের মালভূমিকে যুক্ত করিতেছে। এই অঞ্চলের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের দেশীয় রাজ্যগুলি অবস্থিত। এই

মানচিত্রে আদিবাসীদের প্রধান অঞ্চলগুলি মোটামুটিভাবে দেখান হইয়াছে।

বিস্তৃত উচ্চভূমির পূর্বে মহানদীর উপত্যকা হইতে বাহির হইয়া পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী, পূর্ব উপকূল বরাবর চলিয়া গিয়া নীলগিরি পর্বতে পশ্চিমঘাট পর্বত শ্রেণীর সহিত মিলিয়াছে। নীলগিরির দক্ষিণে আন্নামালাই, পুলনি প্রভৃতি পর্বত। বাংলার পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার উত্তরাংশ, মধ্যপ্রদেশের বৃহৎ অংশ ও মাদ্রাজের মধ্যে আন্নামালাই পর্যন্ত পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী লইয়া যে বিরাট পর্বত ও অরণ্যময় ভূভাগ অবস্থিত, তাহার বিভিন্ন অংশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ওরাওঁ, খোন্দ, ভূমিজ, ভুঁইয়া, মারিয়া, মুরিয়া, অসুর, শবর, পোয়জা, গোন্দ, চেঞ্চু, করওয়া, কয়া, বৈগা প্রভৃতি গোষ্ঠীর আদিবাসীদিগের বাস। এই অঞ্চলের বাহিরে মধ্যভারত ষ্টেট এজেন্সীতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ, রাজপুতনা এজেন্সীতে প্রায় ২ লক্ষ ২৯ হাজার, বরোদায় প্রায় ৩ লক্ষ আদিবাসীর বাস। মধ্যভারত ষ্টেট এজেন্সীতে

ভিল, গোন্দ, বৈগা, কোল, ভূমিয়া, করকু প্রভৃতি গোষ্ঠী দেখা যায়। অন্যত্র ভিল, মীনা প্রভৃতি প্রধান।

মানচিত্রে (২৭ পৃঃ) আদিবাসীদের প্রধান অঞ্চলগুলি মোটামুটি দেখান হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই অঞ্চলটি গাঙ্গেয় উপত্যকার বাহিরে, সিন্ধু উপত্যকা হইতে অনেক দূরে, পূর্ব ও মধ্য ভারতের একটি বিস্তৃত অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। উত্তরে এই অঞ্চল গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ স্পর্শ করিতেছে। দক্ষিণ পশ্চিমে এই অঞ্চলকে সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল পর্বত শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ-পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীর সহিত যুক্ত করা যাইতে পারে। সমগ্র ছোটনাগপুর মালভূমি, মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কিয়দংশ এই অঞ্চলের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে। মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাভাষী প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ এবং কুরুখ, গোন্দী, কুই, মাল্টো প্রভৃতি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী প্রায় ৭৬ লক্ষ আদিবাসীর বাস এই অঞ্চলে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অংশে যে সকল আদিবাসী উপজাতি দেখা যায় তাহাদের কতক এই অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির শাখা, বাকী অংশ ভীল, ভিলালা, মীনা প্রভৃতি উপজাতি। এই বাকী অংশ মোটা-মুটিভাবে হিন্দুদিগের ধর্ম ও ভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া গিয়াছে বলা যায়। দক্ষিণ ভারতে যে সকল আদিবাসী উপজাতি দেখা যায় তাহাদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব উপজাতিগুলি ভীল প্রভৃতি গোষ্ঠীর নহে, পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, এখানে তাহার উল্লেখ মাত্র করা হইতেছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের এই আদিবাসীরা এক কালে সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকা সমেত সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া ছিল তাহা হইলে যে ধারণা সাধারণে প্রচলিত আছে; অর্থাৎ আর্য সভ্যতার ক্রমিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীরা ক্রমশঃ সরিয়া আসিয়া দুর্গম পর্বত ও অরণ্যময় অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছে, সেই ধারণা হইতে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের প্রধান গোষ্ঠীগুলিকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্বের এই অঞ্চলে দেখিতে পাইবার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কি? আদিবাসীদিগের আধুনিক ইতিহাস হইতে তাহাদের অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকা অপেক্ষা দল বাঁধিয়া ছড়াইয়া পড়িবার (Migration) দিকে ঝোঁক দেখা যায়। আমরা

দেখিতে পাই, সাঁওতালগণ উত্তর ও পশ্চিম হইতে বাঙ্গলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, মালদহ ও রাজসাহীর মধ্যে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যাহা হউক, যে প্রশ্নের উল্লেখ করা হইল পরে তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইবে।

দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসীদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি, পুলনি, আন্নামালাই প্রভৃতি পর্বত-অঞ্চলে ও অন্যত্র কতকগুলি আদিবাসী উপজাতি উল্লেখযোগ্য এবং তাহাদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। পরে এই আলোচনার উল্লেখ করা হইবে।

ভারতবর্ষের উপজাতীয় জনসমষ্টি (Tribal population) বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আসাম ও আসাম সীমান্তে বাস করে। ইহাও পর্বত ও অরণ্যময় অঞ্চল। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া পাটকাই ও নাগা পর্বত উত্তর মুখে ও লুসাই পর্বত দক্ষিণদিকে প্রসারিত হইয়াছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যভাগ হইতে আবার খাশী, জয়ন্তীয়া, গারো পাহাড় পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। আসামেরও এই পার্বত্য অঞ্চলের সহিত ত্রিপুরা রাজ্য ও পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকা সংযুক্ত। লুসাই পর্বতের পশ্চিমে এই এলাকা পূর্বদিকে চিন পর্বত ও দক্ষিণে উত্তর আরাকানের পার্বত্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত।

আসামের এই বিস্তৃত অঞ্চলে খাশী ও জয়ন্তীয়া পর্বতে প্রায় ৭৪ হাজার, নাগাপর্বতে প্রায় ২ লক্ষ, লুসাই পর্বতে প্রায় ৬০ হাজার এবং আসাম বা ব্রহ্মপুত্র এলাকায় প্রায় ৪ লক্ষ বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপজাতীয় জনসমষ্টির বাস। মণিপুর রাজ্যের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দেড় লক্ষ ও খাশী-রাজ্যগুলির ১ লক্ষ ৮০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১ লক্ষ ২৬ হাজারকে উপ-জাতির দলে ধরা হয়। উপজাতীয় বলিতে যাহারা হিন্দু বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয় না তাহাদের বুঝান হইয়াছে। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে প্রায় ২১টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ২ লক্ষ ৬৮ হাজার নাগা, ১৮টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত প্রায় ৯০ হাজার কুকি, প্রায় ২ লক্ষ গারো, ১ লক্ষ ৬০ হাজার খাশী, ১ লক্ষ ১৪ হাজার লুসাই, ১ লক্ষ ১০ হাজার মিকির ও ৩ লক্ষ ৪০ হাজার কাছারী

প্রধান। ইহা ছাড়া সদিয়া সীমান্ত এলাকায় ডাফ্লা, আবর, মিশমি, সিংপো, খামটি, আসাম উপত্যকার মেচ, মিরি, লুসাই পর্বতের লাখের, লালুং, ফানাল, মাহ্‌র প্রভৃতি আছে। আসামের জনসংখ্যার মধ্যে উপজাতি, অর্থাৎ যাহারা জনসংখ্যা গণনাকারীদের মতে হিন্দু নয়, এরূপ জনসমষ্টির সংখ্যা দশ লক্ষ ধরা হইয়াছে; কিন্তু ধর্ম হিসাবে সংখ্যা নির্দেশ না করিয়া ভাষা অনুসারে হিসাব করিলে দেখা যায় আসামী ও বাংলা ভাষাভাষী প্রায় ৫৯ লক্ষ লোক ও হিন্দী, মুণ্ডারী, উড়িয়া, সাঁওতালী, গোন্দী, খারিয়া প্রভৃতি ভাষাভাষী এবং ১৫ লক্ষ এবং চা বাগানের কুলীও অন্যান্যের সংখ্যা বাদ দিলে আসামের উপজাতীয় লোকের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষে দাঁড়ায়।

আসামের নাগা, কুকী, খাশী, লুশাই, মেচ, মিকির এবং গারো, ত্রিপুরার অধিবাসী উপজাতি সমূহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা প্রভৃতিকে ভারতবর্ষের প্রকৃত আদিবাসীর পর্যায়ে ধরা উচিত কিনা তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ভাষা ও দৈহিক লক্ষণের দিক দিয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তর ভাগের যে সকল আদিবাসীর কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সহিত আসাম ও আসামের সীমান্ত অঞ্চলের এই সকল উপজাতির কিরূপ সম্পর্ক আছে তাহার কথা পরে বলা হইবে। এই দুই দলের মধ্যে যে অসাদৃশ্য আছে তাহা একজন সাঁওতাল ও একজন খাশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আসামের এই সকল উপজাতি অল্পবিস্তর মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত। আসাম সীমান্ত হইতে পূর্বদিকে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, অধিবাসীদিগের মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ তত পরিস্ফুট হইয়াছে। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, এক কালে এই সকল অঞ্চলে যাহাদিগকে ভারতবর্ষের আদিবাসী বলা হয়, সেই গোষ্ঠীর লোক বাস করিত, তাহা হইলেও বৈদেশিক সংমিশ্রণ এত অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে যে, নূতন গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। দুই চারিটি অনুমানমূলক সাক্ষ্য ছাড়া আসামের সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে ইহা প্রমাণ করা শক্ত। খামটি, সিংপো প্রভৃতি সদিয়া সীমান্ত এলাকার উপজাতি পাটকাই পর্বতের পূর্বে বাস করে। সিংপোরা ব্রহ্মের কাচিন উপজাতির সহিত সম্পর্কিত। নাগাদিগকে ব্রহ্মের এলাকার মধ্যেও দেখা যায়। খামতিগণ তাই গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত। শান উপজাতি এই গোষ্ঠীর। ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে সরিয়া

বাঙ্গলার সীমান্তের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে বাঙ্গলার সমতলভূমির অধিবাসীদিগের সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় তত পরিস্ফুট। বোদো, গারো, ধীমাল, কোচ প্রভৃতি উপজাতি ইহার পরিচয় দেয়।

উত্তর পূর্ব ভারত হইতে এইবার দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। দক্ষিণ ভারতের প্রান্তসীমায় কতকগুলি আদিবাসী উপজাতি দেখা যায়। ইহাদের কথা সংক্ষেপে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের উপজাতিগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি উপজাতি, আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের কোন কোন গোষ্ঠীর শাখা বা বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্য-ভাগে অবস্থিত হায়দারাবাদ রাজ্যের কতকাংশ এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এই এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার গোন্দ, ৫৯ হাজার করওয়া, ৩৩ হাজার কয়া এবং পোরজা, শবর, খোন্দ, খোন্দেরা প্রভৃতি উপজাতি বাস করে। পশ্চিম ভারতের ভীলদিগকে এই রাজ্যের মধ্যে দেখা যায়। এই সকল উপজাতি প্রধানতঃ পূর্ব উপকূলের উত্তরাংশে বাস করে। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব কতকগুলি উপজাতি। প্রধানতঃ এজেন্সী এলাকায় তাহা-দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। চেঞ্চুগণ দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতি, হায়দারা-বাদের বাহিরে কেবল মাদ্রাজের মধ্যে তাহাদিগকে দেখা যায়। বাদাগা, কুরুম্বা, এরভালান, কাদান, কানিক্কারান, পানিয়ান, ইরুলা, কুড়ুবী, কুদিয়া, পানো, যেনাদি প্রভৃতি এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কোচীনের এলাকায় মালয়ন, পানিয়ান, মুখুবন, নারচদি, বেতান, বেত্তুবন, কাদির বা কাদার প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব উপজাতি। টোডাগণ দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতি কিন্তু অন্যান্য উপজাতি হইতে ভিন্ন গোষ্ঠীর। দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের অধিকাংশেরই সংখ্যা অতি অল্প। ইহাদের নিজস্ব পৃথক ভাষা দেখা যায় না, যে অঞ্চলে বাস করে সেই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলিকে একটি বহু প্রাচীন গোষ্ঠীর ইতস্ততঃ ভাসমান অবশিষ্ট ভগ্নাংশ বলিয়া মনে হয়।

আসাম ও আসাম সীমান্তের উপজাতিগুলিকে যদি ভারতবর্ষীয় আদি-বাসীর মধ্যে গণনা করা হয় তাহা হইলে বলা যায় যে, আমরা প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে আদিবাসীদিগকে দেখিতে পাই ;—(১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত

অঞ্চলে, (২) ছোটনাগপুরের মালভূমি ও মধ্যভারতের মালভূমির কিয়দংশ লইয়া গঠিত একটি বিস্তৃত অঞ্চলে, (৩) পশ্চিম ভারতের কোন কোন বিচ্ছিন্ন অঞ্চল এবং (৪) দক্ষিণ ভারতে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, উত্তর-পশ্চিম উপজাতীয় এলাকার পাঠান বা পুস্তু ভাষাভাষীদিগকেও কেহ কেহ ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের পর্যায়ভুক্ত করিতে চাহেন। এই মত সমীচীন কিনা পরে দেখা যাইবে।

দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী

দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসী উপজাতিগুলির দৈহিক লক্ষণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছেঃ লম্বা মুণ্ড (Dolichocephalic), চ্যাপ্টা নাক (Platyrrhine), কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় ও ঢেউখেলান বা কুঞ্চিত কেশ (Cymotrichous)। মোটামুটি বলা যায় যে, এই সকল উপজাতিকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু এই গোষ্ঠীর নামের তালিকাটি বেশ বড় ; যথা, প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় (Pre-Dravidian), প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড (Proto-Australoid), অষ্ট্রালয়েড-বেদ্দাইক (Australoid-Veddaic), ও বেদ্দিদ (Veddid)। মালয়ের শকাই, সিংহলের বেদ্দা, দক্ষিণ ভারতের কাদার বা কাদির, কুরুম্বা, পানিয়ান, ইরুলা প্রভৃতি উপজাতি, প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত। পূর্ব সুমাত্রার অধিবাসী, সেলিবিসের তোয়ালা প্রভৃতি ইহাদের সমগোষ্ঠীয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় হইলেও প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। এখন এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন নামের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ ভারতের কতকগুলি আদিবাসী উপজাতিকে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় নাম দেওয়া হইয়াছে দ্রাবিড় জাতি হইতে তাহাদের পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য। এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "The lowest castes and the outcastes are predominantly Pre-Dravidian"। ইহার অর্থ দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে ও উহার বাহিরে যে সকল উপজাতি দেখা যায় তাহারই প্রাক্-দ্রাবিড়ীয়। যদিও এইভাবে পার্থক্য নির্দেশ করিবার প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলা যায় না তথাপি এই তথ্য প্রকাশ পাইতেছে যে, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলির স্বাধীন সমাজ নাই, উহারা হিন্দু সমাজের আওতায় আসিয়া গিয়াছে। পূর্বে

এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ইহাদিগকে একটা প্রাচীন গোষ্ঠীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা ভাসমান ভগ্নাংশ বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, দ্রাবিড ও প্রাক্-দ্রাবিড মূলতঃ একই গোষ্ঠীয় অথবা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর সংমিশ্রণ হইয়াছে। সে যাহা হউক, যাঁহারা দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলিকে প্রাক্-দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত বলেন তাঁহাদের মত এই যে, ইহাদের পরে দ্রাবিড় গোষ্ঠী দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত হয়।

প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড নামের তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণভারতের আদিবাসী ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী মূলতঃ একই গোষ্ঠীয়, যদিও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী-দিগের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্যের অর্থ দৈহিক লক্ষণ সমূহের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ। এই ইতরবিশেষ হইবার হেতু পারিপার্শ্বিক অবস্থানের প্রভাব হইতে পারে। অষ্ট্রালয়েড-বেদ্দাইক নামের অর্থ দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী, অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও সিংহলের আদিবাসী বেদ্দাগণ এক গোষ্ঠীয়। ইহারা সকলেই লম্বামুণ্ড, কৃষ্ণকায় ও কিমোটিকাস অর্থাৎ ঢেউ খেলান বা কুঞ্চিত কেশ। দেহের দৈর্ঘ্য ও নাসিকার গঠনে তারতম্য থাকিলেও ইহাদের সকলকেই এক বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। বেদ্দিদ নামের তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী ও সিংহলের বেদ্দাগণ এক গোষ্ঠীয়।

এই সকল নামের ব্যাখ্যা হইতে এই মত দাঁড়াইতেছে যে, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতিগণ, যাহাদিগকে একদল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় নাম দিয়াছেন, তাহারা শুধু নিকটবর্তী সিংহলের নহে, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয়ের মুখে অবস্থিত সুদূরবর্তী অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদিগের মূল গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে দ্রাবিড়জাতি ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সমগোষ্ঠীয়।

জার্মান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী Eickstedt দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীর নামকরণ করিয়াছেন বেদ্দিদ (Veddid), অর্থাৎ তাঁহার মতে মূলগোষ্ঠী সিংহলের বেদ্দা হইতে সংমিশ্রণ ও পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীদের উৎপত্তি

হইয়াছে। এখানে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের উল্লেখ করা হইতেছে না। Fritsch-এর মতে বেদ্দাগণ ভারতবর্ষের আদিম মানবগোষ্ঠী (Primitive racial type)। Sarasin ভ্রাতৃদ্বয়ের মতে (Paul and Fritz Sarasin) দক্ষিণ ভারতের বেদ্দাগোষ্ঠী সকল কিমোট্রিকাস গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ। তাঁহারা মনে করেন দক্ষিণ ভারতের প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় উপজাতি বেদ্দাগোষ্ঠীয়, কিন্তু দ্রাবিড়গণ অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদিগের সমগোষ্ঠীয়। ডাঃ গুহ বলেন, সিংহলের বেদ্দাগণের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের উপজাতিগুলি অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদিগের সাদৃশ্য বেশী। দক্ষিণ ভারতের উপজাতিগুলির মধ্যে মূলগোষ্ঠীয় দৈহিক লক্ষণ সমূহ অধিকতর বজায় আছে। এই অভিমতের তাৎপর্য এই যে, মূলগোষ্ঠীর লোক ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে ও অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহল হইতে ভারতবর্ষে আসে নাই। Huxley-র মতে দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন অধিবাসী ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এক গোষ্ঠীর। Keane-এর মতে দ্রাবিড় জাতি দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী নহে, তাহাদের পূর্বে নিগ্রো গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণ আছে এরূপ উপজাতিরা (Aberrant Negrito type) দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিল। Dr. Maclean-এর মতে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় কোন উপজাতির অস্তিত্ব বর্তমানে নাই। দ্রাবিড় ও যাহাদিগকে প্রাক্-দ্রাবিড় বলা হয় তাহারা একই গোষ্ঠীর দুইটি শাখা, দ্রাবিড়গণ ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এক গোষ্ঠীভুক্ত। Sir William Turner-এর মত অন্যরূপ। তিনি বলেন যে, দ্রাবিড় ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীকে একগোষ্ঠীর লোক বলা যায় না। উভয় জাতির মস্তকের গঠনে অসাদৃশ্য রহিয়াছে। Virchow-এর মতে বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর মস্তকের গঠনে পার্থক্য দেখা যায়। এইরূপ মত আরও কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী প্রকাশ করিয়াছেন। Risley তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে যাহাদিগকে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় উপজাতি বলা হয় তাহাদের ও দ্রাবিড়গণের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। Lapicque প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় উপজাতিগুলির মধ্যে নিগ্রো সংমিশ্রণ আছে বলিয়া মনে করেন। নেগ্রিটোবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে Sergi ও Biasutti-এর অভিমত ও Giuffrida-Ruggeri-র ব্যাখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী

উপজাতিগুলির মধ্যে দুইটি টাইপ দেখা যায়, একটির সাদৃশ্য অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও অন্যটির নেগ্রিটোর সহিত।

উপরে যে সকল অভিমতের উল্লেখ করা হইল তাহা হইতে আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতি সম্বন্ধে কিরূপ পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একদলের মত এই যে, দ্রাবিড়জাতি ও প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় বলিয়া যাহাদের পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে সেই সকল উপজাতি একই গোষ্ঠীর। এই মত অনেকে অগ্রাহ্য করেন। যাঁহারা দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলিকে দ্রাবিড় জাতি হইতে ভিন্ন গোষ্ঠীয় বলেন তাঁহাদের মোটামুটি মত এই যে, এই সকল উপজাতি অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদিগের পূর্বপুরুষ (Proto-Australoid) বা তাহাদিগের ও বেদ্দাদিগের সমগোষ্ঠীয় (Australoid-Veddaic), কিন্তু এই দুই দলের মধ্যে একটা জায়গায় মিল আছে। দ্রাবিড়জাতি আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় না হইলেও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের ব্যবহৃত যুক্তির তাৎপর্য বুঝিবার জন্য এখানে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ কথা বলা হইয়াছে যে, কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অষ্ট্রেলিয়ানদিগের সহিত দ্রাবিড়দিগের সাদৃশ্য দেখিতে পান, আবার কেহ কেহ দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতির সহিত অষ্ট্রেলিয়ানদিগের সাদৃশ্য দেখিতে পান। এই দুই দলের অভিমতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে দাঁড়ায় যে, প্রাক্-দ্রাবিড়ী ও দ্রাবিড়ের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় সম্ভবতঃ সেখানে কিছু গলদ আছে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ অপেক্ষা সাদৃশ্যের পরিমাণ কম নহে।

এখন দেখা যাউক কি প্রকার সাক্ষ্যপ্রমাণের বলে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী-দিগের সহিত সম্পর্ক নির্দেশ করা সম্ভব হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতি ও দ্রাবিড়জাতির (উপস্থিত তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া হইতেছে যে, দ্রাবিড়জাতি বলিয়া একটা জাতি দক্ষিণ ভারতে আছে) এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর মধ্যে দৈহিক লক্ষণের গরমিলের কথা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে Sir William Turner-এর মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। "The affinities between the Dravidians and Australians have been based upon the employment of certain

words by both people, apparently derived from common roots, by the use of the boomerang, similar to the well known Australian weapon by some Dravidian tribes, by the Indian Peninsula having possibly had in a previous geologic epoch a land connection with the Austro-Malayan Archipelago and by certain correspondences in the physical type of the two people." শেষের যুক্তি সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "The comparative study of the characters of the two series of crania (Australian and Dravidian) has not led me to the conclusion that they can be adduced in support of the unity of the people" (*Contributions to the Craniology of the people of the Empire of India*).

বাকী যুক্তিগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। উভয় ভাষার কতকগুলি কথার সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন Bishop Caldwell। তাহার পর হইতে এই সাদৃশ্য একটি প্রবল যুক্তি হিসাবে গণ্য হইয়াছে এবং Sarasins, Von Luschen প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী তাঁহাদের মতবাদের ব্যাখ্যায় এই যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন। Boomerang সম্বন্ধে (কাঠের বা লোহার তৈয়ারী অর্ধচন্দ্রাকৃতি অস্ত্র যাহা ঘুরাইয়া শত্রু বা শিকারে প্রতি ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়) Thurston লিখিতেছেন যে, তাঞ্জোর রাজঅস্ত্রশালায় প্রাপ্ত তিনটি এইরূপ অস্ত্র মাদ্রাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। পদুকোট্টাই রাজ্যে প্রাচীনকালে ইহা সাধারণতঃ পশু শিকারে ব্যবহৃত হইত। কোন কালে যে ইহার ব্যাপক ব্যবহার ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। Huxley তাঁহার ব্যাখ্যায় একটি নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ানদিগের মধ্যে জাতিভেদের প্রমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই জাতিভেদ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদের উৎপত্তির কাল বিচার করিলে ইহাকে একটি মৌলিক আবিষ্কার ও ততোধিক মৌলিক যুক্তি বলা যাইতে পারে। তৃতীয় যুক্তিটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

দক্ষিণ ভারত এক সময়ে সম্ভবতঃ মালয় ও অষ্ট্রেলিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল, ভূবিজ্ঞানিগণের এই অভিমত উৎসাহী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ কাজে

লাগাইয়াছেন। ভূবিজ্ঞানিগণের একদলের মত এই যে Palaezoic যুগের শেষে Permo-Carboniferous আমলে এখন যেখানে ভারতমহাসাগর দেখা যায় সেখানে ও তাহার উত্তরে দুইটি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল। উত্তরের ভূভাগ পূব হইতে পশ্চিমে পৃথিবীর উত্তরাংশ জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। এই উত্তর মহাদেশের নাম দেওয়া হয় Angara। দক্ষিণে অবস্থিত ভূভাগ অষ্ট্রেলিয়া, ভারতীয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা জুড়িয়া বর্তমান ছিল। ইহার নাম দেওয়া হয় Gondwana। এই দুই ভূভাগের মধ্যে ছিল আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া একটি বিস্তৃত সমুদ্র। Mesozoic যুগের শেষে দক্ষিণ মহাদেশ Gondwana land ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন হয় ও বৃহৎ অঞ্চল সমূহ জলমগ্ন হইয়া যায়। ফলে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা পরস্পর হইতে বিভিন্ন হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যে একটি যোজক তখনও বর্তমান থাকে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে Lemuria। মাডাগাস্কার হইতে পূর্বমুখে মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ পর্যন্ত এই যোজক বিস্তৃত ছিল। ভারতবর্ষের পূবদিকেও এক বৃহৎ ভূভাগ আন্দামান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এখন যেখানে বঙ্গোপসাগর বর্তমান তাহা এই ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। Jurassic আমলে এই ভূভাগ জলমগ্ন হইয়া যায়।

এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, মালয় দ্বীপপুঞ্জ এককালে পূর্বদিকে বর্নিও, জাভা, সুমাত্রা ও মালাকা হইয়া এশিয়া মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল ও পশ্চিমদিকে সেলিবিস, মলাক্কা, নিউগিনি, সলোমন দ্বীপ লইয়া অষ্ট্রেলিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল। পশ্চিমের অংশকে ইন্দো-মালয় ও পূর্বের অংশকে অষ্ট্রো-মালয় দ্বীপপুঞ্জ নাম দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অনুমান করা হয় যে, পশ্চিমের অংশ বা ইন্দো-মালয় দ্বীপপুঞ্জ লেমুরিয়া যোজকের অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকার প্রধান ভূভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল। ভূবিজ্ঞানিগণের মত এই যে, যাহাকে Malayan Arc বলা হয় তাহার উৎপত্তি কাল Cainozoic যুগের প্রথমভাগে। ইহা এশিয়ার আগ্নেয়গিরি বলয়ের এক অংশ। Cainozoic যুগকে মধ্য এশিয়ার মালভূমি এবং হিমালয়—আল্পস পর্বত শ্রেণীর উৎপত্তিকাল বলিয়া অনুমান করা হয়।

ভারতবর্ষে, আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায় (Patagonia) ও অষ্ট্রেলিয়ায়

কতকগুলি অনুরূপ প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ ও সরীসৃপ কঙ্কাল প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে ভূবিজ্ঞানিগণ এই সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুমানের সাহায্য লইয়াছেন। একজন ভূবিজ্ঞানীর কথা উদ্ধৃত করা হইতেছে: "From this fact...it is argued that land connections existed between those distant regions, across what is now the Indian Ocean, either through one continuous southern continent, or through series of land bridges and isthmuses, which extended from South America to India and united within its borders the Malay Archipelago and Australia. To this old world Southern Continent the name of Gondwanaland is given. This continent persisted as a prominent feature of the Southern Hemisphere from the end of the Palaeozoic, through the whole length of the Mesozoic to the beginning of the Cainozoic when it disappeared as an entity by fragmentation and drifting away of its constituent blocks, or by their foundering." (D. N. Wadia, *An Outline of the Geological History of India.*)। অর্থাৎ ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া এক অবিভক্ত মহাদেশের যে কল্পনা করা হয় পৃথিবীর শৈশবে তাহার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হইলেও (আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সমস্ত ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক অনুমান মাত্র) যে সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরিবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠ উহার বর্তমান রূপ ধরিতে আরম্ভ করে সেই সকল পরিবর্তন কেনোজইক যুগের সূচনায় ঘটিতে থাকে অথবা মেসোজইক যুগের শেষের দিকে সেই সকল পরিবর্তন ঘটিয়া কেনোজইক যুগের প্রবর্তন হয়। কল্পিত মহাদেশটি এই সময়ে ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং কোন কোন অংশ জলমগ্ন হয়।

এখন এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে যে, টারসিয়ারী আমলের (Tertiary epoch) শেষের দিকে অর্থাৎ প্লিওসিন (Pliocene) যুগে যখন কতকটা মানুষের মত জীবের (Eoanthropus) আবির্ভাব অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ তাহার পূর্বেই ভূপৃষ্ঠের বিরাট পরিবর্তন ঘটিতেছিল। (Wallace-এর মতে, টারসিয়ারী আমলের অধিকাংশ সময়ে সিংহল ও দক্ষিণ ভারত একটি মহাদেশ

বা দ্বীপের অংশ ছিল এবং ইহার উত্তরে ছিল বিস্তীর্ণ সমুদ্র। *Geographical Distribution of Animals.*] ইউরোপের নিয়েনডারথাল জাতির করোটির সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর করোটির সাদৃশ্য কোন কোন পণ্ডিত দেখিতে পাইয়াছেন। কেহ নিয়েনডারথাল জাতিকে, কেহ জাভার Homo Soloensis কে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। এই সকল মতের মূল্য যাহাই হউক, এই কথা বলা যায় যে, ভূবিজ্ঞানীদের অনুমান মতে ভারতবর্ষের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার স্থলপথে সংযোগ যখন লুপ্ত হয়, তখন পৃথিবীতে প্রকৃত নরজাতির (Neanthropic men) অভ্যুদয় হইয়াছে কিনা সম্পূর্ণ সন্দেহের বিষয়। ভারতবর্ষের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার স্থলপথে সংযোগকে ভিত্তি করিয়া যাহারা দ্রাবিড় জাতি বা প্রাক্ দ্রাবিডীজাতি ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের একই গোষ্ঠীত্ব প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন তাঁহাদের উৎসাহের প্রশংসা করিলেও বিচার শক্তির প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু আপাতঃ চিত্তাকর্ষক কোন মতবাদ একবার প্রচারিত হইলে তাহা যতই অসার হউক না কেন, তাহার জড় সহজে নষ্ট হয় না, বরং নূতন নূতন সমর্থক আবির্ভূত হইয়া উহার জীবনীশক্তি আরও বাড়াইয়া দেন। একজন উৎসাহী পণ্ডিত আমাদিগকে বলিতেছেন, " Geology and natural history alike make it certain that at a time *within the bounds of human knowledge* Southern India did not form part of Asia. A large southern continent, of which this country once formed part, has ever been assumed as necessary to account for the different circumstances." তারপর আরও অগ্রসর হইয়া তিনি বলিতেছেন, "The Sanskrit Pooranic writers, the Ceylon Buddhists, the local traditions of the West Coast, all indicate a great disturbance of the point of the Peninsula within recent times." টারসিয়ারী যুগ হইতে এক নিঃশ্বাসে বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগে অবতরণ অসাধারণ উল্লম্ফন দক্ষতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই!

ভূবিজ্ঞানিগণের অনুমানকে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর এক গোষ্ঠীত্ব প্রমাণ করিবার যুক্তি হিসাবে Haeckel, Huxley, Keane, Dr. Maclean, Prof. Semon প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এবং আরও

অনেকে ব্যবহার করিয়াছেন। যে সকল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও ইউরোপের নিয়ানডারথাল জাতির করোটির মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পান তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়া ও প্রস্তর যুগের ইউরোপ, এই উভয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ সেতুস্বরূপ ছিল, এইরূপ মনে করেন।

সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার স্থানাভাব। দ্রাবিড জাতির কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছে, পরে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এক দল পণ্ডিত দক্ষিণ ভারতের সকল আদিবাসীকে দ্রাবিড় জাতীয় বলেন। Sir Herbert Risley এই দলের। আরেক দল প্রাক্ ও দ্রাবিড় এই দুই ভাগে তাহাদের ভাগ করেন। প্রাক্-দ্রাবিড বলিতে যাহাদিগকে দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতি বলা হইতেছে তাহাদের বুঝায়। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ এই সকল উপজাতিকে বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর সহিত এক গোষ্ঠীয় বলিয়া মনে করেন। এ পর্যন্ত কোন জটিলতা নাই। জটিলতা দেখা দেয় যখন একগোষ্ঠীত্ব প্রমাণ করিবার প্রশ্ন ওঠে।

প্রথমতঃ, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতি, বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর দৈহিক লক্ষণের যে অসাদৃশ্য দেখা যায় তাহা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ হইতে ভারত মহাসাগর ডিঙ্গাইয়া সুদূর অষ্ট্রেলিয়া বা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে এক গোষ্ঠীর লোকের যাতায়াত কখন কি ভাবে হইয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়। তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়ার পথে বিভিন্ন অঞ্চলে নেগ্রিটো, মেলাশিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন গোষ্ঠীর উপস্থিতির সহিত ভারতবর্ষ ও বহু দূর ব্যবধানে অবস্থিত অষ্ট্রেলিয়ার একগোষ্ঠীর লোকের উপস্থিতির সামঞ্জস্য সাধন করা প্রয়োজন হয়। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, Palaeo-botany, Palaeontology, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং অনুমানের সাহায্যে এই সকল প্রশ্নঘটিত জটিলতার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উপরে অতি সংক্ষেপে এই প্রয়াসের বিবরণ দেওয়া হইল। যাঁহারা বিভিন্ন আমলের অনুন্নত মনুষ্য সমাজের সামাজিক প্রথা, ব্যবহার প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বোর্ণিওর ডায়াক (Dyaks) ও আন্নামালাই পর্বতমালার কাদারদিগের মধ্যে বৃক্ষে বাস করিবার প্রথা (Tree-climbing), মালয়ের জাকুন (Jakuns) এবং কাদার ও ত্রিবাঙ্কুরের

মালবেদানদিগের দাঁত ঘষিয়া সূচাল করিবার প্রথা, শকাই, পাচ্ছান, সেমাং এবং কাদারদিগের মধ্যে নক্সাকাটা বাঁশের চিরুনীর ব্যবহার এবং বর কর্তৃক কনেকে ঐরূপ চিরুনী উপহার দিবার প্রথা ইত্যাদির উল্লেখ করেন, দক্ষিণ ভারতবর্ষের ও ইন্দোনেশিয়ার আদিবাসীদিগের মধ্যে কৃষ্টিগত ও তাহা হইতে জাতিগত সম্পর্ক প্রমাণ করিবার জন্য। এই শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণের মূল্য অস্বীকার করিবার হেতু নাই, কিন্তু ভূবিজ্ঞানীর অনুমানকে এই সকল উপজাতির একগোষ্ঠীত্বের প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহার পরিপোষক হিসাবে এই কৃষ্টিগত সাদৃশ্যের যুক্তি ব্যবহার করা হয় বলিয়া যে জটিলতার উল্লেখ করা হইয়াছে সেই জটিলতা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীদিগের যাঁহারা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড নাম দিয়া থাকেন তাঁহারা বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর সহিত তাহাদের দৈহিক লক্ষণের অসাদৃশ্য স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে অন্য যে সকল প্রশ্ন উঠে তাহা অমীমাংসিত রাখিয়া এই মত গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ ভারতে নেগ্রিটো, মেলানেসিয়ান, বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ান গোষ্ঠী হইতে পৃথক, লম্বামুণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপ্টা নাক, খর্বকায়, কুঞ্চিত কেশ একটি মনুষ্যগোষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায় যাহাকে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠী বলা হইয়া থাকে।

অতঃপর দক্ষিণ ভারতের এই গোষ্ঠীর সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদিগের সম্পর্কের আলোচনা করা হইবে।

পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসী

পূর্ব ও মধ্য ভারতের আদিবাসী অঞ্চলকে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করা যাইতে পারে। (১) সাঁওতাল এলাকা :—এই এলাকার প্রধান অধিবাসী মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাভাষী সাঁওতাল। সাঁওতাল পরগণার বাহিরে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য, বিহারের ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের এবং বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায় ইহাদিগকে দেখা যায়। সৌন্তা ও করমানী সাঁওতাল গোষ্ঠীয়। সৌন্তাদিগকে মধ্যপ্রদেশে দেখা যায়। মাহিলীগণ এই গোষ্ঠীয়। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী মাল পাহাড়িয়া, সৌরিয়া পাহাড়িয়া ও মালের এই এলাকায় বাস করে। সাঁওতাল গোষ্ঠীর মোট সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ ২৪

হাজার। (২) ছোটনাগপুর এলাকা :—হো, মুণ্ডা, ওরাওঁ এই এলাকার প্রধান অধিবাসী। ইহা ব্যতীত খারিয়া, করওয়া, চেরো, বিরহর, ভূইয়া, ভূমিজ, কোরা, অসুর, তুরী, বিরজিয়া প্রভৃতি উপজাতি এই এলাকায় বাস করে। ইহাদের মধ্যে ওরাওঁদিগের কুরুখ ভাষা দ্রাবিড গোষ্ঠীয়, অন্যান্যের ভাষা মুণ্ডা গোষ্ঠীয়। হো উপজাতির প্রধান বাসভূমি সিংভূম জেলার কোলহানে। উড়িষ্যার কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ও ছোটনাগপুরের দেশীয় রাজ্য সেরাইকোলা ও খারসাওয়ানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মুণ্ডাগণকে ছোটনাগপুর ব্যতীত উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে, বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় ও সাঁওতাল পরগণায় সামান্য সংখ্যায় দেখা যায়। ওরাওঁদিগেব প্রধান বাসভূমি রাঁচি, লোহারডাগা ও পালামৌ। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য, বিহারের চম্পারণ, সাহাবাদ, পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল এলাকাতেও ইহাদিগকে দেখা যায়। খারিয়াদিগকে এই এলাকার বাহিরে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে দেখা যায়। চেরো ও বিরহরদিগকে ছোটনাগপুর এলাকাতেই দেখা যায়। বিরজিয়া ও অসুরদিগকেও এই এলাকাতে দেখা যায়। করওয়াদিগকে এই এলাকার বাহিরে মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ রাজ্যে দেখা যায়। ভূমিজ, কোরা ও তুরীদিগকে এই এলাকার বাহিরে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশ এলাকার প্রধান অধিবাসী গোন্দদিগকে রাঁচিতে দেখা যায়। (৩) উডিষ্যার দেশীয় রাজ্য এলাকা :—এই এলাকার প্রধান উপজাতি খোন্দ, গোন্দ, শবর, জুয়াং ভূইয়া প্রভৃতি। ছোটনাগপুর এলাকার হো, মুণ্ডা, খারিয়া ওরাওঁ, সাঁওতাল এলাকার সাঁওতালদিগকে এই এলাকায় বহু সংখ্যায় দেখা যায়। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলিতে হো-র সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার, খোন্দের সংখ্যা প্রায় ৯৭ হাজার, শবরের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ, মুণ্ডার সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার। গোন্দদিগের প্রধান বাসভূমি মধ্যপ্রদেশ এলাকা। শবরদিগকে এই এলাকার বাহিরে—মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, মাদ্রাজ, রাজপুতনায় এবং অল্প সংখ্যায় যুক্তপ্রদেশে দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই উপজাতির বিভিন্ন শাখা—শোর, শাওরা, শাঁওর, শাহরিয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে গোন্দ ও খোন্দদিগের ভাষা (গোন্দী ও কুই) দ্রাবিড় গোষ্ঠীয়, অন্যান্যের ভাষা মুণ্ডা গোষ্ঠীয়। (৪) মধ্যপ্রদেশ এলাকা :—প্রধান আদিবাসী উপজাতি গোন্দ। তাহাদের মোট সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ

৩৬ হাজার। মারিয়া, মুরীয়া, বৈগা, পরজা, কয়া, ভাতরা, পরধান প্রভৃতি এই এলাকার অন্যান্য উপজাতি। ছোটনাগপুর এলাকার ওরাওঁ, খারিয়া, করওয়া, কোল বা মুণ্ডা প্রভৃতি এবং মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারত এলাকার ভীলদিগকে এই এলাকায় দেখা যায়। প্রায় ৭ হাজার সাঁওতালকে এই এলাকায় দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ভাতরা, পরধান, পরজা, মারিযা, মুরীরা, ওবাওঁ, করকু এবং গোন্দদিগের ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীয়। এই এলাকায় খারিয়া, করওয়া প্রভৃতি মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে। ভীলদিগের ভাষা আর্য গোষ্ঠীয়। (৫) মধ্যভারত এলাকা :—ভীল ও ভীল গোষ্ঠীয় ভীলালা, মীনা প্রভৃতি এই এলাকার প্রধান উপজাতি। মধ্যপ্রদেশের গোন্দ ও বৈগাদিগকে এবং কোল, করকু. শোর বা শৌরিয়া, ভূমিয়া, ভারিয়া প্রভৃতি উপজাতিকে এই এলাকায় দেখা যায়। ইহাদেব সংখ্যা সামান্য। আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের প্রান্ত সীমায় পৌছিয়াছি। গোন্দদিগকে ইন্দোর, ভূপাল, বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডে দেখা যায়। করকুদিগকে ভূপাল ও ইন্দোরে এবং কোল, ভূমিয়া, বৈগা ও ভারিয়াদিগকে রেওয়া অঞ্চলে দেখা যায়। এই এলাকার ভীল গোষ্ঠী ও অন্যান্য উপজাতির অধিকাংশ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। (৬) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাকা :—দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যভাগে হায়দরাবাদ রাজ্যে মধ্যপ্রদেশের গোন্দ, করওয়া, কয়া, মধ্যভারতের ভীল এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরের গাদাবাদিগকে দেখা যায়। চেঞ্চুদিগকে এখানে ও মাদ্রাজের সীমানার মধ্যে দেখা যায়। মাদ্রাজের সীমানার মধ্যে চেঞ্চু ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের গোন্দ, খোন্দ, কয়া, পরজা, শাওরা বা শবরদিগকে দেখা যায়। খোন্দদিগের সহিত সম্পর্কিত কোন্দা ডোরাদিগকে মাদ্রাজের এলাকায় দেখা যায়। কুদিয়া উপজাতিকে কুর্গ ও মাদ্রাজের মধ্যে দেখা যায়। ইহার পরে আমরা দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতির অঞ্চলে প্রবেশ করি।

আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের কতকগুলি উপজাতিকে উপরে বর্ণিত ছয়টি এলাকার একাধিক এলাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যা হিসাবে সাঁওতাল এলাকায় সাঁওতাল, ছোটনাগপুর এলাকায় মুণ্ডা বা কোল, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য এলাকায় খোন্দ ও গোন্দ এবং মধ্যপ্রদেশ এলাকায় গোন্দ

প্রধান অধিবাসী। মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাকায় —একদিকে এই তিনটি এলাকার বিভিন্ন উপজাতি ও অন্যদিকে পশ্চিম ভারত অঞ্চলের ভীল গোষ্ঠীকে উপস্থিত দেখা যায়।

প্রথম তিনটি এলাকার উপজাতিগুলিকে সাধারণতঃ মুণ্ডা গোষ্ঠী, ওরাওঁ গোষ্ঠী এবং গোন্দ গোষ্ঠী—এই তিন ভাগ করা হয়। মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা অষ্ট্রোএশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা। ওরাওঁ ও গোন্দ গোষ্ঠীর ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীয় বলা হয়। ওরাওঁ, তামিল ও কানাড়ী ভাষা এবং গোন্দ, তেলেগু ভাষার সম্পর্কিত। মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাগুলি প্রধানতঃ সাঁওতাল এলাকা, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য এলাকায় ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশ এলাকা ও অন্যান্য এলাকার কোল, করকু প্রভৃতি উপজাতির ভাষা, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের শবর ও গাদাবাদিগের ভাষা এই গোষ্ঠীর। সাঁওতাল এলাকার মালের, মাল পাহাড়িয়া, সৌরিয়া পাহাড়িয়া প্রভৃতির ভাষা ওরাওঁ গোষ্ঠীর। মাল্টো এবং ওরাওঁদিগের ভাষা কুরুখ ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা বলিয়া বর্ণিত হইলেও ওরাওঁরা মুণ্ডা গোষ্ঠীর উপজাতি। খারিয়া মুণ্ডা, কোল মুণ্ডা, ওরাওঁ মুণ্ডা, শবর মুণ্ডা প্রভৃতি মুণ্ডা উপজাতির শাখার নাম। গোন্দ গোষ্ঠীর ভাষা উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য এলাকা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাকায় প্রচলিত। কয়া, মারীয়া, কুই, পরজি প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন শাখা।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আদিবাসী উপজাতিদিগের মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসী উপজাতি-দিগকে হিন্দু সমাজের নিম্ন স্তরের অংশ বলিয়া গণনা করা হয়। বর্তমানে যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি, সেই অঞ্চলের প্রধান উপজাতিদিগের কতক অংশ হিন্দু সমাজের মধ্যে আসিয়াছে। ফলে কতকগুলি নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন করমানী হইতে কুর্মি, ওরাওঁ হইতে ধাঙ্গর, মুসাহর, গোন্দ হইতে ধালওয়ার, কামার, কাবার প্রভৃতি। এই সকল নূতন জাতি উপজাতীয় ভাষা ত্যাগ করিয়া হিন্দী বা উড়িয়া এবং সাঁওতাল এলাকায় বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতেছে। সিংভূমের কোলহান অঞ্চলে বাংলা, হিন্দী ও হো ভাষা ব্যবহার করে এরূপ উপজাতীয় লোকের দেখা পাওয়া যায়। যাহারা নিজের ধর্ম মানিয়া চলে তাহাদের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইলেও

অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তিত নামে হিন্দু দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের উপাস্যগণও পূজিত হন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আদিবাসী উপজাতির দেব-দেবীর উপাসনা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গবেষণাব বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

Sir Herbert Risley ছোটনাগপুর এলাকার বিরহর, ওরাওঁ, খারিয়া, মুণ্ডা, করওয়া অসুর, সাঁওতাল এলাকার সাঁওতাল, মালের, মাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাঁওতাল-দিগের বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, "—The Santals may be regarded as typical examples of the pure Dravidian stock." তাহাদের মস্তকের গঠন লম্বা (approaching the dolichocephalic), নাক চ্যাপ্টা, প্রায় নিগ্রোদের মত এবং চুল অমসৃণ ও কুঞ্চিত। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, Risley-এর দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্য নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর প্রাক্‌-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় গোষ্ঠী অন্তর্ভূত। ডাঃ গুহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারত ও আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের সকল আদিবাসী উপজাতি এক গোষ্ঠীয়। এই গোষ্ঠীর নাম প্রোটোঅষ্ট্রালয়েড এবং যাহারা মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা সাঁওতালী, খারওয়ারী, হো, করমালী, জুয়াং, খারিয়া, মুণ্ডারী, শবর, গাদাবা প্রভৃতি এবং কুরুখ, মাল্টো গোন্দী, কুই, কয়া, পরজি প্রভৃতি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে এইরূপ প্রধান আদিবাসী অঞ্চলের সকল উপজাতি ও দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব আদিবাসী উপজাতি, যাহারা দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। মস্তকের গঠন, নাসিকা ও মুখের গঠন (projection of the face), চুলের প্রকৃতি, গায়ের রং ইত্যাদিতে দক্ষিণ ভারতের উপজাতি ও মধ্যভারতের উপজাতিদিগের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিতেছেন যে, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী এবং মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিবাসীদিগের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ পার্থক্য (বিশেষ করিয়া প্রথম দলের মধ্যে নাসিকার গঠনে) দেখা যায়, তাহা অন্যান্য গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের ফল। এই অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি শুধু নেগ্রিটোর নাম করিয়াছেন। Eickstedt-এর মতে এই দুই অঞ্চলের আদিবাসীর মূল গোষ্ঠী বেদ্দিদ। মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিবাসী তাঁহার মতে বেদ্দিদ গোষ্ঠী, গোন্দ

শাখাভুক্ত। Dixon এই অঞ্চলের আদিবাসীর মধ্যে প্রোটো-নিগ্রোয়েড, Hutton অস্পষ্ট মোঙ্গলীয় লক্ষণ এবং Haddon মোঙ্গলীয় লক্ষণের অস্তিত্ব দেখিতে পান। এই লক্ষণগুলি কি এবং কিভাবে উহা আসা সম্ভব হইতে পারে তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। নেগ্রিটো ও মোঙ্গলয়েড টাইপের গোলমুণ্ডের সহিত মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিবাসীর লম্বা মুণ্ডের সামঞ্জস্য সাধন করা কিভাবে সম্ভব তাহাও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ইঁহাদের অনুসরণ করিয়া একজন ভারতীয় পণ্ডিত এই অঞ্চলের আদিবাসীর মধ্যে প্যালিও-মোঙ্গলয়েড লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা আবিষ্কারের দাবি প্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব স্বীকার করা তিনি বাহুল্য মনে করিয়াছেন। Giuffrida-Ruggeri এই অঞ্চলকে মুণ্ডা-কোল অঞ্চল নাম দিয়াছেন এবং তাহার মতে এই অঞ্চলের আদিবাসীরা বেদ্দা গোষ্ঠীয়। মুণ্ডা-কোল অঞ্চল এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বর্তমান ছিল। আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পর যাহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহারা এই বেদ্দা গোষ্ঠীয় ও মুণ্ডা ভাষাভাষী আদিবাসী। আর্যগণ তাঁহাদের শত্রুদিগের যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিরক্ষ অঞ্চলের অধিবাসীদিগের দৈহিক লক্ষণের সহিত মিলে (protomorphic equatorial characters), যথা—খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপ্টা নাক।

Col Sewell-এর মতের সমর্থন করিয়া Dr. Hutton বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষের এই প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠী সম্ভবতঃ পশ্চিম এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহার নিজের মত এই যে, ভারতবর্ষের এই প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠী পশ্চিম এশিয়া হইতে আসিয়া থাকিলেও এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসূচক যে সকল লক্ষণ বর্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষেই সেগুলির উৎপত্তি বা বিকাশ হইয়াছে ("its special features have been finally determined or permanently characterised in India itself.")। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে কৃষ্ণবর্ণ ও চ্যাপ্টা নাক দেখা যায় তাহা এই গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের ফল। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা ও কালাত হইতে কারেণী পর্যন্ত সর্বত্র, বিশেষতঃ সমাজের নিম্ন স্তরের মধ্যে এবং উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে এই সংমিশ্রণ অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে। Giuffrida-Ruggeri-এ অভিমতের উল্লেখ

১নং প্লেট

নেগ্রিটো টাইপ

১— আন্দামানের একজন স্ত্রীলোক

২, ৩—কোচিন পার্বত্য অঞ্চলের কাদার

৪—রাজমহল পাহাড়ের আদিবাসী

প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড টাইপ

৫—হায়দারাবাদের চেঞ্চু

৬—কোচিনের মলয় উপজাতির স্ত্রীলোক

মোঙ্গলয়েড টাইপ

৭—উত্তর-পূর্ব তিব্বতের মোঙ্গল

৮— নাগা পাহাড়ের সেমা নাগা

মূল লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী

৯, ১০—মাদুরার তামিল ব্রাহ্মণ

১১—কোচিন ইল্লুভ মহিলা

১২—ভিজাগাপটমের তেলেগু ব্রাহ্মণ

সিন্ধু বা মেডিটারেনীয়ান টাইপ

১৩—কোচিনের নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ

১৪—কোচিনের নায়ার মহিলা

১৫—পাটনার বিহারী ব্রাহ্মণ

১৬—কলিকাতার কায়স্থ মহিলা

২নং প্লেট

ওরিয়েণ্টাল বা প্রাচ্য টাইপ

১—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খো
২ --রাজস্থানের বেনিয়া
৩—পাঞ্জাবের ছত্রী
৪ মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ মহিলা

আলেপা-দিনারিক টাইপ

৫—-কাথিয়াবাড়ের কাঠি
৬—-গুজরাটের বেনিয়া
৭—আহমেদাবাদের পার্শী মহিলা
৮—মহীশূরের কানাড়ী ব্রাহ্মণ
৯—রেওয়ার বাঘেল রাজপুত
১০—কলিকাতার ব্রাহ্মণ মহিলা
১১—কলিকাতার বৈদ্য মহিলা
১২—কলিকাতার বাঙালী কায়স্থ

প্রোটো-নর্ডিক টাইপ

১৩— রাম্বুরের (উঃ পঃ সামান্ত প্রদেশ) কাফির
১৪ —রাম্বুরের (উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ) খালাস
১৫ —চিত্রলের (উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ) খো
১৬—রাজউরের (উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ) পাঠান

১নং প্লেটের ১, ২, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০ এবং ২নং প্লেটের ৪, ৫, ১১, ১৩ ও ১৬ চিত্রগুলি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের Census Report of India I. Pt. 3 হইতে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি-ক্রমে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত ডাঃ বি. এস. গুহের *An Outline of the Racial Ethnology of India* (১৯৩৭) নামক প্রবন্ধে গৃহীত হইয়াছে। এই চিত্রগুলি এবং অন্য চিত্রগুলি এই প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।
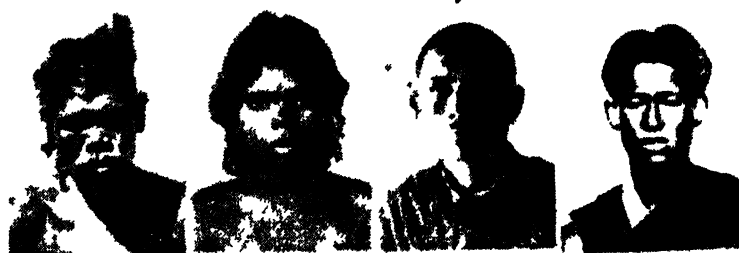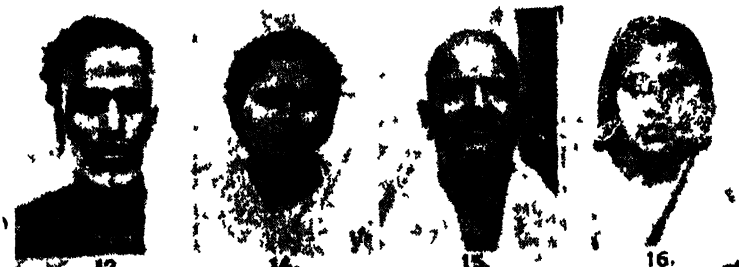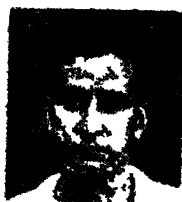
১নং প্লেট

২নং প্লেট

করা হইয়াছে। তিনি রমাপ্রসাদ চন্দের মত গ্রহণ করিয়াছেন। যাস্কের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া চন্দ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদে যে পঞ্চজনের উল্লেখ পুনঃপুনঃ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অর্থ চারি বর্ণ ও নিষাদ। মহাভারতের শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায় হইতে দেখা যায় বেণ রাজার উরুদেশ হইতে নিষাদ জাতির উৎপত্তির কাহিনী বর্ণি• হইয়াছে। নিষাদগণ অরণ্য ও পর্বতে (বিন্ধ্য পর্বতের উল্লেখ আছে) বাস করে। তাহারা খর্বকায় ও অঙ্গারের মত কৃষ্ণবর্ণ। চন্দ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের নিষাদগণের বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণে নিষাদগণকে দগ্ধ স্তম্ভের মত খর্বমুখ, অতি হ্রস্বকায় ও বিন্ধ্যশৈল নিবাসী বলা হইয়াছে (১।১৩।৩৪-৩৬)। চন্দের মত এই যে, উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে বৈদিক আর্যগণ এই নিষাদদিগের সাক্ষাৎ পান, তাহারাই বৈদিক আর্যগণের অনার্য শত্রু। প্রাচীন সাহিত্যে নিষাদদিগের যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিষাদগণ মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারতের গোন্দ ও ভীল, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের আদিবাসী উপজাতি ও অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের পানিয়ান, কাদির, শোলাগা, ইরুলা, মাল, বেদার প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতিগুলির সহিত সম্পর্কিত। অর্থাৎ আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের ও দক্ষিণ ভারতে আদিবাসী উপজাতিগুলি এক গোষ্ঠীর এবং আর্যগণ এই গোষ্ঠীর নাম দিয়াছেন নিষাদ। তাঁহার অভিমত এই যে, আর্য ভাষাভাষী ভীল গোষ্ঠী, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী গোন্দ, খোন্দ, ওরাওঁ প্রভৃতি ও দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলি এবং উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল এলাকার মুণ্ডা ভাষাভাষী উপজাতিগুলি সকলেই, অর্থাৎ নিষাদ গোষ্ঠীর সকল শাখাই গোড়ায় মুণ্ডা ভাষা ব্যবহার করিত। ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নেগ্রিটো সংমিশ্রণ যাহাদের মধ্যে নাই, ভারতবর্ষের সেই সকল আদিবাসী উপজাতিগুলিকে নিষাদ গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ("The term Nisadic should henceforth be used to designate the non-Negritoid Indian aborigenes"), অর্থাৎ প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড, প্রাক্-দ্রাবিড়ীয়, বেদ্দাইক প্রভৃতির নামের পরিবর্তে চন্দের ব্যাখ্যা মতে নিষাদ গোষ্ঠী এই নাম ব্যবহার করা যাইতে পারে। Hutton প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর

বৈশিষ্ট্যসূচক দৈহিক লক্ষণের বিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এবং বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ানদিগের দৈহিক লক্ষণ হইতে দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসী উপজাতিগুলির দৈহিক লক্ষণের পার্থক্য সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরে ডাঃ গুহের পরামর্শ সকলের গ্রহণ করা উচিত।

রমাপ্রসাদ চন্দের মত এই যে, নিষাদ গোষ্ঠীর সকল শাখা গোড়ায় মুণ্ডা ভাষা ব্যবহার করিত। এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মধ্যে বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। এই ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কি বলেন সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতিগুলির কথা বলিবার সময় এই প্রসঙ্গ পুনরায় উঠিবে।

মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। মুণ্ডা উপজাতির নাম হইতে এই সকল ভাষাকে মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা বলা হয়। মুণ্ডা ভাষা অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর একটি শাখা এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহার অন্যান্য শাখা (১) নিকোবর দ্বীপগুলির অধিবাসীদিগের ভাষা, (২) আসামের খাসী ভাষা, (৩) উত্তর ব্রহ্মের স্যালউইন নদবাহিকার পালং, ওযাং, রিযাং প্রভৃতির ভাষা, (৪) মালয় উপদ্বীপের শকাই ও সেমাংদিগের ভাষা এবং (৫) বহির্ভারতের মন-খ্মের (Mon-Khmer) ভাষা। এই সকল ভাষার কল্পিত মূলগোষ্ঠীর অষ্ট্রো-এশিয়াটিক নাম দিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানী Pater Schmidt। পণ্ডিত Sten Konow গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—পূর্ব হিমালয়ের যে সকল ভাষাকে তিব্বত-ব্রহ্ম গোষ্ঠীয় বলা হয় তাহার কতকগুলির মধ্যে Grierson-এর pronominalised languages) মুণ্ডা ভাষার প্রভাবের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ বলা হইয়াছে যে ভৌগোলিক ব্যাপ্তি বিচার করিলে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার মত বিস্তার আর কোন ভাষার নাই। উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড এবং পশ্চিমে মাডাগাস্কার হইতে পূর্বে ইষ্টার দ্বীপ পর্যন্ত এই ভাষার বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত শুধু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলিতে নহে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সুমেরীয় ভাষার সহিত মুণ্ডা ভাষার সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা পূর্বে উল্লিখিত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের কল্পিত বিশাল দক্ষিণ

মগাদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। একরূপ বলা যাইতে পারে যে, Pater Schmidt এই অনুমানের পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে ভাষা-তাত্ত্বিক সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন। ভাষা যখন ছিল তখন সেই ভাষা ব্যবহারকারী জাতিও ছিল, এই যুক্তি লোকে নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। অবশ্য কতগুলি কথার উপরে এই অর্ধ-পৃথিবীব্যাপ্ত ভাষা দাঁড় করান হইয়াছে, সে বিচারের ভার তাহারা বিশেষজ্ঞদিগের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। যাহা হউক, এইভাবে একটি অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতবর্ষের আদিবাসী উপজাতিগুলি, বৃহত্তর ভারতের কতকগুলি উপজাতি, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়ার এবং মাডাগাস্কার হইতে পূর্বদিকে প্রসারিত ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীদের কল্পিত লুপ্ত যোজকের রেখার মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলগুলির কৃষ্ণকায় অধিবাসী অষ্ট্রিক ভাষাভাষী। সম্ভবতঃ ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ অমিল বলিয়া দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন লম্বামুণ্ড, চ্যাপ্টা নাক এবং সম্ভবতঃ কৃষ্ণকায় লাগোয়া স্যান্টা টাইপকে অষ্ট্রিক জাতির মধ্যে গণনা করা হয় নাই এবং আফ্রিকার প্রধান ভূভাগ বাদ পড়িয়াছে। Haddon পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের প্রাচীন মনুষ্য গোষ্ঠীর সহিত লাগোয়া স্যান্টা টাইপের সম্পর্ক নির্দেশ করিতে ইচ্ছুক।

ভারতবর্ষের কৃষ্ণকায় অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের প্রয়াস সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণ করিলে ঘুরিয়া ফিরিয়া একবার ভূতাত্ত্বিক, পুনরায় ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের বলে কেন যে ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগকে এশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত কতকগুলি কৃষ্ণকায় মনুষ্য গোষ্ঠীর অঞ্চলের, বিশেষ করিয়া সুদূর অষ্ট্রেলিয়ার সহিত যুক্ত করিবার উদ্যম দেখা যায়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। Pater Schmidt-এর মত এখন প্রবল। ভারতবর্ষের আদিবাসী নিষাদ গোষ্ঠী যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের দিক দিয়া একটা পৃথক মনুষ্য গোষ্ঠী, কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ভাষার দিক দিয়া মুণ্ডা ভাষার একটি পৃথক গোষ্ঠীর ভাষা হওয়া সম্ভব কিনা, ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানী বলিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের নিষাদ গোষ্ঠী গোড়ায় বাহির হইতে আসিয়াছিল কিনা এবং আসিয়া থাকিলে কোন্ পথে আসিয়াছিল তাহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে এবং এই প্রশ্ন

অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতেছে। আলোচনার ফলে এই তথ্য মিলিতেছে যে, ভারতবর্ষের আদিবাসী উপজাতিগুলি গোড়ায় এক গোষ্ঠীভুক্ত, এক ভাষাভাষী একটি জাতি ছিল।

মধ্যভারত এলাকায় ও সমগ্র পশ্চিম ভারতে ভীলগোষ্ঠী প্রধান আদি-বাসী উপজাতি। আজমীর মাড়বার, পশ্চিম ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বোম্বাই, বরোদা ও হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ ২৫ হাজার ভীলগোষ্ঠীয় উপজাতি ছড়াইয়া আছে। মধ্যভারতে ভীল্লি ভাষা ব্যবহার করে প্রায় ৬ লক্ষ লোক, রাজপুতানা প্রায় ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার। রাজপুতানায় ডুঙ্গারপুর, কোটা, কুশলগড ও মেবার ভীলদিগের প্রধান আড্ডা। বরোদায় তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৫৪ হাজার। মধ্যভারত দেশীয় রাজ্যের এলাকার দক্ষিণ অংশে প্রায় ২ লক্ষ ভীলালা উপজাতির বাস। মধ্যপ্রদেশে ইহাদের সংখ্যা ১৫ হাজার। বরোদা রাজ্যে প্রায় ৩৮ হাজার তদবী ও বাসওয়া বাস করে। ইহারা ভীল-গোষ্ঠীর শাখা। সিরোহী, মেবার ও মাড়বারের প্রায় ৩০ হাজার গ্রাসিয়া বা গিরসিয়াকে ভীল গোষ্ঠীর শাখা বলা হয়। ভীলগোষ্ঠীর ভাষার অন্যান্য শাখার মধ্যে ওয়াগদী বা বাগদী প্রায় আড়াই লক্ষ ও ভীলোদী প্রায় ৬০ হাজার লোক ব্যবহার করে। মীনা ও মিওদিগকে ভীল গোষ্ঠীয় বলা হয়। মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্য, আজমীঢ়, মাড়বার ও রাজপুতানায় মীনাদিগকে দেখা যায়। রাজপুতানায় তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ, গোয়ালিয়রে প্রায় ৬৭ হাজার। রাজপুতানার জয়পুর, মেবার, কোটা, টঙ্ক ও আলোয়ারে ইহাদিগকে বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। মিওদিগের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার। আলোয়ার ও ভরতপুর অঞ্চলে ইহাদিগকে বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। ইহারা ছাড়া ববেলা, ধাঙ্কা, মাঙ্কর, সবটী, পথিয়া, বার্থিয়া প্রভৃতি উপজাতিকে ভীলগোষ্ঠীর মধ্যে গণনা করা হয়। সকল শাখা লইয়া ভীলগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ধরা হয়। ধাঙ্কাদিগকে বরোদা ও রাজপুতনায় দেখা যায়। সবটী, তদভী প্রভৃতিকে প্রধানতঃ বরোদা রাজ্যের এলাকায় দেখা যায়। রাজপুতানা ও আজমীঢ়-মাড়বারের মেড় ও মেয়াটদিগকে ভীল গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা হয়, কিন্তু ভীল গোষ্ঠীর অন্তর্ভূ‍ক্ত করা চলে কি না সন্দেহের বিষয়। ইহারা সম্ভবতঃ মেড় জাতির শাখা এবং

ঐতিহাসিক যুগে, খুব সম্ভব ৩য় হইতে ৫ম খৃষ্টাব্দে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। রাজপুতানা ও আজমীঢ-মাড়বারের অধিকাংশ মেড মুসলমান। রাজপুতানার বাহিরে পাঞ্জাবের গুরুগাঁও জেলা ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ মিওদিগের একটি প্রধান অঞ্চল ছিল। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম মেওয়াট। মেওয়াটের প্রাচীন যদুবংশীয় রাজপুত রাজবংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এবং খানজাদা নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে মিওগণ এই অঞ্চলের লোক সংখ্যার ⅙ অংশ। আরাবল্লী পর্বতমালার মীনা উপজাতির সহিত ইহারা সম্পর্কিত। মিওগণ মুসলমান।

ভীলগোষ্ঠীর এই সকল উপজাতি ব্যতীত আর যে সকল উপজাতিকে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়, তাহারা ধর্মে ও ভাষায় হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। চোধ্র, ধোদিয়া, ডুব্রা, গামিত, কোকনা, বলন্দ প্রভৃতি কোন প্রধান আদিবাসী উপজাতির সহিত সম্পর্কিত কিনা তাহা বলা কঠিন। সাঁওতাল ও ছোটনাগপুর এলাকার তুরীদিগকে অল্প সংখ্যায় পশ্চিম ভারতে দেখা যায়। মুণ্ডাগোষ্ঠীর নাইয়াদের সম্ভবতঃ নাই নামে মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারতীয় দেশীয় রাজ্য ও রাজপুতানা অঞ্চলে দেখা যায়। মধ্যভারত ও আজমীঢ-মাড়বারের লোধা সম্ভবতঃ মধ্যপ্রদেশ এলাকার লোধির সহিত সম্পর্কিত। পশ্চিম ভারতের বৃহৎ কোলি গোষ্ঠীকে কেহ কেহ মুণ্ডাগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করেন। আজমীঢ-মাড়বার, রাজপুতানা, বোম্বাই, বরোদা, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে কোলি গোষ্ঠীর প্রায় ৩৪ লক্ষ লোক বাস করে। Hamilton ও Todd-এর মতে কোলি আদিবাসী উপজাতি, কিন্তু Cunningham ও Elliot প্রভৃতির মতে কোলি ও মেড় এক গোষ্ঠীয় এবং শ্বেত হুনদিগের দলে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উত্তর গুজরাট ও কাথিয়াবাড় ইহাদের প্রধান বাসভূমি।

Risley ভীলদিগকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ভীল গোষ্ঠীকে মধ্য ও পূর্ব ভারত ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলির একগোষ্ঠীয় অর্থাৎ নিষাদ গোষ্ঠীয় বলিয়া মনে করেন পূর্বে একথা বলা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ভীল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি অরণ্য এবং পর্বতনিবাসী উপজাতিকে পুনঃপুনঃ একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাতপুরা পর্বতমালার ভীলদিগের কোন কোন অংশ ব্যতীত ভীলগণ সর্বত্র হিন্দুদিগের ভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দক্ষিণ, মধ্য, পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে এক গোষ্ঠীয়। এখন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতিগুলির এই নিষাদগোষ্ঠীর সহিত কোনরূপ সম্পর্ক আছে কিনা তাহা দেখা যাইতে পারে।

আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের উপজাতি

আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তের উপজাতিগুলির সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে আসাম হইতে উত্তর ও পূর্ব দিকে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, অধিবাসীদিগের মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ ততই পরিস্ফুট দেখা যাইবে। আসাম সীমান্তের এই লম্বা মুণ্ড, মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপজাতিগুলিকে উত্তর পশ্চিমের লাডাক ও পূর্ব হিমালয়ের ভুটান, সিকিম, দার্জিলিং ও নেপালের মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপজাতিগুলি হইতে একটি পৃথক গোষ্ঠীর বলিয়া মনে করা হয়। ডাঃ গুহের ব্যাখ্যা এই যে লাডাকী, লালুলী, লিম্বু, লেপ্‌চা, রঙ্গপা, ভোট ও নেপালের উপজাতিগুলির মধ্যে অন্য একটি টাইপের সঙ্গে মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত বা তিব্বতী টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে। আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের উপজাতিগুলির মধ্যে যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায় উহা দক্ষিণ পশ্চিম চীন হইতে আগত ইন্দো-চাইনীজ গোষ্ঠীয় বিভিন্ন উপজাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই গোষ্ঠী ব্রহ্ম ও মালয়ের মধ্য দিয়া ইন্দোনেশিয়ান আইল্যাণ্ডস্ বা দ্বীপময় ভারতে প্রস্থান করে। এই জাতির কয়েকটি দল বিচ্ছিন্ন হইয়া আসামে রহিয়া যায়। মিরি, বোদো, নাগা এই গোষ্ঠীভুক্ত। লুসাই পর্বতমালার পশ্চিমে ও দক্ষিণে এই ইন্দো-চাইনীজ গোষ্ঠীর পৃথক একটি শাখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাখার লোক গোলমুণ্ড, অপেক্ষাকৃত ময়লা রঙের এবং আসাম সীমান্তের উপজাতিগুলি অপেক্ষা মালয়ের অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের সম্পর্ক অধিক বলিয়া মনে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, আরাকান-ইয়োমা পর্বতমালার মগ এই শাখাভুক্ত। সে যাহা হউক, শানগোষ্ঠীয় উপজাতিদিগের আসাম অধিকার এবং বর্মী ও আরাকানীদের যুদ্ধবিগ্রহ ঐতিহাসিক আমলের ব্যাপার। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপজাতিসমূহ অতি প্রাচীন

কাল হইতে আসামের সীমান্ত অঞ্চলে বাস করিতেছে। ইহারা ছাড়া আসামের কোন আদিবাসী উপজাতি ছিল কিনা এই প্রশ্ন উঠিবে।

আসামের উপজাতি

Dr. Haddon আসামের অধিবাসীদিগের মধ্যে ১। লম্বামুণ্ড, চাপ্টা নাক, ২। লম্বামুণ্ড, মধ্যমাকৃতি নাক ৩। মধ্যমাকৃতি মুণ্ড, চাপ্টা নাক ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক দেখিতে পান। প্রথম গোষ্ঠীকে তিনি নিষাদগোষ্ঠীর (Pre-Dravidian বা Proto-Australoid) সহিত সম্পর্কিত মনে করেন। খাশী, কুকী, মণিপুরী ও কাছারী তাঁহার মতে এই গোষ্ঠীভুক্ত। দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে তিনি নেসিয়ট নাম দিয়াছেন। নেসিয়ট নাম দিবার তাৎপর্য এই যে তাঁহার মতে এই গোষ্ঠীর লোক দ্বীপাঞ্চল হইতে আসিয়াছে বা দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত ইহাদের সম্পর্ক আছে। দ্বীপাঞ্চল বলিতে এখানে দ্বীপময় ভারত বুঝাইতেছে। তাঁহার মতে নাগা ও অন্যান্য উপজাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে যে, নাগাদিগের মধ্যে তাঁহার মতে দুই প্রকারের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তৃতীয় গোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত লোক তিনি খাশীদের মধ্যে পাইয়াছেন এবং তাহার মতে বর্মী, পালাউং, দক্ষিণ চিন ও কাচিনদিগের মধ্যে ও ছোটনাগপুর এলাকায় এই টাইপ প্রবল। চতুর্থ একটি গোষ্ঠীর লক্ষণ তিনি লেপ্চা সুর্মী, বঙ্গদেশের কতকগুলি জাতি (নাম দেওয়া নাই) ও বিহারের দোসাদ, কুর্মী প্রভৃতি জাতির মধ্যে পাইয়াছেন। পঞ্চম আরেকটি গোষ্ঠীর লক্ষণ তিনি ব্রহ্ম হইতে আগত উপজাতির মধ্যে পাইয়াছেন। এই গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হইয়াছে Parooean, অর্থাৎ দক্ষিণ মোঙ্গলগোষ্ঠী। পীতকায় মনুষ্যগোষ্ঠীর প্রসঙ্গে ইহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। Haddon-এর অভিমতের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতেছি প্রাক-দ্রাবিড়ীয় আদিবাসীদিগের দুইটি দৈহিক লক্ষণ—লম্বা মুণ্ড ও চ্যাপ্টা নাক তিনি খাশী, কুকী, মণিপুরী ও কাছারী উপজাতিগুলির মধ্যে পাইতেছেন। নাগাদিগের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ান টাইপের লক্ষণ পাইতেছেন। মধ্যমাকৃতি মুণ্ড ও চ্যাপ্টা নাক তিনি খাশীদিগের ও ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাসীদিগের মধ্যে পাইতেছেন। ইহার অর্থ খাশীদিগের (এবং নাগাদিগের মধ্যে) ও

ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাসীদিগের মধ্যে তিনি দুই প্রকার টাইপ দেখিতে পান। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে, মাত্র দুইটি লক্ষণ—মস্তক ও নাসিকার আকৃতি হইতে Haddon খাশী, কুকী, মণিপুরী, কাছারী, ব্রহ্মের কাচিন, চিন, পালাউং প্রভৃতির সহিত ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাসীরা সম্পর্কিত এইরূপ মনে করেন। Dr. Hutton-এর মত এই যে, আসাম ও ব্রহ্মের মধ্যের পার্বত্য অঞ্চলে মেলানেশিয়ান টাইপ বিশেষ প্রবল দেখা যায়। মেলানেশিয়ান টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, উহা মিশ্রিত নেগ্রিটো ও প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড সংমিশ্রণের ফল। ("The Melanesian represents a stabilised type derived from mixed Negrito and Proto-Australoid elements."। এখানে নেগ্রিটো কথাটির আগে mixed বিশেষণ ব্যবহার করিয়া Hutton তাহার বক্তব্যকে অস্পষ্ট রাখিতে চাহিয়াছেন কিনা বুঝা যায় না। হয় আমাদের মানিয়া লইতে হইবে যে, মেলানেশিয়ান টাইপ নেগ্রিটো ও প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইতে উৎপন্ন অথবা তাঁহার বক্তব্য এই হইতে পারে যে, আসাম সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে যে মেলানেশিয়ান টাইপ (তাঁহার মতে) দেখা যায়, তাহা নেগ্রিটো ও প্রোটো-অষ্ট্র্যালয়েড সংমিশ্রণের ফল। মেলানেশিয়ান টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় যে, মেলানেশিয়া নামে পরিচিত নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের কৃষ্ণকায়, পশমের মত চুল, চ্যাপ্টা নাক পাপুয়ান গোষ্ঠীর সহিত অপেক্ষাকৃত ফরসা রং, লম্বামুণ্ড, মধ্যমাকৃতির নাসিকা ও সরল বা ঢেউ-খেলান চুলের ইন্দোনেশিয়ান গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে এই টাইপের উৎপত্তি। Haddon-এর মতে ইন্দোনেশিয়ান টাইপের সহিত নেগ্রিটো গোষ্ঠীর পাপুয়ানের সংমিশ্রণের ফলে মেলানেশিয়ান টাইপের উৎপত্তি। Hutton-এর মতে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েডের সহিত নেগ্রিটোর সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। আমরা দেখিতে পাই যে, এই টাইপের উৎপত্তির কারণ যেরূপ অনির্দিষ্ট, ইহার দৈহিক লক্ষণও সেইরূপ অনির্দিষ্ট। চুল উলোট্রিকাস বা কিমোট্রিকাস, দেহের দৈর্ঘ্য অনির্দিষ্ট, গাত্রবর্ণ কাল, তামাটে বা চকোলেট, মস্তকের গঠন লম্বা অথবা গোল, নাক চ্যাপ্টা, কিন্তু কখনও কখনও খাড়া ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণকায় মানুষমাত্রকেই ইচ্ছামত

মেলানেশিয়ান টাইপের বলিয়া নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে, যদি এই টাইপের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন না থাকে।

নেগ্রিটোবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, অঙ্গমী নাগাদিগকে (ইহাদের গাত্রবর্ণ কালো) Hutton একবার নেগ্রিটো ও একবার মেলানেশিয়ান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের কাদার, পানিয়ান প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো, মেলানেশিয়ান ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর সহিত সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। Haddon নাগা, কুকী, মণিপুরী, খাশী, কাছারীকে নিষাদগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত মনে করেন। Hutton মেলানেশিয়ান টাইপ আঁকড়াইয়া থাকিলেও এই টাইপের যে নতন সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেছেন তাহাতে নিষাদগোষ্ঠীকে এড়ান যাইতেছে না। সে যাহা হউক, আসাম সীমান্তের উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নহে। Hutton বলিতেছেন যে, এই অঞ্চলে ও নিকোবরীদিগের মধ্যে মেলানেশিয়ান টাইপ প্রবল এবং এই উভয় অঞ্চলে মেলানেশিয়ানের সহিত মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ আছে। আমরা স্মরণ করিতে পারি যে, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের নিষাদগোষ্ঠীর মধ্যেও অস্পষ্ট মোঙ্গলীয় লক্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। Hutton আরও কিছু অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মদেশের মধ্যে মেলানেশিয়ান টাইপ দেখিতে পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, মেলানেশিয়ান বা Pacific Negro-দিগের মিশ্র টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা সঙ্গত যে, ইন্দোনেশিয়া হইতে পূর্ব মুখে মেলানেশিয়া নামে পরিচিত পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে অভিযান অগ্রসর হইয়াছিল। মেলানেশিয়া হইতে পশ্চিম মুখে ভারতের অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত কোন অভিযান হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা হয় না। মধ্যস্থলে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়া পার হইয়া পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় মেলানেশিয়ান টাইপের পক্ষে কিভাবে আসাম ও ব্রহ্মের সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করা সম্ভব, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত আসাম-ব্রহ্ম সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিগণকে কেহ কেহ নিষাদগোষ্ঠীর সহিত দূরসম্পর্কিত মনে

করেন। এই অভিমত মানিয়া লইলে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, গোড়ায় নিষাদগোষ্ঠীর কতকগুলি উপজাতি এই অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সহিত মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে।

ভাষাতত্ত্ববিদের অভিমত এই অনুমান সমর্থন করে কিনা দেখা যাউক। অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মুণ্ডা, খাশী এবং ব্রহ্মের পালাউং, ওয়া, রিয়াং উপজাতিদের ভাষা ও মন-খেমার (Mon khmer) ভাষা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা বলিয়া মনে করা হয়। Grierson ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, মুণ্ডা ও মন-খেমার ভাষার ভিত্তি এক। শানরাজ্যগুলির পশ্চিম অঞ্চলের ওয়া, রিয়াং ও পালাউংদিগের ভাষাকে মন-খেমের এবং ইহাদিগকে মন খেমার জাতি বলা হয়। ইহার অর্থ ইহাদের মধ্যে পেগুর Tailaing বা মন এবং ক্যাম্বোডিয়ার খেমারদিগের সংমিশ্রণ আছে। কেহ কেহ বলেন মন-খেমার জাতি কল্পনার বস্তু, কারণ খেমারজাতি কুই, হিন্দু প্রভৃতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি যে, Haddon-এর মতে খাশী, কুকী, মণিপুরী, কাছারী নিষাদগোষ্ঠীর সমলক্ষণ যুক্ত (Haddon মাত্র দুইটি দৈহিক লক্ষণের ভিত্তিতে বিচার করিয়াছেন) এবং খাশী, পালাউং ও ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাসী সমলক্ষণযুক্ত (কোন আদিবাসী উপজাতির নাম করা হয় নাই)। এই অভিমত মানিয়া লইলে দাঁড়ায় যে, আসাম সীমান্তের প্রধান উপজাতিগুলি মুণ্ডা ভাষাভাষী নিষাদ-গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত। সুতরাং ভাষার দিক দিয়াও মুণ্ডা ভাষাভাষীদের সহিত মন-খেমার ভাষাভাষী খাশী ও শান সীমান্তের পালাউং, রিয়াং প্রভৃতির ঘনিষ্ঠতা দেখা যাইতেছে। Sten Konow-এর মুণ্ডা ভাষা সম্বন্ধে গবেষণার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিলে সমগ্র পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের উপজাতিদিগের সহিত মুণ্ডা ভাষাভাষী নিষাদ-গোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিল স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করা হইল। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আলোচ্যবিষয়ের সকল অঙ্গ ও বহু প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অভিমতের উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। ইহার একটি কারণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের সকল প্রকার অভিমতের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য হইতে আদিবাসীদিগের বাসভূমি ও সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য হইতে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ও কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত ও নূতন নূতন নামকরণের ফলে যে কুজ্ঝটিকাজাল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের মধ্যে জাতিসংমিশ্রণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আলোচনার ফলে দেখা গিয়াছে যে, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্বভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলিকে দৈহিক লক্ষণ বিচার করিয়া নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা এক গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন। তাঁদের মধ্যে মতান্তর দেখা যায় এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি, ইহার ভারতে প্রবেশ পথ, ইহার মধ্যে অন্যান্য গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সহিত ইহার সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রশ্নে। এই সকল প্রশ্নের আলোচনায় মত বিরোধ ও ব্যক্তিগত অনুমানকে প্রাধান্য দিবার প্রয়াসের প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরাও ভারতবর্ষের আদিবাসী উপজাতিগুলির ভাষাগত এক গোষ্ঠীত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া ভাষাগত ঐক্যের একটা অতি বৃহৎ পরিধি রচনা করিয়া উহার ভিত্তিতে একটি বহু বিস্তৃত মনুষ্যগোষ্ঠীর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে এই মতবাদ অপ্রাসঙ্গিক। দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব-ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর সহিত উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতিগুলির সম্পর্কের আলোচনার ফলে দেখা গিয়াছে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ উভয়েই সম্পর্কের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই অঞ্চলের আদিবাসী উপজাতি বাহিরের মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপজাতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। সংক্ষেপে সমগ্র ভারতবর্ষের আদিবাসী উপজাতিগুলি এক গোষ্ঠীভুক্ত, এই তথ্য আমরা পাইতেছি। এই ঐক্য ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে খণ্ডিত হইয়াছে ব্রহ্ম, শানদেশ ও আরাকানের পথে আগত বিভিন্নগোষ্ঠীয় উপজাতি-সমূহের সহিত সম্ভবতঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ ভারতীয় আদিবাসীদিগের সংমিশ্রণের ফলে। ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তের উপকূল অঞ্চলে সম্ভবতঃ অল্প পরিমাণে বহির্ভারতীয় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে। কেহ এই গোষ্ঠীকে ওশেনিক টাইপ

বলেন, কেহ মেলানেশিয়ান বলেন, আবার কাহারও মতে উহা ইন্দোনেশিয়ান।

ভারতবর্ষের নিষাদগোষ্ঠীর সহিত দক্ষিণ মালয়ের শকাই, সিংহলের বেদ্দা, সুমাত্রার উপকূলভাগের অধিবাসী, সেলিবিসের তোয়ালা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। এই সাদৃশ্যের প্রকৃত পরিমাণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা একমত নহেন। ভারতবর্ষের নিষাদগোষ্ঠীর সংখ্যা, বিস্তার, ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে তাহাদের কোন কোন গোষ্ঠী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহার সহিত মালয়, সুমাত্রা, সেলিবিসের যে সকল উপজাতিকে তাহাদের গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয় তাহাদের বর্তমান সংখ্যা, অবস্থা এবং বেদ্দাদিগের অবস্থা ও সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া এরূপ অভিমত গ্রহণ করা যায় না যে, ভারতবর্ষের নিষাদগোষ্ঠী বহির্ভারতের এই সকল অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। বরং ইহাই সম্ভবপর, যদি দৈহিক লক্ষণের ঐক্য স্বীকার করা যায় যে, এই গোষ্ঠীর কোন কোন দল ভারত হইতে বহির্ভারতের এই সকল অঞ্চলে প্রস্থান করিয়াছিল। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। ইষ্টার দ্বীপ হইতে পশ্চিমে মাডাগাস্কার পর্যন্ত কৃষ্ণকায় মনুষ্যগোষ্ঠীর অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে ভারতবর্ষ হইতে একটা পৃথক অঞ্চল বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন কোন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয়। ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ বা অনুমানের সাহায্যে জাতি সংমিশ্রণের প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ অনুমানের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে Giuffrida-Ruggeri-এর মত সমীচীন বলিয়া মনে করা যায়। Schmidt-এর মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে (মন-খেমর জাতির সম্বন্ধে) মুণ্ডা, রিয়াং, ওয়া, শকাই, সেমাং প্রভৃতির মধ্যে ভাষার ঐক্যের কথা তুলিয়া তিনি বলিতেছেন, "I am forced to conclude that these Protomorphic Asiatics had a linguistic unity which was wider than their somatic unity, but which must have been acquired secondarily, the Pre-Dravidian by their greater expansion having encroached upon Negritoid nucleus. The Mon-Khmer affinities extend themselves to Indonesia but here also we pass into another somatic unity."

অর্থাৎ তাঁহার মতে ভাষার ঐক্যের (উহার কারণ যাহাই হউক) সঙ্গে দৈহিক লক্ষণের ঐক্যের কোন সম্পর্ক নাই। কৃষ্টিগত সাদৃশ্যের যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় জাতি সংমিশ্রণের প্রমাণ হিসাবে তাহা অবাস্তব।

ভারতবর্ষের সকল আদিবাসীকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলা যাইতে পারে—এই তথ্য পাইবার পরে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহাদের ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি, অনুষ্ঠান ও হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্কের আলোচনা করা যাইতে পারে। এই গোষ্ঠী সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও বহু সহস্র বৎসরের অসংখ্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম বিপ্লব ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আপনাদিগের পৃথক অস্তিত্ব ও কৃষ্টি বজায় রাখিয়াছে। কোন শক্তির বলে ও ঘটনা পরম্পরায় ইহা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা উৎসাহী গবেষকের অনুসন্ধানের বিষয়।

মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠী

পূর্ব ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী জাতির মধ্যে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ সম্বন্ধে স্যর হারবার্ট রিজলের মত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে খণ্ডন করিয়াছেন। এই মত এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে।

রিজলের অনুসন্ধান প্রণালী ছিল কতকটা প্রাথমিক অনুসন্ধান বা spade work-এর মত। তাঁহার মাপজোখের প্রণালীর ত্রুটি বাহির হইয়াছে, সিদ্ধান্তেও ত্রুটি বাহির হইয়াছে। মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চল পূর্ব ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমানায় অবস্থিত। এ জন্য পূর্ব ভারতে গোলমুণ্ড টাইপের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্বভাবতঃই এই অঞ্চলের উপরে পড়িয়াছিল।

মোঙ্গলয়েড লক্ষণ গোল, মধ্যমাকৃতি ও লম্বামুণ্ড লোকের মধ্যে দেখা যায়। শুধু মস্তকের আকৃতি হইতে এই টাইপ নির্ণয় করা চলে না। কিন্তু রিজলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সংমিশ্রণ নির্ণয় করিতে গিয়া শুধু মস্তকের আকৃতি হইতে টাইপ নির্ণয় করিয়াছেন।

পামীরের পূর্বে তিয়েনশান পর্বতশ্রেণীর উত্তরে জুঙ্গেরীয়া ও মোঙ্গলীয়া মোঙ্গল গোষ্ঠীর বাসভূমি। মোঙ্গল গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্য গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে তুর্ক গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন সম্ভবতঃ আর্য বা ইরাণীয়ান

গোষ্ঠীর সঙ্গে এই সংমিশ্রণ হইয়াছিল। (T. A. Joyce)। সে যাহা হউক, মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ যাহাদের মধ্যে আছে এইরূপ বিভিন্ন গোষ্ঠী কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব হইতে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে।

ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমানা ব্যাপিয়া মোঙ্গলয়েড-সংমিশ্রিত বিভিন্ন উপজাতি বাস করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই বিশুদ্ধ মোঙ্গল গোষ্ঠীয় নহে। সিংকিয়াংয়ে মিশ্র তুর্ক গোষ্ঠীর বাস। সিংকিয়াংয়ের দক্ষিণে তিব্বতের মালভূমি। তিব্বতের দক্ষিণে নেপাল ও ভূটান ও ইহাদের মধ্যে সিকিম। ভূটানের দক্ষিণে আসাম। আসামের পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্ম ও আরাকান ইয়োমা। পশ্চিম তিব্বতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে লাডাক ও বাল্টিস্থান। তিব্বত ও ব্রহ্ম মোঙ্গলয়েড সম্পর্কিত গোষ্ঠীর দুইটি প্রধান ঘাঁটি এবং এই দুই ঘাঁটি হইতে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের স্রোত ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। এই প্রবাহ সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে রুদ্ধগতি হইয়াছে।

মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর বিশিষ্ট দৈহিক লক্ষণসমূহ ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যায় তুর্ক গোষ্ঠী গোলমুণ্ড কিন্তু তুর্ক গোষ্ঠীর জাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে মোঙ্গলীয় লক্ষণগুলির তারতম্য ঘটিয়াছে। মাঞ্চু, তুঙ্গুজ, জুঙ্গেরীয়া ও মোঙ্গলীয়ার কালমুখ, তোরগুত প্রভৃতি জাতি প্রকৃত মোঙ্গল। কোরীয়ানদের নাসিকার গঠন মোঙ্গলীয় নহে, কিন্তু চোখের গঠন মুখের গঠন মোঙ্গলীয়। আইনু জাতি বাদে জাপানীরা মোটামুটি কোরীয়ান টাইপের। চীনা জাতির মস্তকের গঠন প্রকৃত মোঙ্গলদিগের মত গোল নহে, মধ্যমাকৃতি।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের প্রতিবেশী জাতিগুলির মধ্যে তিব্বত ও ব্রহ্মের অধিবাসীরা মোঙ্গলয়েড বা মোঙ্গল লক্ষণযুক্ত। কিন্তু এই দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ আছে।

তিব্বতের অধিবাসীদের মধ্যে গোল, মধ্যমাকৃতি ও লম্বামুণ্ড টাইপ আছে। উত্তরের মালভূমি অঞ্চলের ড্রুপা (Drupa) জাতি গোলমুণ্ড (Smithsonian Report, 1895)। কিন্তু ইহাদের চুল চোখ ও নাক মোঙ্গলীয় নহে। দক্ষিণ অঞ্চলের বোদ পা হেডনের মতে গোলমুণ্ড Southern Mongoloid টাইপের পূর্ব তিব্বতের অধিবাসীদের মধ্যে লম্বা ও মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহাদিগকে broad-faced ও massive বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হেডনের মতে পূর্ব তিব্বতের খাম্‌স হইতে প্রাপ্ত করোটি হইতে অনুমান করা

যায় যে এই টাইপ অতি প্রাচীন এবং এই জাতি সম্ভবতঃ তিব্বতের আদি অধিবাসী ছিল। কুয়েসমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ তারিম অববাহিকা হইতে পামীরী বা ইরাণী গোষ্ঠীর লোক উত্তর তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিল।

ব্রহ্মের অধিবাসীদিগকে হেডন Southern Mongoloid গোষ্ঠীভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্মী উপজাতিগুলির মধ্যে গোলমুণ্ড ও লম্বা মুণ্ড এই দুই টাইপের লোক দেখা যায়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেরূপ হইয়াছে ব্রহ্মের ক্ষেত্রেও সেইরূপ ভাষা অনুসারে জাতি বা মনুষ্য গোষ্ঠী বিভাগ করা হইয়াছে। ফলে, সঠিক জাতি সংমিশ্রণ নির্ণয়ের ব্যাপারে অস্পষ্টতা দেখা দিয়াছে। ব্রহ্মের অধিবাসীদিগকে মন-খ্মের, শান বা তাই, ইন্দো-চাইনীজ বা তিব্বতী-বর্মী ইত্যাদি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হইয়াছে। এই কয়েকটি গোষ্ঠীর জাতি ভারতবর্ষের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দো-চাইনীজ গোষ্ঠীর সম্বন্ধে বলা হয় যে ব্রহ্ম ও মালয়ের মধ্যে দিয়া এই গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে প্রস্থান করে। এই গোষ্ঠীভুক্ত কতকগুলি উপজাতি আসামে রহিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে মিরি, বোদো, নাগা প্রভৃতির নাম করা যায়। এই গোষ্ঠীর একটি পৃথক শাখাকে লুশাই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে ও পশ্চিমে, আরাকান ও চট্টগামের পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়।

শ্যাম, আসাম ও কোচিন-চীন জাতিগুলির মধ্যে Southern Mongoloid টাইপ, তাই-শান টাইপ, বর্মী মালয়ী ও "হিন্দু" টাইপের সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে। দক্ষিণ আসাম, কোচিন-চীন ও কাম্বোডিয়ার চিয়াম জাতির মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণের অভাব। ইন্দোনেশিয়ায় খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম শতক হইতে উপনিবেশিকদের অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল। এই সংযোগের ফলে খ্রীষ্টীয় ৭ম হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে ইন্দো-জাভানীজ সভ্যতার চরম বিকাশ হয়। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে এই সংযোগের ফলে যে জাতিসংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, জাভা ও বোর্ণিওর বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে তাহার কোন প্রভাব দেখা যায় না।

ব্রহ্ম ও তিব্বত হইতে আগত মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের প্রবাহ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, ব্রহ্ম হইতে আগত প্রবাহ আসাম ও বঙ্গ-আসাম সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চলে দেখা যায় এবং তিব্বত হইতে আগত প্রবাহ

হিমালয়ের ভুটান হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের কতকগুলি অংশে দেখা যায়।

আসামে ইন্দো-চাইনীজ গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতির প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে। খাশীদিগের মধ্যে মন-খ্মের ভাষার প্রভাবের কথা বলা হয়। অষ্টম শতাব্দী হইতে দক্ষিণ শান গোষ্ঠীর একটি উপজাতি আসামে প্রবেশ করিয়া কামরূপ অধিকার করে। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আহোম জাতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্মীরা আসামের বৃহৎ অংশ অধিকার করে এবং শান বা তাই গোষ্ঠীর বিভিন্ন উপজাতি আসামে প্রবেশ করে।

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব আসামের দাফ্‌লা, আবর প্রভৃতি জাতি পূর্ব তিব্বতের অধিবাসীদের সহিত সম্পর্কিত। সিংপো, নাগা প্রভৃতি উপজাতিকে আসাম ও ব্রহ্মের সীমানার মধ্যে দেখা যায়। ইহাদের এবং আসামের অন্যান্য উপজাতি সম্বন্ধে বলা যায় যে তাহাদের মধ্যে নিষাদ গোষ্ঠীর সহিত মোঙ্গলয়েড জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। খাশী, কুকি, মিথেই বা মণিপুরী, মিকির, কাছাড়ী এবং কিছু পরিমাণে নাগাদের মধ্যে নিষাদ গোষ্ঠীর লক্ষণের সঙ্গে মোঙ্গলয়েড লক্ষণ দেখা যায়।

বাংলা দেশের সীমানার মধ্যে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ রহিয়াছে। উত্তর সীমান্তে দার্জিলিং জেলায়, নেপাল, ভূটান ও সিকিমে যে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণযুক্ত অধিবাসীদিগকে দেখা যায় সেই সংমিশ্রণ তিব্বত হইতে আগত। সিকিমের রোংপা ও লেপ্‌চা মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের। ইহাদের সকলের মধ্যে অল্পবিস্তর মোঙ্গলয়েড লক্ষণ দেখা যায়। নেপালের নেওয়ারদিগের মধ্যে এই লক্ষণ পরিস্ফুট নহে। বাংলাদেশের পূর্ব সীমানায় মৈমনসিংহ জেলার মধ্যে সুসং অঞ্চলের গারো ও হাজংদিগের মধ্যে ও দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে চাকমাদিগের মধ্যে যে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ দেখা যায় তাহা তিব্বত হইতে আগত সংমিশ্রণের অনুরূপ নহে। চট্টগ্রামের চাকমা ও মগদিগের সহিত আরাকানের মগদিগের সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে। পার্বত্য-ত্রিপুরার অধিবাসীদের মধ্যে যে মোঙ্গলয়েড লক্ষণ দেখা যায় তাহা আসামের উপজাতিদের মধ্যে ব্রহ্ম হইতে আগত মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের অনুরূপ।

নেপাল হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া পাঞ্জাব হিমালয়ে উপস্থিত হইলে কাঙ্ড়া জেলার উত্তর সীমানায় লাহুল ও স্পিটির অধিবাসীদিগের মধ্যে তিব্বত হইতে আগত মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে মধ্য এশিয়া ও লাডাক ও অন্যদিকে কুলু ও পাঞ্জাবের মধ্যে ব্যবসায়ের আদান প্রদান লাহুলীদের মারফৎ চলে। স্পিটি পূর্ব লাডাক রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পরে লাডাকের সঙ্গে স্পিটিও কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পরে ব্রিটিশেরা উহা বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেদের দখলে আনিয়াছিল।

আরও অগ্রসর হইলে বালটিস্থান বা ছোট তিব্বতে ও লাডাকে তিব্বতী প্রভাব প্রবল। লাডাকের অধিবাসীরা ভোট নামে পরিচিত। মধ্য লাডাকের হানু উপত্যকার অধিবাসী ও বাল্‌টিস্থানের ব্রুক-পা জাতি আলাদা গোষ্ঠীর। এই গোষ্ঠী দরদ নামে পরিচিত। পশ্চিমে কাফিরীস্থান হইতে পূর্বে কাগান পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলকে দরদিস্তান নাম দেওয়া হয়। দরদজাতি, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে পরিচিত। তাহাদিগকে ইন্দো-এরিয়ান বা আর্য গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়।

বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের চাক্‌মা জাতি (১,৩৫,৫০৩) আরাকানের মগদিগের সঙ্গে সম্পর্কিত বলা হইয়াছে। আসামের খাসী, খিয়াং, লুশাই, কুকি ও ত্রিপুরার তিপারাদিগকেও এই অঞ্চলে দেখা যায়। পার্বত্য-ত্রিপুরায় লুশাই, কুকি ও তিপারা প্রধান উপজাতি। মৈমনসিংহের গারোপাহাড় অঞ্চলে প্রায় ৬৮ হাজার গারো বাস করে। খাসী-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে, খাসীরাজ্যে, গোয়ালপাড়া ও কামরূপে প্রায় ৩০ হাজার গারো বাস করে। মৈমনসিংহে প্রায় ২০ হাজার হাজং বাস করে। গারো পাহাড় অঞ্চলে আসামের রাভাদিগকেও দেখা যায়। দার্জিলিং জেলায় ও সিকিমে মুর্মী, খাম্বু, খশ, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির মধ্যে মেচ ও মঙ্গরদিগকে দেখা যায়। ধিমল, থারু, কামী, খাবাস ও থক উপজাতিকে দার্জিলিং জেলার মধ্যে দেখা যায়। আসামের মোট প্রায় ১০ লক্ষ উপজাতির মধ্যে সুরমা উপত্যকায় প্রায় ৩ লক্ষ ও আসাম উপত্যকায় প্রায় ৪ লক্ষ উপজাতি বাস করে। সংখ্যা হিসাবে নাগা, কুকি, মিথেই বা মণিপুরী, খাসী, ও আবর প্রবল। নাগাদিগের মধ্যে আবার ২১টি ও কুকিদিগের মধ্যে ১৮টি ভাগ (Class) আছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ সম্বন্ধে উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মের পথে যে সংমিশ্রণ আসিয়াছে তাহা আসাম ও আসামের সংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চলে (মৈমনসিংহ, পার্বত্য চট্টগ্রাম) প্রবল। এই সংমিশ্রণ দুই বা ততোধিক গোষ্ঠী হইতে হইয়াছে। ত্রিপুরা, বাংলা ও আসামের মধ্যবর্তী অঞ্চল। উত্তর বঙ্গে দার্জিলিং, নেপাল, সিকিম ও ভূটান হইতে আগত উপজাতিদিগের মিলনভূমি। এই অঞ্চলে তিব্বতী প্রভাব প্রবল। পশ্চিম হিমালয়ে যে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেও তিব্বতী প্রভাব প্রবল।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যে মোঙ্গলয়েড প্রভাব দেখা যায় তাহাকে তিনটি ধারাতে বা টাইপে ভাগ করা হইয়াছে। দুইটি টাইপের নাম দেওয়া হয় প্যালি-মোঙ্গলয়েড ও একটির নাম মোঙ্গলয়েড।

প্রথম প্যালি-মোঙ্গলয়েড টাইপ লম্বা বা মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের, গাত্রবর্ণ কাল বা শ্যাম, অক্ষিকোটর তির্যক (slanting)। হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চল-গুলিতে এই টাইপের সহিত অন্যান্য গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে, আসামের উপজাতিদের মধ্যে এই টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। দ্বিতীয় প্যালিমোঙ্গলীয় টাইপের মুণ্ড গোল, গাত্রবর্ণ কাল, মুখ গোল এবং চোখের গঠনে মোঙ্গলয়েড লক্ষণ প্রবল। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মগ প্রভৃতির মধ্যে এই টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। যে টাইপের মধ্যে তিব্বতী সংমিশ্রণ প্রবল সেই টাইপের নাম দেওয়া হইয়াছে মোঙ্গলয়েড। এই টাইপ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্যালি-মোঙ্গলয়েড জাতি প্রাগৈতিহাসিক আমলে ইন্দো-চীন হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

ভাষাবিজ্ঞানীরা যাহাকে মন-খ্মের জাতি বলিয়াছেন কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীর মতে তাহারা এই প্যালি-মোঙ্গলয়েড শ্রেণীভুক্ত। ভারতবর্ষে এই গোষ্ঠীই প্রাচীনতম মোঙ্গলয়েড লক্ষণযুক্ত জাতি, অনেকের মত এইরূপ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত করোটিগুলির মধ্যে একটিকে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা মোঙ্গলয়েড বলিয়া মনে করেন। এই করোটি ও কতকগুলি পোড়ামাটি ও প্রস্তরের মূর্তির টেরছা (oblique) চোখ দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন তাম্রযুগের সিন্ধুজাতির সঙ্গে মোঙ্গল জাতির কোন না কোনরূপ আদান-প্রদান ছিল। অনুমান করা হয় যে, এই মোঙ্গল

জাতি সম্ভবতঃ মোঙ্গলগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি, অর্থাৎ পামীরের পূর্ব অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর জাতি ভারতবর্ষের প্রতিবেশী ও প্রাগৈতিহাসিক আমল হইতে তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেলেও সীমান্ত অঞ্চলগুলি অতিক্রম করিয়া মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের প্রবাহ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরভাগে কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এই সাক্ষ্যের সঙ্গে ইতিহাসের সাক্ষ্য যোগ করিলে দেখা যায় ভারতবর্ষ হইতে কৃষ্টির প্রবাহ এশিয়ার সমস্ত মোঙ্গল ও মোঙ্গলয়েড অর্থাৎ মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত জাতিকে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রভাবিত করিয়াছে।

মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে পরবর্তী স্তর মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী সম্বন্ধে ডাঃ গুহের মত এইরূপ :

এই মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি পৃথক টাইপের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম ও সর্বপ্রাচীন টাইপ প্যালি-মেডিটারেনীয়ান। প্রোটো-ঈজিপ্সীয়ান টাইপের সঙ্গে এই উপগোষ্ঠীর দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্য আছে, নিগ্রোয়েড গোষ্ঠীর কয়েকটি লক্ষণের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। আদিতানাল্লুরে এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যত্র ইহাদের করোটি প্রভৃতি দেহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা মেগালিথিক কালচারের প্রবর্তন করিয়াছিল। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের মধ্যে এই টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়।

ইহাদের পরে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। দৈহিক লক্ষণে ইহারা "য়ুরোপীয়ান" টাইপের সদৃশ ("closely skin to the European type")। সিন্ধু উপত্যকায় এবং আরও পূর্বে ইহাদের অনেক করোটি, কঙ্কাল প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই গোষ্ঠী সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। এবং আর্য ভাষাভাষী বৈদিক আক্রমণকারীদের দ্বারা গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে এবং অল্প সংখ্যায় বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে বিতাড়িত হইয়াছিল। ("It is probable that this was the race responsible for the development of the Indus civilisation and subsequently dispersed by the

'Aryan'-speaking invaders to the Gangetic basin, and to a smaller extent, beyond the Vindhyas" । উত্তর ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে এই টাইপের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় এবং শেষ মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর আগন্তুক প্রাচ্যজাতি (Oriental race)। এই উপগোষ্ঠীর প্রধান বাসভূমি এশিয়া মাইনর ও আরব দেশ। এই দুই অঞ্চল হইতে ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা ও যুক্ত প্রদেশের পশ্চিম অংশে এই টাইপের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। (Racial Elements in Population, 1944)।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর স্তর সম্বন্ধে ডাঃ গুহ যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন অনেক খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অন্য কোন কোন রচনায় প্রকাশিত মতের সঙ্গে এই সকল মতের সঙ্গতি লক্ষিত হয় না।

মেডিটারেনীয়ান বলিয়া বর্ণিত গোষ্ঠীর এই প্রকার নামকরণ করিয়াছেন বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী Sergi। এইরূপ বলা হইয়াছে যে, উত্তর-আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চল এবং নিকটবর্তী এশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর উৎপত্তি কেন্দ্র এবং এই গোষ্ঠীর যে সকল শাখা দেখা যায় সেই সকল শাখার উদ্ভব হইয়াছিল এই অঞ্চলে। এই অঞ্চল হইতে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী পূর্ব ও পশ্চিমমুখে ছড়াইয়া পড়ে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ইলিয়ট স্মিথ এই গোষ্ঠীর মেডিটারেনীয়ান নামকরণ অনুমোদন করেন না। তাঁহার মতে ব্রিটিশ দ্বীপগুলি ও ফ্রান্সের নূতন প্রস্তরযুগের অধিবাসী, মিশরের অধিবাসী, ইথিওপিয়ার কতকগুলি উপজাতি, আরব ও পারস্য উপসাগরের উপকূলের অধিবাসী, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, এশিয়া মাইনরের উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীকে এক শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। তিনি এই গোষ্ঠীর নামকরণ করিয়াছেন ব্রাউন রেস। এই গোষ্ঠীর মধ্যে মেডিটারেনীয়ান, সেমিটিক ও হেমিটিক গোষ্ঠীর জাতি আছে।

মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর যে শাখাকে প্যালি-মেডিটারেনীয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে, অনেক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে তাহারাই দ্রাবিড় বা Dravidian জাতি। এই শাখার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একদল পণ্ডিত বলেন ইহারা

বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। অন্য দল বলেন দাক্ষিণাত্যের তৃণময় অঞ্চলে (Open grasslanus of the Deccan) প্রাচীন নিষাদ গোষ্ঠী হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন এই জাতি বিদেশ হইতে আসিয়াছিল তাঁহাদের মত এই যে, উত্তর মিশরের 'প্রি-ডাইনাষ্টিক' আমলের সমাধিক্ষেত্রে যে টাইপের লম্বামুণ্ড জাতির করোটি পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত দক্ষিণ ভারতের এই প্রাচীন মেডিটারেনীযান টাইপের সাদৃশ্য এত বেশী যে, অনুমান করা যাইতে পারে যে মিশর হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এই জাতি ছড়াইয়া ছিল।

লম্বামুণ্ড নিষাদ গোষ্ঠী হইতে প্রাচীন মেডিটারেনীয়ান, প্রাচীন মেডি-টারেনীয়ান হইতে য়ুরোপীয় মেডিটারেনীয়ান ও য়ুরোপীয় মেডিটারেনীয়ান হইতে প্রাচ্য জাতি, এইভাবে লম্বামুণ্ডগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ করা হইলেও দেখা যায় যে, কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অন্যান্য দৈহিক লক্ষণের পার্থক্য বিচার না করিয়া সকল লম্বামুণ্ড জাতিকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করিতে ইচ্ছুক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঈলিয়ট স্মিথের ব্রাউন রেসের উল্লেখ করা যায়। প্রাচীন মিশরী ও আধুনিক মিশরী তাঁহাব মতে ব্রাউন রেস (Brown race)। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী বাক্সটনের মতেব উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, উত্তর হইতে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর দুইটি অভিযান ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসী (Pre-Dravidıan) প্রথম ঔপনিবেশিক দলে ছিল, দ্বিতীয় দলে যাহারা ছিল তাহারা Dravidıan। এই দুই দলেব মধ্যে পার্থক্য নাসিকার গঠনে এবং এই পার্থক্য জলবায়ুর প্রভাবে ঘটিয়াছিল।

বাক্সটনের মত হেডেন প্রমুখ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই মতের উল্লেখ করা হইল Dravidıan কথাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মতের বিরোধ এবং ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণের প্রশ্নে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচার করা হইয়াছে তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা কিরূপ কঠিন তাহা দেখাইবার জন্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর তিনটি টাইপের সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে সেই তিনটি টাইপের পার্থক্য অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু দেখা যায় যে, তাঁহারা মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর এইরূপ শ্রেণীবিভাগ স্বীকার না করিলেও

দক্ষিণ ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য Dravidian নামটি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আসল প্রশ্ন, দক্ষিণ ভারতের লম্বামুণ্ড অধিবাসী ও উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড অধিবাসীদিগের মধ্যে যে দৈহিক লক্ষণেব কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়, কি ভাবে তাহার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। রিজলে এই প্রশ্নের উত্তব দিয়াছেন, দক্ষিণ ভারতেব লম্বামুণ্ড অধিবাসী দ্রাবিড জাতি ও উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড অধিবাসী আর্য জাতি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া। এই উত্তর পরবর্তী নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা নানা কারণে অসন্তোষজনক মনে করিয়াছেন।

বর্তমান আলোচনায় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের নির্দিষ্ট পথই বরাবর অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন সন্দেহ উঠিলে তাহা প্রকাশ না করিয়া চাপিয়া যাইবার কোন কারণ নাই। এখানে একটি সন্দেহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা মানব সমাজকে উন্নতিশীল ও আদিম অবস্থায় অবস্থিত, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। সকল উন্নতিশীল, লম্বামুণ্ড, মাঝারি দৈর্ঘ্যের, সরল নাসা জাতিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত করিবার, ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলকে সকল লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিব আদি বাসভূমি বলিয়া মনে করিবার কি বিচারসহ প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে? ঈলিয়ট স্মিথ সেমাইট, কোন কোন হেমাইট উপজাতি ও যাহাদিগকে প্রকৃত মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয় তাহাদের সকলকে একদলে ফেলিয়াছেন। সেমাইটগণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আরবে গিয়াছিল, ইতিহাস এ কথা বলে না। মেডিটারেনীয়ান নামটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে মনুষ্যগোষ্ঠীর বাস ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নাম।

এই বৈশিষ্ট্য কি, তাহা মোটামুটি বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু সকলে একমত নহেন। ইহার ফলে অবস্থা কতকটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে: ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের সহিত বা ভূমধ্যসাগরীয় টাইপের সহিত সম্পর্ক প্রমাণ করা সম্ভব হউক বা না হউক, লম্বামুণ্ড, মধ্যম দৈর্ঘ্য, সরল নাসা অথবা লম্বামুণ্ড, হাল্কা গড়নের জাতিমাত্র মেডিটারেনীয়ান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বাক্সটনের মত ইহার প্রমাণ।

ডাঃ হাটন এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের শারীরিক গঠনে মেডিটারেনীয়ান প্রভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহার মতে

ভারতবর্ষে যে মেডিটারেনীয়ান জাতি আসিয়াছিল তাহারা ছিল দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মেডিটারেনীয়ান নামটি ব্যবহার করিলেও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে আগের যুগের Dravidian মতবাদে বিশ্বাসী।

দক্ষিণ ভারতের লম্বামুণ্ডগোষ্ঠীকে প্যালি-মেডিটারেনীয়ান ও মেডিটারে-নীয়ান নাম ছাড়া আরও কয়েকটি নাম দেওয়া হইয়াছে। একটি নাম Basic dolichocephalic বা আদি লম্বামুণ্ডগোষ্ঠী। ইহাদের দ্রাবিড় নামটি সকলের পরিচিত। জার্মাণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আইকষ্টেড ইহাদের এক অংশকে মেলানিড (Melanid) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অন্যান্য অংশের নাম দিয়াছেন ইণ্ডিড (Indid)।

আলোচনার সুবিধার জন্য এই গোষ্ঠীকে দক্ষিণ ভারতীয় জাতি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত, তাহার কয়েকটি উল্লেখ করা হইয়াছে। উত্তর মিশরের প্রিডাই-ন্যাষ্টিক আমলের বাদারিয়ান বা প্রোটো-ইজিপ্‌সিয়ান টাইপের সহিত ইহাদের সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মিশর হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এই জাতির বিস্তৃতির কথা উঠিয়াছে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী রিপলের মতে ইহা oriental expansion of the Mediterranean race প্রমাণ করে। পঞ্চানন মিত্র এই জাতির নামকরণ করিয়াছেন ইন্দো-ইরিথ্রিয়ান জাতি।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে মেসোপটেমিয়া, এলাম, আনাউ-তে যে জাতির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহারা মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। কিন্তু এই গোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পরে নিষাদ গোষ্ঠীর সহিত রক্তের মিশ্রণের ফলে পরিবর্তিত হইয়াছে। আবার কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন দক্ষিণ ভারতের এই গোষ্ঠী আদৌ বাহির হইতে আসে নাই, অন্যান্য গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের ফলে এবং প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে নিষাদ গোষ্ঠীর কতক অংশ পরিবর্তিত হইয়াছে। শেষোক্ত দলের পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করিলে মেডিটারেনীয়ান নামটির ব্যবহার অর্থশূন্য হইয়া দাঁড়ায়। এই মতের সহিত Dravidian theory-র সম্পর্কে কথা পরে বলা হইবে।

ইটালীয়ান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী Giuffrida-Ruggeri-র মত অনুরূপ। তিনিও Dravidian theory-তে বিশ্বাসী। তাঁহার মতে দক্ষিণ ভারতের এই গোষ্ঠীর

সম্পর্ক দেখা যায় ইথিওপিয়ার অধিবাসীদিগের সহিত। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন Homo Indo-Africanus Dravidius। জার্মাণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আইকষ্টেডের মতে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীর বৃহৎ অংশ মেলানিড গোষ্ঠীভুক্ত। মেলানিড শব্দ আইকষ্টেডের তৈয়ারী, ইহার অর্থ মেলানেশিয়ান-নেগ্রিড, অর্থাৎ উভয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত জাতি। তাঁহার মতে এই মেলানিডগোষ্ঠী নিগ্রোগোষ্ঠীর পূর্বশাখা (Indo-Negrid or eastern branch of the great Negro Race)। তামিল জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত, দাক্ষিণাত্যের "কোলারীয়ান" জাতিগুলিও এই গোষ্ঠীভুক্ত। তামিলগণ দ্রাবিড় জাতি বলিয়া ভাবতীয় ইতিহাসে পরিচিত কিন্তু আইকষ্টেডের মতে তামিল জাতি অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষাভাষী হইতে পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত। এই মত কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। হেডন ও রিচার্ডসের মতে দক্ষিণ ভারতের এই জাতি ও আদি মেডিটারেনীয়ান জাতি এক গোষ্ঠীয়। আদি মেডিটারেনীয়ান ও প্যালি-মেডিটারেনীয়ান একই কথা।

দক্ষিণ ভারতের মেডিটারেনীয়ান জাতির উৎপত্তির প্রশ্নে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের অভিমত ইহার অধিক আলোকপাত করে না।

মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর সহিত এই দক্ষিণ ভারতীয় জা'তর সম্পর্ক প্রমাণ করিবার জন্য ডাঃ গুহ মেগালিথিক মনুমেণ্টের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, প্যালি-মেডিটারেনীয়ান জাতি কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ ইহারা নিওলিথিক যুগের শেষের দিকে মেগালিথিক কৃষ্টি বহন করিয়া এদেশে আসিয়াছিল। এই সম্পর্কে তিনেভেলী জেলার আদিতানাল্লুবে প্রাপ্ত মনুষ্যদেহের নিদর্শনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন যে, এই টাইপ প্যালি-মেডিটারেনীয়ান টাইপ বটে। তাঁহার মতে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে যে সকল স্থানে মেগালিথিক মনুমেণ্ট দেখা যায়, সেখানে কোন মনুষ্যদেহের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু de Terra দেখাইয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই সকল মনুমেণ্ট নিওলিথিক আমলের। সুতরাং করোটি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা তাঁহার মত সমর্থিত না হইলেও তিনি অনুমান করিয়াছেন এগুলি প্যালি-মেডিটারেনীয়ানদিগের কীর্তি। এই সকল যুক্তির সাহায্যে ডাঃ গুহ সম্ভবতঃ বলিতেচাহেন যে, এই গোষ্ঠী নিওলিথিক যুগের শেষের দিকে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কিন্তু জানা যায় যে, য়ুরোপে মেগালিথিক

কৃষ্টির প্রভাব মেডিটারেনীয়ান ও আর্মেনীয়ান টাইপের সংমিশ্রণে উদ্ভূত আর্মেনয়েড বা প্রসপেক্টর (Prospector) জাতির কীর্তি বলিয়া মনে করা হয়। আর আদিতানাল্লুরের যে জাতিকে তিনি প্যালি-মেডিটারেনীয়ান বলিতে চাহেন, তাহা কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আর্মেনয়েড বলিয়া মনে করেন। সুতরাং মেগালিথিক কৃষ্টির কথা তুলিয়া এই দক্ষিণ ভারতীয় জাতির কৃষ্টির সহিত কোন সম্পর্ক প্রমাণ করা যায় না, তাহাদের বাহির হইতে আগমনের সময় সম্বন্ধেও কোন ধারণা করা সম্ভব হয় না। একজন দক্ষিণ ভারতীয় নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই জাতি (তাঁহার প্রদত্ত নাম Indic) আট হইতে দশ হাজার বৎসর পূর্বে মধ্য এশিয়া হইতে দ্রাবিড় ভাষা বহন করিয়া এদেশে আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহা সর্বপ্রকার প্রমাণ নিরপেক্ষ অনুমান মাত্র।

উপরে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের অভিমতের আলোচনা হইতে দক্ষিণ ভারতের যে গোষ্ঠীকে প্যালি-মেডিটারেনীয়ান বা Dravidian বলা হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা গেল না। এখন এই দক্ষিণ ভারতীয় জাতির বিভিন্ন অংশের কথায় আসা যাউক।

প্রথমে ভাষার কথা বলা হইতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিশপ ক্যাল্ডওয়েল প্রথমে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা-গুলিকে এক গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা বলিয়া প্রচার করেন এবং এই গোষ্ঠীর নাম দেন দ্রাবিড়। এখন এই ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষীর সংখ্যা ৭ কোটির কিছু বেশী। এই ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি আদিবাসী উপজাতির ভাষা ধরা হয়। কুরুখ, মাল্টো, গোঁদ, কুই বা কাঁধি, কোলামি প্রভৃতি আদিবাসীদিগের ব্যবহৃত ভাষা পণ্ডিতগণের মধ্যে দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা মুণ্ডা ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত নহে। ওঁরাওদিগের ভাষার নাম কুরুখ। ইহাদিগের প্রধান বাসভূমি বিহার ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলি। ওঁরাওদিগের মধ্যে হিন্দু ও খ্রীষ্টানের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। ইহারা অনেকে হিন্দী বা উড়িয়া ভাষা ব্যবহার করে। মাল্টো বা মালের ভাষা প্রায় ৭০ হাজার আদিবাসী ব্যবহার করে। ইহাদের প্রধান আড্ডা সাঁওতাল পরগণা। কাঁধি বা কুই ভাষা প্রায় ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার আদিবাসী ব্যবহার করে। ইহাদের প্রধান বাসভূমি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

মধ্যপ্রদেশের প্রায় ২৯ হাজার আদিবাসী কোলামি ভাষা ব্যবহার করে। মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও মধ্যভারতের এজেন্সী এলাকা ও হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রায় ১৮ লক্ষ আদিবাসী গোঁদি ভাষা ব্যবহার করে। গোঁদি ভাষার অনেক গুলি শাখা আছে। এই ভাষাগুলির মধ্যে কুরুখ ভাষার কানাড়ী ভাষার সঙ্গে ও মুণ্ডা গোষ্ঠীব ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এবং গোঁদি ভাষার তেলেগুর সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলা হয়।

আদিবাসীদিগের ব্যবহৃত এই সকল ভাষা ছাড়া অল্প সংখ্যক টোডা ও কোটা উপজাতির ভাষাকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে ধরা হয। অন্ধ্র দেশের তেলেগু ও উহার শাখা ভাষাগুলিকে দ্রাবিড ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে Intermediate বা মধ্যবর্তী গ্রুপ বলিযা পথকভাবে উল্লেখ করা হয়। প্রায় ২ কোটি ৬৪ লক্ষ লোক অন্ধ্র ভাষা ব্যবহার করে। সাক্ষাৎ ভাবে দ্রাবিড ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা হয় তামিল, মলয়ালী, কানাড়ী, কোদাগু বা কুর্গী ও তুলু। তামিল ভাষা প্রায় ২ কোটি, মলয়ালী প্রায় ৯১ লক্ষ ২ হাজার, কানাড়ী ১ কোটি, কাদাগু প্রায় ৪৫ হাজার ও তুলু প্রায় ৬ লক্ষ লোক ব্যবহার করে। ইহার মধ্যে কানাড়ী ও কুর্গী এবং মলয়ালী ও তুলু সম্পর্কিত। তুলু দক্ষিণ ও উত্তর কানাড়া জেলায় ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ কানাডাব প্রাচীন নাম তুলব ও উত্তর কানাড়ার নাম অহিক্ষেত্র। তুলব, হবিগ (উত্তর কানাড়ার কানাডী নাম) ও কেরলের ভাষা ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

উপরে দেখা গিয়াছে যে দ্রাবিডগোষ্ঠীভুক্ত ভাষা যে সকল আদিবাসী উপজাতি ব্যবহার করে, তাহারা সাঁওতাল পরগণা হইতে ছোট নাগপুরের মালভূমি ও তাহার সহিত সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারতের পার্বতা অঞ্চল হইয়া দক্ষিণে হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাই আদিবাসীদিগের প্রধান এলাকা। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষা যাহারা ব্যবহার করে তাহাদের বাসভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় পশ্চিম উপকূলের কাথিয়াবাড়ের দক্ষিণে দক্ষিণ মারাঠা দেশ। তাহার দক্ষিণে উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া। এই দুই জেলার পূর্ব সীমানায় মহীশূর। কানাড়ার দক্ষিণে কেরল ও মহীশূরের উত্তরে বেলারী জেলায় কানাড়ী ও তেলেগু ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় সমান। বেলারী হইতে পূর্ব উপকূল ধরিয়া গঞ্জাম পর্যন্ত অন্ধ্র

ভাষাভাষীর অঞ্চল। দক্ষিণে তিনেভলী হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর চিঙলীপুট পর্যন্ত তামিল ভাষাভাষীর অঞ্চল। যেমন বেলারী জেলায় কানাড়ী ও তেলেগু মিশিয়াছে সেইরূপ উত্তর আর্কট জেলায় তামিল ও তেলেগু মিশিয়াছে।

এইগুলি ব্যতীত ২ লক্ষ ৭ হাজার ব্রাহুই জাতি (বেলুচীস্থানের) দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলিয়া থাকেন।

এখন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ উপরের এই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখা যাউক। এই আলোচনার প্রধান বিষয় দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানমতে এক গোষ্ঠীভুক্ত কি না তাহা অবগত হওয়া। দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদিবাসীর কথা আগে বলা হইয়াছে।

ভাষা হিসাবে পশ্চিম উপকূলের তুলু ও মলয়ালী, মালভূমির দক্ষিণ ভাগের কানাড়ী ও কুর্গী, উপদ্বীপ ভাগের ও পূর্ব উপকূলের দক্ষিণ অঞ্চলের তামিল ও উত্তর অঞ্চলের তেলেগু ভাষাভাষীদিগকে চারিটি ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক দলের সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্যালি-মেডিটারেনীয়ান নাম দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী বাদে এই চারিটি দলের লোকের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে ("the dominant type among Dravidian-speaking people")।

প্যালি-মেডিটারেনীয়ান টাইপের যে সকল লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, রিজলের পরের দ্রাবিডিয়ান থিওরীতে বিশ্বাসী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার সহিত প্যালি-মেডিটারেনীয়ান টাইপের লক্ষণের বিশেষ পার্থক্য নাই। এই টাইপের লক্ষণের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হইতেছে; লম্বা মুণ্ড, মাঝারি দৈর্ঘ্য, কৃষ্ণবর্ণ, হাল্কা গড়ন, ছোট, মাংসল, চওড়া নাক, মুখে ও দেহে চুল অল্প।

দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী অধিবাসীদিগের সঙ্গে যাঁহাদের চাক্ষুষ পরিচয় আছে তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন এই বর্ণনা মিলে কি

না। মলয়ালীভাষী নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের মত লোমশ মানুষ এদেশে আর আছে কি না সন্দেহ; সুতরাং মুখ ও দেহে অল্প চুল এই লক্ষণ এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যায়। অবশ্য নম্বুদ্রিরা উত্তর ভারতীয় একথা অনেকে বলেন। কিন্তু দেখা যাইবে যে, ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যায়। সে যাহা হউক, প্যালি-মেডিটারেনীয়ান টাইপের মস্তকের ও নাসিকার মাপ (cephalic ও nasal index) দেওয়া হয় নাই। সাধারণ দ্রাবিড় জাতির বৈশিষ্ট্য লম্বা মুণ্ড ও মধ্যমাকৃতি (mesorrhine) নাসিকা এইরূপ বলা হয়। উপরে প্যালি-মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর লক্ষণের বর্ণনা হইতে মনে করা যাইতে পারে, এই দুইটি লক্ষণ এই গোষ্ঠীরও বৈশিষ্ট্য বটে।

এই দুইটি লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে কানাড়ী, কুর্গী বা কোদাগু তামিল, তেলেগু, মলয়ালী ও তুলু ভাষাভাষীদের সম্বন্ধে কি তথ্য পাওয়া যায় দেখা যাউক।

প্রথমেই প্যালি-মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর তালিকা হইতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কোদাগু ভাষাভাষীদিগকে বাদ দিতে হইবে, কারণ ইহারা গোলমুণ্ড টাইপের। তারপর বাদ দিতে হইবে কানাড়ী ভাষাভাষীকে, কারণ ইহারাও সাধারণতঃ গোলমুণ্ড টাইপের। তামিলদিগের মধ্যে এক অংশকে বাদ দিতে হইবে, এই অংশ গোলমুণ্ড। তেলেগুদিগের এক অংশের মস্তকের আকৃতি মধ্যবর্তী শ্রেণীর (mesocephalic)। মলয়ালীদল সাধারণতঃ লম্বামুণ্ড। নাসিকার আকৃতি ধরিলে বলা যায় যে মলয়ালী গ্রুপের নায়ার ও নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ, কানাড়ী ব্রাহ্মণ ও আরও কেহ কেহ তালিকা হইতে বাদ পড়িবে। Thurston প্রদত্ত তথ্য পরীক্ষা করিয়া এই ফল পাওয়া যায়। ডাঃ গুহ তাঁহার সংগৃহীত তথ্য হইতে বহু পরিশ্রম করিয়া Co-efficient of racial affinities অথবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের জাতিগুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩১ সনের সেন্সাস রিপোর্টের ১ খণ্ড ৩য় ভাগে ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহার গবেষণার ফল হইতে দেখা যায়, মলয়ালী গ্রুপের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা বেশী তেলেগু গ্রুপের সঙ্গে, তারপর যুক্তপ্রদেশের ব্রাহ্মণ ও মধ্যপ্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে। তামিল ব্রাহ্মণদিগের বাঙ্গালী কায়স্থ ও পোদদিগের সঙ্গেও সম্পর্ক দেখা যায়। কানাড়ীদিগের গুজরাটি,

বাঙ্গালী, তামিল, মারাঠিদিগের সঙ্গে সম্পর্কে দেখা যায়। তেলেগু গ্রুপের মলয়ালী, মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী, তামিল, মারাঠি এবং যুক্তপ্রদেশ ও উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে সম্পর্ক দেখা যায়।

বলা বাহুল্য, এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোন মূল্য আছে স্বীকার করিলে উপরের প্যালি-মেডিটারেনীয়ান বা দ্রাবিড়িয়ান থিওরী মূল্যহীন হইয়া দাঁড়ায়। হেতু যাহাই হউক ও যেভাবে ঘটিয়া থাকুক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে racial affinity-র প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, দ্রাবিড় ভাষাভাষী দক্ষিণ ভারতের জাতি-গুলিকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া যে মত প্রকাশ করা হইয়াছে এবং এই গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হইয়াছে প্যালি-মেডিটারেনীয়ান তাহা কিরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখা। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের মতে একগোষ্ঠীযত্ব প্রমাণ ভাষার সাহায্যে হয় না, জাতি-লক্ষণের সাহায্যে হয়। দেখা যাইতেছে যে, জাতি-লক্ষণ হইতে দ্রাবিড় ভাষাভাষীদিগকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া প্রমাণ করা যায় না।

তাহাদিগকে যদি এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া প্রমাণ করা না যায়, তবে কিসের ভিত্তিতে তাহাদিগকে উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড জাতিসমূহ হইতে পৃথক বলা হইয়াছে পরে বিস্তারিত দেখা যাইবে। এখানে এই একগোষ্ঠীয়ত্ব অপ্রমাণ করে এইরূপ আরও দুই একটি মতের উল্লেখ করা যাইতেছে।

Thurston-এর সংগৃহীত তথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার মত এই যে, দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে কানাড়ী, তুলু ও তেলেগু ভাষাভাষীদিগের মধ্যে লম্বামুণ্ডের প্রাধান্য দেখা যায় না, এই প্রাধান্য দেখা যায় দাক্ষিণাংশে তামিল ও মলয়ালীদিগের মধ্যে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী হাটনের মতে তেলেগু বা অন্ধ্র ভাষা-ভাষী অঞ্চলে প্রকৃত মেডিটারেনীয়ান টাইপ দেখা যায় ("The Telegu is perhaps the purest Mediterranean stock in India.")। লম্বামুণ্ড মেডিটারেনীয়ান ও গোলমুণ্ড আর্মেনয়েড টাইপের সংমিশ্রণ দেখা যায় তামিল-দিগের মধ্যে। তামিল অঞ্চলের তিনেভেল্লী জেলায় শানার ও পল্লব এবং উত্তর আর্কট হইতে তিনেভেল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় পাল্লিয়ান নামে পরিচিত

যে জাতিগুলিকে দেখা যায় তাহারা ডাঃ হেডন প্রমুখ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহারা গোলমুণ্ড। হেডন ইহাদিগকে দক্ষিণী গোলমুণ্ড (southern brachycephals) বলিয়াছেন, ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

দক্ষিণ ভারতের জাতিগুলিকে মস্তকের আকৃতি হইতে এক গোষ্ঠীভুক্ত করিবার পক্ষে এইভাবে বহু অসুবিধা দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানিগণের মত অবশেষে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, নাসিকার ইনডেক্সই তাহাদের একগোষ্ঠীয়তার প্রমাণ। Thurston-এর সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করিলে মলয়ালী, তেলেগু, কানাড়ী গ্রুপের কতকগুলি জাতি বাদ পড়িবে। আরও দেখা যায় যে নাসিকার ইনডেক্স উচ্চবর্ণ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের মধ্যে বেশী। এই নিম্নবর্ণের জাতিগুলির অনেকে নিষাদ গোষ্ঠীর, অর্থাৎ যাহাদিগকে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বলা হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষীদিগকে প্যালি-মেডিটারেনীয়ান বা দ্রাবিড় নাম দিয়া একগোষ্ঠীভুক্ত করিবার পক্ষে আর একটি বাধার উল্লেখ করা হইতেছে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী নহেন এরূপ অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, উত্তর ভারতীয়গণ, বিশেষতঃ উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ (ইঁহাদিগকে দ্রাবিড় জাতি হইতে পৃথক করিবার জন্য "আর্য" নাম দেওয়া হইয়া থাকে) দক্ষিণ ভারতে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন এবং তাহাদের ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাস ও কিম্বদন্তী একথা অনেকটা সমর্থন করে।

প্রাচীন কেরলী কিম্বদন্তী মতে কেরল, তুলব ও হৈগে বা হবিক অর্থাৎ পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অপ্রশস্ত অঞ্চল পরশুরাম সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। উত্তরে হবিকের প্রাচীন নাম কন্নাদ বা কর্ণাট। অহিক্ষেত্র নামেও ইহা পরিচিত। ইহার দক্ষিণে তুলব, তুলবের দক্ষিণে কেরল। তুলবের শিবাণী, কোটা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাতিকে কদম্ববংশের ময়ূরবর্ম উত্তর অঞ্চল হইতে আনিয়াছিলেন প্রবাদ আছে। কোঙ্কানী ও সারস্বত ব্রাহ্মণ ত্রিহুত হইতে আসিয়াছিলেন এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত। অহি-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন পরশুরাম। হিরণগল্লী ও অন্যান্য পল্লব অনুশাসন

হইতে উত্তর অঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা জানিতে পারা যায়। মালাবারের নম্বুদ্রিগণ উত্তর অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত। মালাবারের প্রচলিত সম্বন্ধম প্রথা, শিবাল্লী, নাগর, মচী ও মত্তি ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তির প্রাচীন কিম্বদন্তী হইতে রক্ত-মিশ্রণের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। নায়ারদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত আছে তাহাতেও এই মিশ্রণের কথা সমর্থিত হয়।

কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী সোস্তাস্থজি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, লম্বামুণ্ড নিষাদ গোষ্ঠী ও পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতানার লম্বামুণ্ড জাতিগুলি বাদে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সকল লম্বামুণ্ড জাতি একগোষ্ঠীয়। মেডিটারে-নীয়ান নামটি ব্যবহার না করিয়া তাঁহারা এই গোষ্ঠীকে Brown race বা Indic race নাম দিতে চাহেন।

ইহার পরে উত্তর ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে দক্ষিণ ভারতের মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী হইতে কি কারণে কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পৃথক মনে করেন তাহার আলোচনা করা হইবে।

দ্রাবিডিয়ান থিওরী বা স্বতন্ত্র দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ কি প্রকার প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। পরে এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইবে।

আলোচনার ফলে যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ডাঃ গুহের বর্ণিত দক্ষিণ ভারতের প্যালি-মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষাভাষী দ্রাবিডিয়ান জাতিতে দাঁড় করান হইয়াছে। তাঁহার বর্ণিত মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী প্রধানতঃ উত্তর ভারতের অধিবাসী। ইহারা ছাড়া উত্তর ভারতে আর একটি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিকে দেখা যায়। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রাচ্য জাতি।

উত্তর ভারতীয় লম্বামুণ্ড মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর প্রথম জাতির কথা বলা হইতেছে। ডাঃ গুহের মতে এই জাতির লক্ষণগুলি উত্তর ভারতের অধিবাসী-দিগের মধ্যে প্রবল এবং ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশের অধিবাসীদিগের উচ্চশ্রেণী-

গুলির মধ্যেও এই জাতির লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবশিষ্ট অংশের মধ্যে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের অঞ্চলও ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয় বা প্রাচ্য জাতির লক্ষণগুলি পাঞ্জাবে প্রবল, সিন্ধু, রাজপুতানা এবং যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম অংশেও অধিবাসীদিগের মধ্যে এই লক্ষণগুলি দেখা যায়। অন্যত্রও যে এই-গুলি একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে।

দেখা যাইতেছে যে উত্তর ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর বিস্তৃতি পাঞ্জাব হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত। এই গোষ্ঠীকে দুইটি টাইপে বা জাতিতে পৃথক করা হইয়াছে কেন, দেখা যাউক।

প্রথম টাইপ বা জাতিকে পরে সিন্ধু টাইপ নাম দিয়াছেন ডাঃ গুহ। ইহার কারণ ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, সিন্ধু উপত্যকার মোহেঞ্জোদারোতে ও আরও পূর্বে যে সকল মনুষ্যকরোটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ এই টাইপের। দ্বিতীয় টাইপের অস্তিত্বের পরিচয়ও মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় পাওয়া গিয়াছে। এই টাইপ প্রথম টাইপ হইতে কিছু ভিন্ন কিন্তু একই গোষ্ঠীর। প্রথমে এই টাইপকে বলা হইয়াছে large-brained Indus type, পরে Fischer-এর প্রদত্ত "ওরিয়েণ্টাল" নাম ডাঃ গুহ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু টাইপের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ইহা অনেকটা য়ুরোপীয়ান মেডিটারেনীয়ান টাইপের মত। Cranial vault নীচু, গাত্রচর্ম উজ্জ্বল শ্যাম, কাল নহে। দৈর্ঘ্য মাঝারি, গড়ন পাতলা, নাসিকা উচ্চ ও সরু, মাংসল নহে। মুখে ও গাত্রে প্রচুর কেশ। প্রাচ্য টাইপ প্রথম টাইপের অনুরূপ, পার্থক্য শুধু নাসিকার গড়নে। এই জাতির নাক লম্বা (unusually long and convex)।

প্যালি-মেডিটারেনীয়ান বা দক্ষিণ ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী হইতে এই উত্তর ভারতীয় গোষ্ঠীর পার্থক্য মস্তকের আকৃতিতে, গাত্রবর্ণে, নাসিকার আকৃতিতে এবং মুখ ও গাত্রে কেশের প্রাচুর্যে। দক্ষিণ ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী সম্বন্ধে পূর্বের আলোচনার ফলে দেখা গিয়াছে যে তেলেগু, কানাড়ী ও তামিল, ইহাদের মধ্যে জাতি হিসাবে কোনটিকে প্যালি-মেডিটারেনীয়ান শ্রেণীতে ফেলা কঠিন। উত্তর ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর যে সকল লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদিগের,

বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীগুলির মধ্যে, এই সকল লক্ষণ মিলাইয়া পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। এ-কথা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা কেহ স্পষ্ট, কেহ অস্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মতে উত্তর ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান জাতি কোন্ সময়ে ও কোথা হইতে আসিয়াছিল দেখা যাউক।

উত্তর ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর প্রথম টাইপকে সিন্ধু টাইপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সিন্ধুযুগে এই জাতিকে ভারতবর্ষে দেখা যায়। সিন্ধুযুগ তাম্রযুগ এবং অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ হইতে ২৫০০ এই যুগের আমল। পণ্ডিতগণের মতে সিন্ধু সভ্যতার পত্তন হইবার অনেক আগে এই জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই জাতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল এবং মেশোপটেমিয়া এলাম, আনাউ ও বেলুচিস্থানের নাল ও মাক্রাণে যে লম্বামুণ্ড জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারা ও এই সিন্ধু জাতি অভিন্ন।

কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী এই সিন্ধুজাতির পরিচয় সম্পর্কে অনেকখানি জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া যে, সিন্ধু উপত্যকার এই জাতি দ্রাবিড় ভাষাভাষী ছিল। তাঁহাদের মতে আর্যজাতির আক্রমণের ফলে এই জাতি সিন্ধু উপত্যকা ও উত্তর ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ ভারতে চলিয়া যায়। প্রমাণের অভাব বশতঃ অনেকে সিন্ধুজাতিকে দ্রাবিড়-জাতি বলিতে অনিচ্ছুক। বাস্তবিক পক্ষে এই ধরণের অনুমান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এলাকার মধ্যে পড়ে না।

উত্তর ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর দ্বিতীয় জাতি অর্থাৎ ডাঃ গুহের মতে প্রাচ্যজাতি, সিন্ধুজাতির পরে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। এই জাতির আদি বাসভূমি আরব ও এসিয়া মাইনর। ডাঃ গুহ বলিয়াছেন যে, সেমিটিক অধ্যুষিত অঞ্চলে ইহাদিগকে দেখা গেলেও ইহারা সেমিটিক নহে। কেন ইহাদিগকে সেমিটিক বলা হইবে না এবং সেমিটিক হইতে ইহাদের বাস্তবিক পার্থক্য কি তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তারপর ইহাদিগকে third and latest Mediterranean strain বলিয়া একস্থানে বর্ণনা করা হইলেও ডাঃ গুহ অন্যত্র ইহাদিগকে large-brained chalcolithic type বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে মাক্রাণ, হরাপ্পা ও মোহেঞ্জোদারোর নিম্নস্তর গুলিতে এই জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বর্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে এই জাতির লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় (কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে, পাঠান এলাকায় ইত্যাদি)।

সুতরাং মনে করিতে হয় যে, এই জাতি সিন্ধু জাতি হইতে পরে আসিয়াছিল এই মত ঠিক নহে। মোহেঞ্জোদারোর নিম্নস্তরগুলিতে এই জাতির করোটি প্রভৃতি পাওয়াতে অনুমান করিতে হয় যাহাদিগকে ডাঃ গুহ সিন্ধু-জাতি নাম দিয়াছেন, ইহারা তাহাদের পূর্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। আরব ও এশিয়া মাইনর হইতে এই জাতির আসিবার কথা অনুমান মাত্র।

মোহেঞ্জোদারোর এই large-brainod জাতি সম্বন্ধে আরও বলিবার আছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টের ১ম ভাগ ৩য় খণ্ডে ডাঃ গুহ ও কর্ণেল সেওয়েল এবং large-brained জাতিকে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ডাঃ গুহ এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে ইহারা ককেশিয়ান। ইহার পরে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিতেছেন যে, যে-নর্ডিক সম্পর্কিত জাতির ভারতবর্ষে আগমন আর্যজাতির ভারত আক্রমণের সমসাময়িক ব্যাপার মনে হয়, এই জাতির সহিত তাহার সম্পর্ক আছে (C. R. 1931 Vol. 1 Part 3 p. lxx)। ডাঃ গুহ বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একত্র করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, মোহেঞ্জোদারোর এই দ্বিতীয় জাতি, তক্ষশীলার ধর্মরাজিক বিহারে যাহাদের কয়েকজনের করোটি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই "large-braine." জাতির সহিত সম্পর্কিত এবং ধর্মযাজিক বিহারের এই জাতির লক্ষণগুলি দেখা যায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে সকল জাতিকে তিনি ফিসারের অনুসরণ করিয়া "প্রাচ্যজাতি" নাম দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে।

সিন্ধু উপত্যকার এই জাতির পরিচয় যাহাই হউক, যে-সিন্ধুজাতিকে ডাঃ গুহ ও অন্যান্য পণ্ডিত সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা বলিয়াছেন ইহারা তাহাদের পূর্ব হইতে বা তাহাদের সময়ে সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল। মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা এই উভয় স্থানে এই জাতির উপস্থিতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান করা চলে যে, সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টিতে এই জাতিরও হাত ছিল।

আরেকটা কথা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সিন্ধু জাতি ও এই দ্বিতীয় জাতির বংশধর ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে রহিয়াছে স্বীকার করা হইতেছে। ইহার মধ্যে মাত্র একটি জাতির প্রতিনিধিদিগকে উত্তর-পশ্চিম হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণের অঞ্চল পর্যন্ত দেখা যায় বলা হইতেছে। যাহারা সিন্ধু উপত্যকায় আগে আসিয়াছিল, প্রমাণ হইতে এই কথা বলা যায় তাহাদের বংশধরদিগকে উত্তর ভারতের একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে মাত্র দেখা যায় এইরূপ বলিবার কোন সন্তোষজনক কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রাচ্যজাতির (Oriental race) ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা আছে। ফিশারের যে প্রাচ্য জাতির সংজ্ঞা ডাঃ গুহ গ্রহণ করিয়াছেন, উহা লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ডেনিকার প্রাচ্য জাতির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত। প্রাচ্য জাতি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের নাম নহে, আলঙ্কারিক নাম।

উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীকে আর কি কি নাম দেওয়া হইয়াছে দেখা যাউক।

রিজলে ভারতবর্ষের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত অধিবাসীদিগকে সোজাসুজি দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন, দ্রাবিড় ও আর্য। এই আর্যের একটি বিশেষণ আছে, ইন্দো-আরিয়ান বা ভারতীয় আর্য। ভারতীয় আর্য নাম তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন উত্তর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানার, লম্বামুণ্ড জাতিগুলির সম্বন্ধে। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম দ্রাবিড়। এই দুইটি প্রধান গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে মোঙ্গল ও সিথিয়ানদিগের সহিত এবং এই দুইটি গোষ্ঠীর পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ হইয়াছে। উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড অধিবাসী তাঁহার মতে দুইটি শাখায় বিভক্ত, অমিশ্র ইন্দো-আরিয়ান ও মিশ্র আর্য-দ্রাবিড় (যুক্তপ্রদেশ)। উত্তর ভারতের একাংশের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে ইন্দো-আরিয়ান নাম দিবার কারণ এই জাতিগুলিকে ভারতবর্ষে যে আর্যজাতি আসিয়াছিল তাহাদের বংশধর বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। অবশ্য ইহা বিশ্বাস বা অনুমান মাত্র, আর্যজাতি যে বাস্তবিক লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর ছিল তাহা প্রমাণ হয় নাই এবং প্রমাণ করিবার উপায় নাই।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, রিজলের মতে গোটা ভারতবর্ষের অধিবাসী দ্রাবিড় জাতীয় ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমাবদ্ধ অঞ্চলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া আর্যজাতি আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর ভাগে তাহারা দ্রাবিড়দিগের সহিত মিশিয়াছে। পশ্চিম ভারতে ও গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বভাগে দ্রাবিড়দিগের সহিত সিথিয়ান বা শক ও দ্রাবিড়দিগের সহিত মোঙ্গলীয় জাতি মিশিয়াছে।

রিজলের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর নাম হইয়াছে। ইন্দো-আফগান। আফগানিস্থান, উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও কাশ্মীরের অধিবাসী ইন্দো-আফগান টাইপের। গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসীদিগের মধ্যে উচ্চ বর্ণগুলি ইন্দো-আফগান টাইপের। ইন্দো-আফগান জাতির বাসভূমি আফগানিস্থান। সুতরাং এই মতানুসারে দাঁড়ায় যে আফগানিস্থান হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত অঞ্চলের, কাশ্মীর ও রাজপুতানার অধিবাসী মোটামুটি এক টাইপের। ইংরেজ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেডন এই মতের সমর্থক।

জার্মাণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আইকষ্টেডের মতে ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণের তৃতীয় স্তর গঠিত হইয়াছে দক্ষিণ য়ুরোপের জাতিগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ইণ্ডিড (Indide) গোষ্ঠীর দ্বারা। ইহাদের পরে আসিয়াছে যাযাবর, পশুপালক আর্য জাতি। আর্য জাতির পরে আসিয়াছে তুরিনিদ (Turinids) ও ওরিয়েণ্টালিড (Orientalids)। তুরিনিদ অর্থাৎ তুরানীয় গোষ্ঠী (মোঙ্গল-তুর্ক) সম্পর্কিত এবং ওরিয়েণ্টালিড বা প্রাচ্য জাতি আসিয়াছে ইসলাম ধর্মী আক্রমণকারীদিগের সঙ্গে বা আক্রমণকারীরূপে।

ইতালীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী জিউক্রিদা রুগ্‌গেয়ী দ্রাবিড়জাতির পরে যে সকল গোষ্ঠী ভারতবর্ষে আসিয়াছে মনে করেন তাহাদিগকে মোটামুটি লম্বামুণ্ড আর্য জাতি ও গোলমুণ্ড শ্বেতকায়গোষ্ঠীভুক্ত (leucodermic) জাতি নাম দিয়াছেন। ডাঃ হাটনের মতে উত্তর ভারত হইতে মেডিটারেনীয়ান জাতি দক্ষিণ ভারতে চলিয়া গিয়াছিল বৈদিক আর্য জাতির আক্রমণের ফলে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই আর্য জাতির প্রতিনিধিদিগকে দেখা যায়। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে গোলমুণ্ড জাতিগুলি পামীরী বা আলপাইন জাতির প্রতিনিধি।

দেখা যাইতেছে যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের লম্বামুণ্ড অধিবাসীদিগকে

মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া ডাঃ গুহ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন সে মত আইকষ্টেড বাদে আর বিশেষ কেহ গ্রহণ করিতেছেন না। আইকষ্টেডের ইণ্ডিড জাতি য়ুরোপীয় মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত বটে, কিন্তু এই জাতির মধ্যে মাতৃকুলগত সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ইত্যাদি যে সকল মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান হয় তিনি ইলিয়ট স্মিথের ব্রাউন জাতি সম্পর্কিত মত খানিকটা গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু দ্রাবিড় নামের বদলে ইণ্ডিড নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

উপরে দেখা গিয়াছে যে, উত্তর ভারতের মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দুই জাতিকেই সিন্ধু সভ্যতার যুগ হইতে ভারতবর্ষে দেখা যায়। স্তর বিন্যাসের হিসাবে ডাঃ গুহের বর্ণিত large-brained জাতি আগে আসিয়াছিল প্রমাণ হয়। এই জাতিকে ডাঃ গুহ অন্যত্র নর্ডিক বা প্রোটো-নর্ডিক সম্পর্কিত বলিয়াছেন। প্রোটো-নর্ডিক কথাটির গুরুত্ব আসিয়াছে উহার আর্য সম্পর্ক হইতে। সুতরাং আরব ও এশিয়া মাইনর হইতে আগত যে সেমিটিক-ঘেঁষা প্রাচ্য জাতির কথা ডাঃ গুহ বলিয়াছেন প্রকারান্তরে তাহার আর্য সম্পর্ক বাহির হইতেছে। এই জাতিই রিজলের ইন্দো-আরিয়ান এবং হেডন ও অন্যান্যের ইন্দো-আফগান। কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঠান এবং রাজপুতানার (অংশের) অধিবাসীকে ডাঃ গুহ মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী, হেডন, রিজলে প্রমুখ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ইন্দো-আফগান বা ইন্দো-আরিয়ান বলিতেছেন। ডাঃ গুহের সিন্ধুজাতি আইকষ্টেডের ইণ্ডিড, ইলিয়ট স্মিথের ব্রাউন জাতি।

উপরে বলা হইয়াছে যে দক্ষিণ ভারতীয় বা প্যালি-মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী ও উত্তর ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি হিসাবে তাহা বাহির করা কঠিন। যে আলোচনা এ পর্যন্ত করা হইয়াছে তাহা হইতে একথা আরও স্পষ্ট হইতেছে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য Europoid কথাটির আমদানী করিয়াছেন। কথাটি ব্যবহার করিতে গিয়া উহাকে কিছু পরিমাণ অনুগ্রহরসসিক্ত করা হইয়াছে। এজন্য ইহার ব্যবহার আপত্তি-জনক। তারপর সিন্ধু যুগ হইতে যে জাতিকে ভারতবর্ষে দেখা যাইতেছে তাহার সম্বন্ধে এই কথাটির ব্যবহার ভ্রান্তিমূলক।

প্যালি-মেডিটারেনীয়ানের যে সকল লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদিগকে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণ তামিল, তেলেগু, মলয়ালী, কানাড়ী, কোদাগু ও তুলু ভাষাভাষীদিগের মধ্যে শতকরা কতজনের মধ্যে দেখা যায় তাহার হিসাব করা প্রয়োজন। মোটামুটি হিসাবে তেলেগু, তুলু, কানাড়ী, কোদাগু ভাষাভাষীরা বাদ যাইবে এবং তামিল ও মলয়ালী ভাষাভাষীদিগের মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে শতকরা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে এই সকল লক্ষণের কোন কোনটি মিলিতে পারে। এইরূপ একটা হিসাব অন্যত্র করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় শতকরা ১০ জন লোকের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায় (*Dravidian Theory* by N. M. Chaudhuri, *Science and Culture*, February, 1948)। ইহাতে বড়জোর দুইটি বা ততোধিক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ প্রমাণ হইতে পারে, আলাদা একটা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব কোনক্রমে প্রমাণ হয় না।

এই সংমিশ্রণের পরিমাণ ও বিস্তৃতি অনুযায়ী লোকসংখ্যা বাদ দিলে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, উচ্চবর্ণের দক্ষিণ ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী ও উত্তর ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহা উপেক্ষার যোগ্য। উত্তর-পশ্চিম ভারত ও হিন্দুস্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে সকল পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে তাহাও উপেক্ষার যোগ্য। ("Fundamental racial strain in the valleys of the Indus and the Ganges is the same." "People of the Punjab homogenous and allied to the Pathans and dolichocephalic races of the N. W. regions"—B. S. Guha.)

সিন্ধু জাতিকে দ্রাবিড় ভাষাভাষী বলিয়া যে মত প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই মত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

সিন্ধু জাতিকে যাঁহারা মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী বা Dravidian বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মতের আলোচনা পরে করা হইবে। ইঁহাদের সিদ্ধান্তের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটির উল্লেখ করা হইতেছে। সিন্ধু ভাষায় যথেষ্ট নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীল ও সীলিং-গুলিতে রহিয়াছে। এ পর্যন্ত এই সকল লেখনের পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত পাঠোদ্ধার হয় নাই। কিন্তু এই বাধা সত্বেও তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতি মেসোপটেমিয়া হইতে সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়াছিল।

তাহাদের আদি বাসস্থান হইল পূর্ব মেডিটারেনীয়ান অঞ্চল। এই অঞ্চলে প্রচলিত ধর্ম, আচার প্রভৃতি বহন করিয়া আনিয়া তাহারা মেসোপটেমিয়ায় উপনিবিষ্ট হয় ও পরে তাম্রযুগের সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া তুলে। আর্য জাতির আক্রমণে তাহারা উত্তর ভারত হইতে ক্রমে দক্ষিণে সরিতে সরিতে বিন্ধ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। দ্রাবিড় থিওরীর প্রচারকগণ কেহ আরও অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ ভারতে বর্তমানে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির কোন্ কোন্‌টি পূর্ব মেডিটারেনীয়ান অঞ্চল হইতে আসিয়াছে তাহা বলিয়া দিতে ইতস্তত: করেন নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে, এখানে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ পথ ছাড়িয়া কতদূর বিপথে গিয়াছেন তাহার সামান্য একটু আভাস দেওয়া হইল। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে, কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৈদিক ধর্ম দ্রাবিড় জাতির সৃষ্টি।*

দক্ষিণ ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী হইতে উত্তর ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর পার্থক্য নির্দেশ করিয়া একজন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উত্তর ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দুইটি টাইপ সিন্ধু যুগ হইতে এ দেশে আছে। উত্তর ভারতের অধিবাসী যদি সিন্ধু যুগ হইতে এ পর্যন্ত প্রধানতঃ মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর রহিয়া গিয়া থাকে এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী যদি আরেকটি প্রাচীনতর মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত জাতি হয় তাহা হইলে অনুমান করিতে হয়, ভারতবর্ষে আর্য জাতির বিনা অস্তিত্বে আর্য ভাষা ও আর্য সভ্যতার প্রচার হইয়াছে। সিন্ধু যুগের পরে ভারতবর্ষে আর্য জাতির আক্রমণ হইয়াছিল ইহাই সাধারণ মত। মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার কৃষ্টি যাহারা ধ্বংস করিয়াছিল বলা হইয়াছে, সেই আর্য জাতি কোথায়? ডাঃ গুহের মত গ্রহণ করিলে বলিতে হয় সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করিয়া আর্য জাতি পশ্চাদপসরণ করিয়া সফেদ কোহ্, সুলেমান ও হিন্দুকুশ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং এখনও এই সকল অঞ্চলই তাহাদের প্রধান কেন্দ্র। আশ্চর্যের বিষয় তাম্র যুগের "large-brained" type সম্বন্ধে

---

*(Srinivas Iyengar—*Life in Ancient India* ও G. Srater—*Dravidian Element in Indian Culture* দ্রষ্টব্য)।

সেন্সাস রিপোর্টে তিনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন পরবর্তী রচনায় তাহা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন।

মেডিটারেনীয়ান জাতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতের যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে। এখানে এই প্রশ্নগুলির উল্লেখ করা হইতেছে, ইহার পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক হইবে।

প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বা নিষাদ গোষ্ঠী বাদে ভারতবর্ষের অন্যান্য লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীয় জাতিগুলিকে মেডিটারেনীয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্বের দ্রাবিড় নাম যেমন অবৈজ্ঞানিক হালের মেডিটারেনীয়ান নাম তাহা অপেক্ষা কম অবৈজ্ঞানিক নহে। Sergi-র উদ্ভাবিত মেডিটারেনীয়ান নামের ব্যবহারে অস্পষ্টতা বাড়িয়াছে কতকগুলি কারণে। প্রথমতঃ মেডিটারেনীয়ান নাম দিবার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুমান করা হয় যে, এই গোষ্ঠী ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল; কারণ, তাহা না হইলে মেডিটারেনীয়ান নাম দিবার কোন অর্থ হয় না। এই অনুমান প্রমাণ করিবার চেষ্টায় অযথা মনযোগ বিভ্রান্ত ও সময় নষ্ট করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনুমান। মাত্র বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ব্যবহার দ্বারা অনুমানকে বৈজ্ঞানিক তথ্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়।

মেডিটারেনীয়ান থিওরী পরীক্ষা করিতে গেলে গোষ্ঠী-লক্ষণ, আদি বাস-ভূমি, সম্প্রসারণ, অন্যান্য গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণ ইত্যাদি নানা ব্যাপারে পণ্ডিতগণের মতের মধ্যে অসঙ্গতি চোখে পড়ে। দ্রাবিড় থিওরীর সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে মেডিটারেনীয়ান থিওরীর অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি আরও বাড়িয়াছে।

ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রোটো-ইজিপসীয়ান বা প্রি-ডাইনাষ্টিক মিশরীয় জাতিব সহিত সম্পর্ক, মেসোপটেমিয়া ও এনাউ-য়ের সঙ্গে সম্পর্ক এবং প্যালি-মেডিটারেনীয়ান, সিন্ধু টাইপ, ওরিয়েণ্টাল জাতি প্রভৃতি নাম কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া গিয়া তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত যে সকল বৈজ্ঞানিক মতের আলোচনা করা হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, তথাকথিত প্রাচ্য (Oriental) ও (Indus) টাইপের মধ্যে সামান্য পার্থক্য (ডাঃ গুহের মতে নাসিকার গঠন) উপেক্ষা করিলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নাই। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের কতকগুলি নিম্ন বর্ণের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য (কৃষ্ণ

গাত্রবর্ণ, নাসিকার ও মস্তকের গঠনের বৈশিষ্ট্য) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পার্থক্য প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বা নিষাদ গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের ফল বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে যেমন উত্তর ভারতে তেমনি দক্ষিণ ভারতে এই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী বাদে অধিবাসীদের বৃহৎ অংশ গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর (brachycephalic) এবং কতক অংশ মধ্যমাকৃতি মুণ্ড (mesaticephalic) পর্যায়ভুক্ত। ভারতবর্ষের সম্পর্কে মেডিটারেনীয়ান নামটির ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী নাম দেওয়া সমীচীন। এই হিসাবে আইকষ্টেডের "ইন্দিদ" নামটি অনেকখানি সঙ্গতিপূর্ণ।

পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ

ডাঃ গুহের মতে তিনটি পৃথক টাইপের পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ দেখা যায় ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে, আল্পিনয়েড, দিনারিক, আর্মেনয়েড। য়ুরোপের আল্পস পর্বতমালার অধিবাসী দিনারিক আল্পসের অঞ্চলের (ডালমাশিয়া হইতে ক্রোয়েশিয়া) অধিবাসী ও আর্মেনিয়ার অধিবাসীদের টাইপ হইতে এই নামগুলি আসিয়াছে। টাইপ তিনটির মধ্যে মস্তকের গঠনের কিছু পার্থক্য আছে। দিনারিক ও আর্মেনয়েড টাইপের নাক লম্বা, বর্তুলাকার (Convex)

তাঁহার মতে সিন্ধু উপত্যকার এবং তিনেভেলী ও হায়দরাবাদের লৌহ যুগের নিদর্শনগুলিতে আল্পেনিয়েড ও দিনারিক টাইপের করোটি পাওয়া গিয়াছে। বাংলা, উড়িষ্যা, কাথিয়াবাড়, কন্নাদ, তামিল অঞ্চল ও কুর্গে দিনারিক টাইপের, গুজরাটে আল্পিনয়েড টাইপের এবং পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্মেনয়েড টাইপের সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি সম্ভবতঃ দক্ষিণ আরব হইতে বেলুচীস্তানের মাক্রাণ উপকূলের পথ ধরিয়া এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই গোষ্ঠীর পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড নামকরণ করা হইয়াছে এশিয়ার মোঙ্গলয়েড লক্ষণযুক্ত গোলমুণ্ড গোষ্ঠীগুলি (তুর্কী গোষ্ঠী, মোঙ্গল বা তুঙ্গুজ-গোষ্ঠী, দক্ষিণী মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠী, পলিনেশিয়ান বা 'নেসিয়ট' গোষ্ঠী) হইতে

পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য। য়ুরোপের গোলমুণ্ড গোষ্ঠীব জাতিগুলির বাস-ভূমি, মধ্য ফ্রান্স, সোয়াবিয়ান জুবা, আল্পস, জেকো-স্লোভাকিয়া, কার্পেথিয়া, বলকান, গ্রীস ও রুশিয়ায (স্লাভ)। বল্টিক সাগরের পূবে ও দক্ষিণে, পোলাণ্ডে, প্রুশিয়াব কোন কোন অঞ্চলে, সাইলেশিয়া ও স্যাকসনি অঞ্চলের গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর অধিবাসীদের ডেনিকার ওরিয়েন্টাল রেস (প্রাচ্য জাতি) নাম দিযাছেন।

ভাবতবর্ষে পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীব তিনটি টাইপের ডাঃ গুহ যে নাম-করণ করিয়াছেন অনেকে তাহা গ্রহণ কবেন নাই। তাঁহাব অন্য রচনায় তিনটি টাইপের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই।

পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা উঠিবার আগে স্যর হারবার্ট রিজলে এদেশেব গোলমুণ্ডের (brachycephals and meso cephals) জাতি-গুলির মধ্যে মোঙ্গলয়েড ও সিথিয়ান সংমিশ্রণের কথা বলিয়াছিলেন।

রিজলের মতে পশ্চিম ভারতের (মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কন্নাদ) গোলমুণ্ড সিথিয়ান টাইপের, পূর্ব ভারতের গোলমুণ্ড মোঙ্গলয়েড টাইপের। তাঁহার মতে এই দুই অঞ্চলেই দুই টাইপের গোলমুণ্ডের সঙ্গে লম্বামুণ্ড দ্রাবিড় টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে। প্রথমে সিথিয়ান টাইপের কথা বলা হইতেছে।

সিথিয়ান নামে পরিচিত মধ্য-এশিয়ার কতকগুলি যাযাবর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে আসিযাছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথমে আসিয়াছিল শক, তারপর য়িয়ুচী, কুশান বা তোখারী এবং শেষে আসিয়াছিল হূন নামে পরিচিত জাতি। এই তিনটি জাতি ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে সিথিয়ান। ভারতবর্ষে সিথিয়ান আক্রমণকারীদের সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা কবা হইবে, এখানে রিজলের মতের আলোচনা প্রসঙ্গে সিথিয়ান জাতির কথা কিছু বলা হইতেছে। দেখা যায় কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরিচিত শক জাতিই সিথিয়ান। ইহারা চীনা ইতিহাসে Sse, ইরাণের ইতিহাসে Sakai ও গ্রীক লেখকদিগের বিবরণে Sucae নামে পরিচিত। খ্রীঃ পূঃ ১৫০ হইতে ১৪০ সনের মধ্যে তাহারা ভারত-বর্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণের নিকট সিন্ধুদেশ ইন্দো-সিথিয়া নামে পরিচিত ছিল। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষের রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি জাতি সিথিয়ান। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক

যে, রিজলের মতে সিথিয়ান টাইপ গোলমুণ্ড টাইপ। কিন্তু সিথিয়ান সংমিশ্রণের কথা বলিবার সময় তিনি শক, য়িয়ুচী, হূন, ইহাদের কোন একটির বা সকলের সঙ্গেই সংমিশ্রণের কথা বলিতে চাহেন কিনা তাহা পরিষ্কার নহে। যাঁহারা রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি জাতির মধ্যে সিথিয়ান সংমিশ্রণের কথা বলেন, সিথিয়ান টাইপ কি প্রকারের সে সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা স্পষ্ট নহে। রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার *Indo Aryan Races* গ্রন্থে সিথিয়ান টাইপ যে গোলমুণ্ড ছিল এই মত মানিয়া লইয়াছেন। হেডনের মতে শকেরা ছিল মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের (mesocephalic) মিশ্র জাতি। তিনি ইহাদের শাসক বা অভিজাত সম্প্রদায়কে প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়াছেন। রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি জাতি লম্বামুণ্ড। তাহারা সিথিয়ান হইলে, অনুমান করিতে হয় যে সিথিয়ানরা ছিল লম্বামুণ্ড। কেহ কেহ যিয়ুচী ও হূণদিগকে তুর্কী গোষ্ঠীর বলিয়া মনে করেন। ইহা ঠিক হইলে তাহারা গোলমুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত ছিল বলিতে হয়।

শক, য়িয়ুচী ও হূন জাতির বাংলাদেশে আসিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই জন্য রিজলে বাংলাদেশে গোলমুণ্ডের উৎপত্তি মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ হইতে আসিয়াছে বলিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্ব সীমানার মোঙ্গলয়েড জাতির উপস্থিতির কথা উঠাইয়াছেন।

পূর্বভারতের অধিবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে গোল-মুণ্ডের উৎপত্তি মোঙ্গলীয়ান, রিজলের এই মত খণ্ডন করিতে গিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ ইতিহাসে মোঙ্গলয়েড জাতির ভারতবর্ষের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিবার উল্লেখ নাই এই যুক্তির উপর অনাবশ্যক জোর দিয়াছেন। রিজলে পূর্বভারতে গোলমুণ্ডের প্রাধান্য দেখিয়া মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর অন্য কোন লক্ষণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে আছে কিনা এ প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। তাঁহার মত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইতিহাসের কথা না তুলিয়া শুধু এই কারণেই সে মত অগ্রাহ্য করা চলে। মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ পূর্বভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে যথেষ্ট রহিয়াছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে এই সংমিশ্রণ রহিয়াছে।

ইহার পর ডাঃ গুহ আর্মেনয়েড টাইপের গোলমুণ্ডের গোষ্ঠীগুলিকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। হিন্দুকুশ ও হিমালয় হইতে পশ্চিমদিকে

প্রসারিত মালভূমিগুলিতে যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠী বাস করে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে য়ুরেশিয়াটিক বা পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠী। পামীরের উপত্যকাগুলি, ইরাণ, আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়ার মালভূমি এই য়ুরেশিয়াটিক গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর অঞ্চল। পামীর হইতে পশ্চিমে পার্বত্য অক্ষরেখা আনাতোলিয়া অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। য়ুরোপের আল্পস নামে পরিচিত পর্বতশ্রেণী এই অক্ষরেখার অংশ। আল্পস হইতে পামীর পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল ও মালভূমির অধিবাসী প্রধানতঃ গোলমুণ্ড। পামীরের পূর্বে, উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি পর্বতশ্রেণী প্রসারিত হইয়াছে। উত্তরে তিয়েনশান পর্বতশ্রেণী ১৫০০ মাইল বিস্তৃত। দক্ষিণে কুয়েনলুন ও আলতিনতাঘ নামে যুক্ত পবতশ্রেণী তিব্বতের উত্তরে বিস্তৃত। আলতিনবাঘ চীনের নানশান ও য়ুনলিংয়ের সহিত মিশিয়াছে। এই দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত তারিম অববাহিকা, তিয়েশানের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল, কুয়েনলুনের দক্ষিণে তিব্বতের মালভূমির কতক অংশ মোঙ্গলয়েড টাইপের গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর অঞ্চল।

আলপাইন টাইপটি সম্বন্ধে আর একটু জানিবার বিষয় আছে। ভারতবর্ষে যে আলপাইন টাইপের কথা বলা হয়, তাহা য়ুরোপের আলপাইন টাইপের সম্পর্কিত বলিয়া এইরূপ নাম দেওয়া হয় না। পামীরের উপত্যকাগুলির অর্থাৎ কারাটেঘিন, রোশান, সিগনান ওয়াখান, প্রভৃতি অঞ্চলের ইরাণী ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষাভাষী অধিবাসীদিগকে এবং হিন্দুকুশের কয়েকটি উপজাতিকে প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী লাপুজ (Lapouge) যাহাকে Homo Alpinus টাইপ বলেন সেই টাইপের অনুরূপ বলিয়া আলপাইন নাম দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের গোলমুণ্ড টাইপ এই পামীরী গোলমুণ্ড টাইপের সম্পর্কিত।

ভারতবর্ষে আর্মেনয়েড টাইপের অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন সিওয়েল, গুহ ও হাটন।

হরপ্পায় একটি করোটি পাওয়া গিয়াছে যাহা সিওয়েল ও গুহ আর্মেনয়েড বলিয়া মনে করেন। এই একটি করোটির প্রমাণের উপর ডাঃ হাটন একটি প্রকাণ্ড মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন যে, সিন্ধু সভ্যতা মেডিটারেনীয়ান ও আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর মিলিত কীর্তি। তাঁহার মতে এই সভ্যতা বিকাশে মেডি-টারেনীয়ান অপেক্ষা আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর কৃতিত্ব অধিক। তিনি বলেন, এই

দুইটি গোষ্ঠী মিলিয়া মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতবর্ষে আসিয়া তাহারা সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। হাটনের মতে তামিল জাতির মধ্যে আর্মেনয়েড সংমিশ্রণ দেখা যায়।

আর্মেনয়েড টাইপ বলিতে তিনি কি বুঝেন তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ডাঃ হাটন বলেন যে, এই টাইপ সাধারণ আল্পাইন গোষ্ঠীর একটি শাখা। মস্তকের আকৃতিতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে (hypsibrachyaphalic)। এই টাইপের উৎপত্তিস্থান তাঁহার মতে আনাতোলিয়ায় ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। ডাঃ গুহের মতে এই টাইপের বৈশিষ্ট্য মস্তকের গঠনের বৈশিষ্ট্য, flattened occiput।

Hypsicephalic কথাটির সাধারণ অর্থ high brachycephalic head এবং flattened occiput কথাটির অর্থ মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগ খাড়া নামিয়াছে, arched বা protruding নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হরাপ্পার একটি মাত্র করোটি পরীক্ষা করিয়া সিন্ধুযুগে ভারতবর্ষে আর্মেনয়েড জাতির উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে।

ডাঃ গুহ দিনারিক টাইপের কথা বলিয়াছেন। মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় প্রাপ্ত গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর করোটিগুলি পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিতেছেন, 'The occipital parts are not usually flattened in these skulls but in one No. 11635 it is marked, showing definitely the presence of the Armenoid strain।' এই করোটি বাদে অন্য গোলমুণ্ড করোটিগুলিকে তিনি আলপাইন বলিয়াছেন। ইহার পর দেখা যায় যে, মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার সবগুলি গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর করোটির পরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, "apparently of Armenoid affinities."। তারপর তিনি বলিতেছেন যে মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় আর্মেনয়েড জাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। (যদিও মোহেঞ্জোদারোর কোন করোটিকে আর্মেনয়েড বলা হয় নাই। Marshall, *Mohenzo-Daro and Indus civilisation* দ্রষ্টব্য)।

এইবার আলপাইন টাইপের কথায় আসা যাউক। ভারতবর্ষের আলপাইন জাতির পরিচয় প্রসঙ্গে ডাঃ গুহ বলিতেছেন, ইহাদের আলপাইন নাম হইয়াছে, "from their association with that European region"। ভারতবর্ষের আলপাইন জাতিকে পামীরী গোলমুণ্ড জাতির সম্পর্কিত বলা

হয় এ কথা আগে বলা হইয়াছে, য়ুরোপের আলপাইন টাইপের সহিত সম্পর্কের কথা এখানে উঠিতেছে না।

পণ্ডিতগণের মতে ইরাণ, পামীর ও পাশ্বর্বর্তী অঞ্চলে এই পামীরী-ইরাণীয়ান টাইপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উত্তর-পূর্বে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত এই জাতি অগ্রসর হইয়াছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই পামীরী-ইরাণীয়ান গোষ্ঠী ভারতবর্ষের অতি নিকটে অবস্থিত। এই গোষ্ঠীর এলাকা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে বহুদূর গেলে তবে আর্মেনীয়ান বা আনাতোলীয়ান টাইপের এলাকা এবং এশিয়া মাইনর হইতে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিযা য়ুরোপের ইলিরিয়ান-কার্পেথিয়ান পর্বতশ্রেণী, পশ্চিম বলকান ও গ্রীস দিনারিক টাইপের এলাকা। ভারতবর্ষের গোলমুণ্ড টাইপের জাতির সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহা বলা হইতেছে তাহার সমীচীনতা বিচার কবিতে হইলে বিভিন্ন টাইপের এলাকাগুলির কথা মনে রাখিতে হইবে।

সিন্ধু যুগে যে অমোঙ্গলীয় গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর ভারতবর্ষে উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিযাছে ডাঃ হাটন অন্যত্র তাঁহাকে পামীর হইতে আগত এবং নন-আর্মেনয়েড বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, পামীর হইতে আগত এই জাতি সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছিল। তাহারা বেলুচীস্থান হইতে পশ্চিম উপকূল ধরিয়া কুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ইহাদের একটি দল বাংলা দেশে উপস্থিত হয়। বেলুচীস্থান, সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট, দক্ষিণ মারাঠা দেশ, কন্নাদ, কুর্গ, তারপর সম্ভবতঃ তামিল এলাকার মধ্য দিয়া পূর্ব উপকূল ধরিয়া বঙ্গদেশ—এই ভাবে ইহারা অগ্রসর হইয়াছিল বলা হইয়াছে। হাটন বলেন, এই জাতির মধ্যে যাহারা উত্তর ভারতে রহিয়া গিয়াছিল, বৈদিক আর্য জাতির আগমনের ফলে তাহারা গঙ্গার উপত্যকা ধরিয়া পূর্ব দিকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। হাটন এই পামীরী জাতিকে পিশাচ বা দরদ ভাষাভাষী বলিয়াছেন।

তামিল এলাকা, কানাড়ী এলাকা, মধ্য ভারত অথবা গাঙ্গেয় উপত্যকা —যে পথেই এই জাতি বঙ্গদেশে আসিয়া থাকুক, দেখা যাইতেছে যে, পণ্ডিত-গণের মতে পশ্চিমে বেলুচীস্থান হইতে কুর্গ পর্যন্ত এবং পূর্বে বঙ্গদেশ পর্যন্ত যে গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্ত দেখা যায়, সেই টাইপ এক এবং সেই টাইপ পামীরী বা ইরাণো-পামীরী টাইপ।

পূর্বভারতের গোলমুণ্ড মোঙ্গলয়েড ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড সিথিয়ান,

বিজলেব এই মত খণ্ডন করিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ প্রথম এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম ভাবতেব গোলমুণ্ড টাইপ এক এবং এই জাতি আসিযাছে ভারতবর্ষের উত্তবে নিকটবর্তী পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড জাতির অঞ্চল হইতে। এই মত এখন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিসমাজে গৃহীত হইয়াছে।

সীমান্ত অঞ্চলগুলির মোঙ্গলয়েড গোলমুণ্ড টাইপের জাতিগুলিকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের নন্-মোঙ্গলয়েড গোলমুণ্ড জাতিগুলিকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার বিভিন্ন রচনায় প্রকাশিত বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্যের অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় ডাঃ গুহ তাহাই মনে করেন ; তিনি শুধু গোষ্ঠীর নাম আলপাইন বা পামীরী না দিয়া দিনারিক ও আর্মেনয়েড দিয়াছেন। নাম দিবার ক্ষেত্রে ডাঃ হাটনের মতের পরিবর্তনও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীগুলির সংমিশ্রণ হইযাছে। পূর্বে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম, পশ্চিমে বেলুচীস্থান হইতে কন্নাদ, তামিল দেশের কতকগুলি অংশে, অন্ধ্রদেশে কিছু পরিমাণে এই গোল-মুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে দেখা যায়। পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর ভাগেও এই গোষ্ঠীর সহিত লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়।

নর্ডিক গোষ্ঠী

ডাঃ গুহের মতে ভারতবর্ষে শেষ আগন্তুক গোষ্ঠী (the last great race movement) বৈদিক আক্রমণকারী দল (Vedic invaders)। এই আক্রমনকারী গোষ্ঠীর উৎপত্তি ক্ষেত্র দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সাইবেরিয়ার প্রান্তরভূমি (Eurasiatic steppelands)। সম্ভবত:খ্রী: পূঃ ২য় সহস্রকে ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তক্ষশীলার ধর্মরাজিক বিহারে যে সকল দেহাংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রমাণ হয় ইহারা লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী হইতে পৃথক টাইপের। ইহারা ইন্দো-এরিয়ান ভাষাভাষী।

ডাঃ গুহের মতে বর্তমানকালে এই গোষ্ঠীর প্রাধান্য লক্ষিত হয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠানদিগের মধ্যে, হিন্দুকুশ অঞ্চলের উপজাতির মধ্যে। দিনারিক ও ওরিয়েন্টাল সংমিশ্রণের পরিচয়ও পাওয়া যায় ইহাদের মধ্যে।

পাঞ্জাবে ও রাজপুতানায় এবং অন্যত্র সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে মেডিটারে-নীয়ান সংমিশ্রণসহ এই জাতিকে দেখা যায়।

তাঁহার অন্য রচনায় ডাঃ গুহ এই লম্বামুণ্ড বৈদিক আক্রমণকারীদিগকে প্রোটো-নর্ডিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রিজলে ইহাদিগকে ইন্দো-এরিয়ান, হেডন ইন্দো-আফগান নাম দিয়াছেন।

যে নামই দেওয়া হউক এই লম্বামুণ্ড, শেষ আগন্তুক জাতি বৈদিক সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ইহারা আর্য এ সম্বন্ধে সকলে মোটামুটি একমত। ইহার পর য়ুরোপীয় আর্যমতবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে আলোচনা করা হইতেছে সেই প্রসঙ্গে এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন নামকরণ এবং গোষ্ঠীর লক্ষণের কথা আবার উঠিবে।

আর্য জাতি

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে কাহারা আর্যজাতি সে সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ আপনাদের একটা মত প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরে কয়েকজন আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী এ প্রশ্নের নূতন একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা কোন প্রদেশের লোক কতখানি আর্য সে সম্বন্ধে নিজেদের রুচিমত পোষণ করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, যাহারা আর্যভাষা বা সংস্কৃত-গোষ্ঠীর ভাষা বলে, বৈদিক সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থা অনুসরণ করে, তাহারা আর্য। এই বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি-বাহক উত্তর ভারতের হিন্দুজাতি আর্য। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টির বাহক ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থার নিষ্ঠাবান অনুসরণকারী হিন্দুদের আর্যত্ব সম্বন্ধে একটা দ্বিধার ভাব রহিয়াছে। উত্তর ভারতের একাংশের অধিবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, তাঁহারাই ভারতবর্ষের আদি ও খাঁটি আর্য জাতি, আর সকলে মিশ্র জাতি।

প্রাচীন দলের য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই মত প্রচার করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টির বাহক ও সংস্কৃত-গোষ্ঠীর ভাষাভাষী উত্তর ভারতের হিন্দু জাতিগুলি সকলেই আর্য-গোষ্ঠীভুক্ত নহে। তাঁহাদের মতে মনুবর্ণিত আর্যাবর্তের

অধিবাসীরাও সকলে আর্য নহে। মনুর বর্ণিত মধ্যদেশকে কিছু প্রসারিত করিয়া পাঞ্জাব, রাজপুতনা, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর বিহার লইয়া গঠিত অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে তাঁহারা আর্য বলেন। তাঁহাদের মতে এই সকল অঞ্চলের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি আর্য। আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা এই মত গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের একদলের মতে আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে লম্বা ও গোলমুণ্ড জাতি ছিল, যদিও লম্বামুণ্ড জাতিগুলিকেই তাঁহারা প্রাধান্য দিতে ইচ্ছুক। এই দলের মতে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা গোলমুণ্ড আর্য এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষাভাষী কয়েকটি জাতির মধ্যে আর্য সংমিশ্রণ বর্তমান। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই দলের অভিমত সমগ্রভাবে প্রাচীন য়ুরোপীয় মতবাদের বিরোধী নহে, য়ুরোপীয় মতবাদের কতক অংশ স্বীকার করিয়া লইয়া আপোষ করা হইয়াছে। আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের দ্বিতীয় দল পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী সম্বন্ধে প্রথম দলের মত গ্রহণ করেন। এই দলের অভিমতের মধ্যে নূতনত্ব এই যে, আর্যজাতির টাইপ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় মতবাদের প্রভাব কাটাইতে না পারিয়া ইঁহারা আর্যজাতিকে এক রকম উড়াইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে আর্য কালচার আছে কিন্তু আর্যজাতিকে ভারতবর্ষের কোথাও পাওয়া যায় না। উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর অধিবাসী, অর্থাৎ মনুর ব্রহ্মর্ষি দেশ, আর্যাবর্ত ও মধ্যপ্রদেশের অধিবাসীরা আর্য নহে, তাহারা মেডিটারেনীয়ান সংমিশ্রণযুক্ত প্রোটোনর্ডিক জাতি।

এখানে এই মত প্রকাশ করা হইতেছে যে, বৈদিক যুগ হইতে আর্যপদের জাতিবাচক অপেক্ষা কৃষ্টিবাচক সংজ্ঞার প্রাধান্য দেখা যায়। জাতিবাচক অর্থে যাঁহাদের সম্বন্ধে আর্য পদটি প্রয়োগ করা হইয়াছে তাঁহারা মিশ্র গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন, সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের যুগে বা তাহার আগে এই সংমিশ্রণ হইয়াছিল। এই অনুমানের কয়েকটি কারণ আছে। একটি কারণ এই যে, যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ আর্য বলিতে ইচ্ছুক, সিন্ধু সভ্যতার যুগে তাঁহাদিগকে সিন্ধু উপত্যকায় দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি কারণ ঋগ্বেদ, আবেস্তা যাঁহাদের রচিত তাঁহারা এক গোষ্ঠীভুক্ত ইহাই অনেকের মত। এই গোষ্ঠী যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠী এবং এই গোলমুণ্ড গোষ্ঠী যে এই অঞ্চলের

আদি অধিবাসী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অর্থ আর্যজাতি বাহির হইতে আসে নাই।)

আর্য জাতি সম্পর্কে সমগ্র প্রশ্নটির সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

সকলের পরিচিত পুরাতন য়ুরোপীয় মতবাদ অনুসারে খৃঃ পূঃ ২৫০০—২০০০ বৎসরের মধ্যে আর্য জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিযাছিল। তাহারা দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধে ভারতের আদিবাসীদিগকে (কেহ বলেন দ্রাবিডিয়ান জাতি কেহ বলেন প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড, কেহ বলেন নিষাদ জাতি) পরাজিত ও পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিয়া সেখানে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই ভারতবর্ষ আক্রমণকারী আর্য জাতি প্রাচীন ইরাণী জাতীর একটি শাখা। রাজনৈতিক ও ধর্ম সংক্রান্ত বিবাদের ফলে যে দল ভারতবর্ষে চলিয়া আসে তাহারাই ভারতীয় বা বৈদিক আর্য জাতি। ইরাণে দুই দলের লোক এক সঙ্গে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ার আর্যগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি হইতে আসিয়া।

এই আদিবাসভূমি হইতে আর্যগোষ্ঠীর কয়েকদল শাখা বিভিন্ন সময়ে ডন ও ভলগা নদীর উপত্যকা ধরিয়া উত্তর ও মধ্য য়ুরোপে প্রস্থান করিয়াছিল, ইরাণী ও ভারতীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষেরা আদি বাসভূমি ত্যাগ করিবার অনেক আগে।

পণ্ডিতগণের মতে এই আর্যজাতি শ্বেতকায়, উচ্চনাসা, নীল বা বাদামি চক্ষু ও বাদামি কেশ লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর লোক। ভারতবর্ষে এই আর্যজাতির যে শাখা আসিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাহারা যাযাবর, পশুপালক জাতি ছিল। ভারতবর্ষে আসিবার পরে অনার্য জাতিদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের গাত্র, চক্ষু ও কেশের বর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, উচ্চ নাসা ও লম্বা মুণ্ডের পরিবর্তন হয় নাই।

ভারতবর্ষের এই লম্বামুণ্ড আর্য জাতির অনেক রকম নামকরণ হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহাদিগকে বৈদিক আর্য নাম দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক আর্য নাম দিবার কারণ ইহারাই ঋগ্বেদের রচয়িতা এই বিশ্বাস। কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহারা ঋগ্বেদের রচয়িতা ত বটেই, ঋগ্বেদের বহু সূক্ত ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বেই তাহারা রচনা করিয়াছিল। স্যর হারবার্ট রিজলে ইহাদের নাম দিয়াছেন ইন্দো-এরিয়ান বা ভারতীয়

আর্য। ইরাণী আর্য হইতে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য এই নামকরণ হইয়াছে। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানায় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর হিন্দু জাতিগুলিকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। রিজলের পরের নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ ইন্দো-এরিয়ান নামের পরিবর্তে ইন্দো-আফগান নাম ব্যবহার করিয়াছেন। কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও রাজপুতানার অধিবাসীরা ইন্দো-আফগান গোষ্ঠীর। গাঙ্গের উপত্যকার উচ্চ-বর্ণের লোক এই টাইপের। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে ইন্দো-আফগান টাইপের সঙ্গে য়ুরো-এশিয়াটিক বা পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে।

ইন্দো-আফগান নাম যাঁহারা প্রচলিত করিয়াছেন তাঁহারা আর্য জাতি কথাটি ব্যবহার করিতে বিশেষ ইচ্ছুক নহেন। আর একটি নূতন নাম কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন, প্রোটো-নর্ডিক। প্রোটো-নর্ডিক কথার অর্থ যে জাতি হইতে য়ুরোপের নর্ডিক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। নর্ডিক টাইপ মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের (mesocephalic), প্রোটো-নর্ডিক টাইপ লম্বা মুণ্ডের। ইহারা Steppefolk অর্থাৎ উরল পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমের বিস্তীর্ণ খিরগিজ প্রান্তর ভূমি ইহাদের আদি বাসভূমি ছিল। ইহারা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করিত।

প্রোটো-নর্ডিক কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে য়ুরোপীয় আর্য জাতি হইতে, এশিয়ার আর্য জাতিকে পৃথক দেখাইবার অভিপ্রায় হইতে।

রিজলের ইন্দো-এরিয়ান নামের পরিবর্তে ইন্দো-আফগান পদ যাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা ইন্দো-আফগান টাইপকে প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীয় বলে কিনা এই প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব দেন নাই। ডাঃ হেডন এইমাত্র বলিয়াছেন যে, ইন্দো-আফগান জাতির আদি বাসভূমি সম্ভবতঃ প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীর বাসভূমির নিকটে ছিল। ("The original home of the Indo-Afghan stock presumably was close to whence the Proto-Nordics emerged.") ডাঃ হেডন কি অভিপ্রায়ে এই অস্পষ্টতার আশ্রয় লইয়াছেন তাহা বলা কঠিন। অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্য পদটির ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তির বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইন্দো-আফগান গোষ্ঠীকে তিনি পুরাপুরি প্রোটো-নর্ডিক বলিতে চাহেন না, এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক থাকা সম্ভব এই পর্যন্ত বলিতে চাহেন।

ডাঃ হেডনের প্রচারিত প্রোটো-নর্ডিক থিওরী ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রয়োগ করিয়াছেন ডাঃ গুহ। তাঁহার মতে বৈদিক আর্য আক্রমণকারিগণ ছিল Northern Steppefolk অর্থাৎ ডাঃ হেডেনের প্রোটো-নর্ডিক টাইপের। তিনি বলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান, সোয়াত, পাঁজকোরা, কুনার ও চিত্রল উপত্যকার উপজাতিগুলি, হিন্দুকুশের দক্ষিণে কাফির জাতি, পাঞ্জাব ও রাজপুতানার অধিবাসী, উত্তর ভারতের উচ্চ বর্ণ-গুলির মধ্যে এবং কিছু পরিমাণে পশ্চিম ভারতে ও পূর্ব ভারতের বাংলা দেশেও এই প্রোটো-নর্ডিক বা আর্য বা বৈদিক আর্য জাতির সংমিশ্রণ দেখা যায়।

পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, ডাঃ গুহের মতে পাঞ্জাব ও রাজপুতানার এবং সিন্ধু ও পশ্চিম যুক্তপ্রদেশে লম্বামুণ্ড "প্রাচ্য" টাইপের প্রাধান্য বর্তমান এবং পাঠানদিগের মধ্যেও এই "প্রাচ্য" টাইপের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

স্যর হারবার্ট রিজলে যাহাকে ইন্দো-এরিয়ান, ডাঃ হেডন ও অন্যান্য নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী যাহাকে ইন্দো-আফগান বলিয়াছেন ডাঃ গুহ ফিশার ও আইকষ্টেডের অনুসরণ করিয়া তাহাকে "প্রাচ্য" (Mediterranean Stock, Oriental type) টাইপ বলিতেছেন। প্রোটো-নর্ডিক বা আর্য সংমিশ্রণ উত্তর ভারতের এই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর মধ্যে সামান্য পরিমাণে রহিয়াছে, হিন্দুকুশের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতির মধ্যে এই আর্য বা প্রোটো-নর্ডিক টাইপের প্রাধান্য রহিয়াছে, ইহাই ডাঃ গুহের বক্তব্য।

আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের একটি মত এই যে, যাহাদিগকে আর্য জাতি বলা হয় তাহাদের মধ্যে লম্বামুণ্ড ও গোলমুণ্ড উভয় গোষ্ঠীর জাতি ছিল। এই মত প্রচার করিয়াছিলেন রমাপ্রসাদ চন্দ।

রমাপ্রসাদ চন্দের মতে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী বৈদিক আর্য ও গোলমুণ্ড গোষ্ঠী অবৈদিক আর্য। বৈদিক আর্যকে লম্বামুণ্ড টাইপের বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে প্রচলিত য়ুরোপীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের প্রচারিত মতানুসারে। কিন্তু আর্য জাতি সম্বন্ধে সমস্যা রমাপ্রসাদ চন্দের প্রচারিত মতের দ্বারা মীমাংসা হয় না।

রমাপ্রসাদ চন্দের বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার মত এইরূপ দাঁড়ায়: লম্বামুণ্ড বৈদিক আর্য জাতি দক্ষিণ পূর্ব রুশিয়া বা খিরগিজ অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। ইহারা শ্বেতকায়, নীলচক্ষু, বাদামী কেশ আর্য। ইহারাই

ঋগ্বেদের ঋষিকুলের পূর্বপুরুষ। ইহারা প্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। গোলমুণ্ড আর্যগোষ্ঠী তাকলা-মাকান মরুভূমি অঞ্চল বা তারিম অববাহিকা হইতে আসিয়াছিল পরবর্তী কালে।

কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শন সমূহ হইতে কর্ণেল সেওয়েল ও ডাঃ গুহ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই গোলমুণ্ড জাতি বৈদিক যুগের পূর্বে সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল। এই জাতি ইরাণো-পামীর গোষ্ঠীভুক্ত এবং এই গোষ্ঠীর জাতিকে এখনও পামীর, আফগানিস্থান, পূর্ব ইরাণ ও অন্যান্য অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

সিন্ধুযুগে এই গোলমুণ্ড জাতির উপস্থিতির পরিচয় পাইবার পরে রমাপ্রসাদ চন্দের মতের একাংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, যদিও এই জাতির ভারতবর্ষে আসিবার সময় নির্দেশে তাঁহার ভ্রান্তি দেখা যায়। কিন্তু শ্বেতকায়, লম্বামুণ্ড আর্য জাতির প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে উপস্থিতির কোন প্রমাণ রমাপ্রসাদ চন্দ বা অন্য কেহ দেন নাই। প্রকৃত অবস্থা এই যে, সকল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী একবাক্যে কেবল বলিয়া আসিয়াছেন যে, আর্য জাতি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর। রিজলে উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাঠ, রাজপুত প্রভৃতিকে লম্বামুণ্ড আর্য জাতি বলিয়া মত প্রকাশ করিবার সময় কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন যে, traditionally আর্য জাতি লম্বামুণ্ড টাইপের বলিয়া বিশ্বাস প্রচলিত আছে, এই জন্য তিনি ইহাদিগকে ইন্দো-এরিয়ান নাম দিয়াছেন। রিজলে এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে এই বিশ্বাস ভাষাবিজ্ঞানের যুক্তির (Philological arguments) উপর প্রতিষ্ঠিত, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের কোন প্রমাণ হাতে নাই। এই লম্বামুণ্ড আর্য বলিয়া বর্ণিত গোষ্ঠীকে ইন্দো-আফগান এবং মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর প্রাচ্য শাখার সম্পর্কিত বলিয়া কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন, দেখা গিয়াছে।

উত্তর ভারতের সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, রাজপুতানা ও যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর অধিবাসীরা ইন্দো-আফগান বা মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর, এই কথা বলিবার পরে ভারতবর্ষে লম্বামুণ্ড আর্য জাতির অস্তিত্ব বংসামান্ত "সংমিশ্রণে" পর্যবসিত হয়। দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের বাহিরে উত্তর পূর্বে চীন এবং উত্তর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এবং দক্ষিণ পূর্ব রুশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের কোথাও এই লম্বামুণ্ড আর্য জাতির

অস্তিত্ব বা সংমিশ্রণের পরিচয় নাই। কিন্তু পণ্ডিতগণ এক লম্বামুণ্ড, শ্বেতকায় আর্য জাতিকে ইরাণে আবেস্তিক কৃষ্টি ও ভারতবর্ষে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির স্রষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আর্য পদের উৎপত্তির বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করিলে যে সিদ্ধান্তে আসিতে হয় এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

আর্য পদ আসিয়াছে আইরিয়ানা হইতে। প্রাচীন আইরিয়ানার অধিবাসিগণ আপনাদিগকে আইরিও বা আরিয় বলিয়া বর্ণনা করিত। এই আইরিয়ানা গঠিত ছিল দক্ষিণে সিন্ধু উপত্যকা বা পাঞ্জাব, উত্তরে অকসাস উপত্যকা এবং পশ্চিমে ইরাণের কিয়দংশ লইয়া। ইহার পূর্ব সীমানা ছিল পামীর। এই আইরিয়ানা হইতে পারস্যের ইরাণ নাম (আইরিয়ানা, আইরান ইরুণ, ইরাণ) আসিয়াছে। সুতরাং আর্য আইরিয়ানা নামক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের অধিবাসীর নাম। এই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে ভারতবর্ষের একটি অংশ অন্তর্ভূত। দক্ষিণ পূর্ব রুশিয়া বা উত্তর পশ্চিম খিরগিজ প্রান্তর হইতে আর্য জাতির দেশ এই আইরিযানা বহু দূরে অবস্থিত।

দেখা যাইতেছে যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে আর্য জাতি কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের কোন কথা উঠে না, কারণ, আর্য জাতি ভারতবর্ষের অধিবাসী। ভারতবর্ষের উত্তরে আফগানিস্তান প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত ছিল, ইসলামের অগ্রগতির ফলে আফগানিস্তান প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়।

আইরিয়ানার অধিবাসী এই আর্য জাতির নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের হিসাবে কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া সম্ভব দেখা যাউক।

রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন বৈদিক আর্যদিগের মত আবেস্তিক বা ইরাণী আর্য জাতি লম্বামুণ্ড ছিল। ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ, দেবতাদিগের নাম, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে ইরাণী আর্য ও বৈদিক আর্যদিগের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় যে, উভয় জাতি যে এক গোষ্ঠীভুক্ত ছিল এ বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহ উঠে নাই। বৈদিক আর্যগণ যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর ছিল তাহার প্রমাণ হিসাবে বলা হয় যে, উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগণ বৈদিক আর্যদিগের বংশধর। রিজলে, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আরও অনেকে এই যুক্তিই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ইরাণী বা আবেস্তিক আর্যদিগের ক্ষেত্রে এই যুক্তি ব্যবহার করিলে তাহার ফল অন্ত

রকম দেখা যায় এবং তদনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বৈদিক আর্য ও ইরাণী আর্য এই গোষ্ঠীভুক্ত জাতি নহে। পণ্ডিতগণের মতে প্রাচীন ইরাণী জাতির বংশধর তাজিক জাতি। তাজিক জাতি গোলমুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত। পুস্তভাষাভাষী লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর আফগান ও পাঠান-দিগকে কেহ প্রাচীন ইরাণী জাতির বংশধর বলেন না। ইরাণ, আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়া, পামীরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত এই তিনটি মালভূমির প্রাচীন অধিবাসী গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর। বর্তমান আফগানিস্তানে গোলমুণ্ড ইরাণী গোষ্ঠীর উপজাতির সংখ্যা বড় কম নহে। স্যর অরেল ষ্টাইনের সংগৃহীত আফগান পামীর, রুশিয়ান পামীর ও চীনা পামীর এবং তাকলামাকান অঞ্চলের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক তথ্য, মি জয়েস কর্তৃক *Royal Anthropological Institute*-এর পত্রিকায় প্রকাশিত এই সকল তথ্যের বিশ্লেষণ, প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী উজফালভীর সংগৃহীত তথ্য প্রভৃতি হইতে জানা যায় হিন্দুকুশের ডাঃ গুহ কর্তৃক প্রোটো-নর্ডিক বলিয়া বর্ণিত উপজাতিগুলির মধ্যে, পামীরের উপজাতিগুলির মধ্যে এবং তাকলামাকান বা তারিম অববাহিকার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে পামীরী-ইরাণের টাইপের গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাকলামাকানের এই প্রাচীন অধিবাসীরা স্যর অরেল ষ্টাইনের মতে আর্য গোষ্ঠীর। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে ভারতের গোলমুণ্ড "অবৈদিক" আর্য জাতির পূর্বপুরুষগণ এই অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের অনেকের মতে প্রাচীন ইরাণী জাতি বা আবেস্তিক আর্য যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতি নানা সূত্রে এই তথ্য সমর্থিত হইয়াছে।

আবেস্তিক বা ইরাণী আর্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতি হইলেও তাহাদের নিকট আত্মীয় বৈদিক আর্যগণকে কেন লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে তাহার সন্তোষজনক ও যথেষ্ট প্রমাণ বা কৈফিয়ৎ কেহ দেন নাই। আর্য নাম আইরিয়ানার অধিবাসীদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত, এই তথ্য আবেস্তা হইতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের যে সকল সূক্তকার আপনাদিগকে আর্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারা আইরিয়ানার অধিবাসী হিসাবে এই পরিচয় দিয়াছেন। আর্য অর্থে যাহারা কৃষিকার্য করিত, য়ুরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানীদিগের এই ব্যাখ্যা স্বকপোলকল্পিত। বৈদিক সমাজের যে চিত্র

ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায় তাহা কৃষিজীবী বা পশুপালক সমাজের চিত্র নহে, সংগ্রামশীল রাজন্যকুল ও যজ্ঞপরায়ণ ঋষিকুলের, অর্থাৎ সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর চিত্র। আবেস্তার সমাজ-ব্যবস্থাও কৃষিজীবী সমাজের নহে।

বৈদিক যুগের যে কালনির্ণয় পণ্ডিতগণ করিয়াছেন, তাহা সঠিক হউক আর না হউক, তাহার বহু পূর্বে গোলমুণ্ড জাতির ভারতবর্ষে উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আলপাইন বা ইরাণো-পামীরী টাইপের গোলমুণ্ড জাতির পরিচয় তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মতে এই জাতি ইরাণ, পামীর বা তারিম অববাহিকা হইতে আসিয়াছিল। এই অঞ্চলগুলির যেখান হইতেই তাহারা আসিয়া থাকুক, ইহারা ভারতবর্ষের অমোঙ্গলীয় গোলমুণ্ড আর্য জাতির (যাহাদিগকে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দেখা যায়) পূর্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাদিগকে আর্য ভাষাভাষী বলা হইয়াছে। সুতরাং তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার এই গোলমুণ্ড জাতিকে আইরিয়ানার আর্য জাতির প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সিন্ধু উপত্যকা আইরিয়ানার অন্তর্ভূত ছিল।

আর্য জাতি সম্বন্ধে বিতর্কের অবস্থা সংক্ষেপে এইরূপ: একটি গোলমুণ্ড ও একটি লম্বামুণ্ড আর্য জাতির কথা বলা হইয়াছে। প্রথমটিকে অবৈদিক ও দ্বিতীয়টিকে বৈদিক আর্য জাতি বলা হইয়াছে। অবৈদিক আর্য বলিয়া অভিহিত গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে। বৈদিক আর্য বলিয়া অভিহিত লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় প্রধানতঃ সিন্ধু উপত্যকা ও গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরাংশে। দ্বিতীয়টিকে বৈদিক আর্য জাতি বলিবার একমাত্র হেতু উত্তর ভারতেব লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে বৈদিক আর্য জাতির বংশধর বলিয়া মনে করা হয়, উপরে এই কথা বলা হইয়াছে। এই মতের ভিত্তি য়ুরোপীয় আর্যবাদ। কিন্তু দেখা যায় যে, য়ুরোপীয় আর্যবাদ অনুসারে দক্ষিণ পূর্ব রুশিয়া বা উত্তর পশ্চিম খিরগিজ প্রান্তর হইতে আর্য জাতির ইরাণে ও ভারতবর্ষে আসিবার থিওরীর সঙ্গে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের প্রমাণের কোন সম্পর্ক নাই।

প্রমাণের অভাবেও যাঁহারা বৈদিক আর্য বা আর্যজাতিকে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর

বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন তাঁহারা একটি কল্পিত প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীর কথা তুলিয়াছেন। প্রোটো-নর্ডিক থিওরী মানিয়া লইয়া ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার কথা বলা হইয়াছে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ও উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে ইন্দো-আফগান, ইন্দো-এরিয়ান, ওরিয়েন্টাল বা প্রোটো-নর্ডিক, মেডিটারেনীয়ান, যে নামই দেওয়া হউক না কেন, বৈদিক আর্য জাতি যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত শুধু এই থিওরীই অপ্রমাণিত হয় না, বৈদিক আর্যজাতি বলিয়া কোন জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার ফলে দেখা যায় যে য়ুরোপীয় আর্যবাদের রচিত বৈদিক আর্য জাতি নামে একটি শ্বেতকায়, বৈদেশিক আর্য জাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রকাণ্ড থিওরীর সৌধ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

ইহার অর্থ বৈদিক আর্য জাতি বলিয়া কোন বিশিষ্ট বা পৃথক আর্যজাতি ছিল না। আর্য জাতির প্রাচীন বাসভূমি আইরিয়ানার দক্ষিণ অংশের অধিবাসীদের হাতে এক সময়ে ঋগ্বেদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, যেমন আইরিয়ানার উত্তর অংশের অধিবাসীদের হাতে আবেস্তা গড়িয়া উঠিয়াছিল পরবর্তীকালে। ঋগ্বেদ ও আবেস্তা রচিত হইবার বহু পূর্বে আর্য ভাষাভাষী বলিয়া অনুমান করা হয় এইরূপ একটি জাতিকে সিন্ধু সভ্যতার যুগে সিন্ধুদেশে ও পাঞ্জাবে দেখা যায়। এই জাতি কোন মতে বেলুচীস্থান, সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট, মারাঠা দেশ, কর্ণাট দেশ, তামিল দেশ, মধ্যভারত, পূর্ব উপকূলের অন্ধ্র ও উড়িষ্যা হইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল; কোন মতে সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা বাহিয়া পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। এই জাতি প্রাচীন আইরিয়ানার অধিবাসী ও আর্য নামের দাবীদার ছিল। সুতরাং বৈদিক যুগ ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতা বিকাশের প্রথম অধ্যায় নহে, আর্য জাতির ভারতবর্ষে উপস্থিতির সমসাময়িক ব্যাপার নহে, অনেক পরের, আর্য পদ যখন জাতিবাচক অর্থ হারাইয়া কৃষ্টি-বাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেই সময়কার ব্যাপার। ঋগ্বেদের আমলে রাজকুল ও ঋষিকুল উভয়েই যে মিশ্রগোষ্ঠী লইয়া গঠিত ছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে।

সিন্ধু সভ্যতার যুগে সিন্ধু উপত্যকায় যে গোলমুণ্ড ইরাণো-পামীরী গোষ্ঠীকে জাতিবাচক অর্থে আর্য বলিয়া মনে করা যায় তাহার উপস্থিতির

প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোহেঞ্জোদারোর একটি এবং হারাপ্পার দুইটি করোটি কর্ণেল সিওয়েল ও ডাঃ গুহ আলপাইন টাইপের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (Marshell, *Mohenjo Daro and Indus Valley Civilisation*)। ঐ গ্রন্থের ২২ অধ্যায়ে প্রোঃ ল্যাংডন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সিন্ধু উপত্যকায় যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৭ শতাব্দীতে আর্য জাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার মত বাতিল হইয়া যায়। বরং বলা যায় যে খ্রীঃ পূঃ দুই সহস্রকের অনেক আগে হইতে, সিন্ধু সভ্যতা বিকাশের যুগে তাহারা এদেশে উপস্থিত ছিল।

প্রোঃ ল্যাংডনের মতে সিন্ধু লিপি হইতে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিবে, উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের তথাকথিত প্রোটো-নর্ডিক সম্পর্কিত গোষ্ঠীগুলি কি আর্য জাতি নহে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

ইন্দো-এরিয়ান বলিয়া বর্ণিত লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি জাতি সিথিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত এই মতবাদ এক কালে প্রবল ছিল। সিথিয়ান বলিতে প্রধানতঃ পশ্চিম ও পূর্ব তুর্কীস্থানের মরু অঞ্চলের আর্যেতর জাতি বুঝাইত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের শক, হূণ, কুশান বা য়িয়ুচী, পারদ, পহ্লব, তুখার বা তুষার প্রভৃতি সকলেই সিথিয়ান। যবন বা গ্রীক ও সিথিয়ান নামে পরিচিত জাতিগুলি সকলেই ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য পরবর্তী গবেষণার ফলে যাহাই দাঁড়াক বর্তমানে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, আর্য জাতি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর ছিল, "বৈদিক" আর্য জাতি বলিয়া কোন পৃথক জাতি ছিল এবং আর্য জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, এই সকল থিওরীর কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই সকল থিওরী অনুমানের উপর দাঁড়াইয়া আছে।

এখানে এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে আইরিয়ানার প্রাচীন আর্য জাতি ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী, তাহারা বাহির হইতে আসে নাই। আইরিয়ানা হইতে একদল পশ্চিমে ইরাণের মালভূমিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অন্য দল ভারতবর্ষের অভ্যন্তর ভাগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৈদিক সাহিত্য এই দলের পুরোহিত সম্প্রদায় ঋষিকুলের হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

॥ ৩ ॥

ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ ও সীমান্ত অঞ্চল

ভারতবর্ষের অধিবাসীগণের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে এই তথ্য পাওয়া যায় যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় জাতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহার গঠন প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমাপ্ত হইয়াছিল। বৈদিক যুগ হইতে, ইহার সময় নির্দেশ যাহাই করা হউক না কেন, খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত, অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ও শিশুনাগ বংশের অধীনে পূর্ব ভারতে মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের ঠিক আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের বাহিরের কোন দেশ বা জাতির সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগের সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইরাণের সহিত সিন্ধু নদের পশ্চিম অঞ্চলের রাজনৈতিক সংযোগ ঘটে। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীকে সীমা নির্দেশক বলিয়া গ্রহণ করিলে দেখা যায় ভারতবর্ষীয় জাতীর গঠন, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন কৃষ্টির বিকাশ এবং সমাজ গঠন-ব্যবস্থা তাহার অনেক আগে শেষ হইয়াছিল।

এই সময় হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের বাহির হইতে আগত বিভিন্ন জাতির সঙ্গে যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়। পরে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

এই আলোচনা করিবার আগে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশগুলির কথা কিছু বলা হইতেছে। প্রথমে একটু মুখবন্ধ দেওয়া প্রয়োজন।

এদেশে ব্রিটিশ জাতি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত হইবার পরে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে য়ুরোপীয় পণ্ডিত সমাজের পরিচয় লাভের সুযোগ হইল। এই পরিচয় যত গভীর হইতে লাগিল তাঁহাদের মুখে একটা কথা শোনা যাইতে লাগিল। উত্তরে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত-প্রাচীর ও বাকী তিন দিকে ভারত মহাসাগরের দুস্তর জলরাশির রক্ষা-কবচে সুরক্ষিত ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎ ও প্রতিবেশী দেশগুলির

সঙ্গে সম্পর্কহীন থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে এক সভ্যতার ও সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ মৌলিক জিনিস। তাঁহাদের মুখে এই কথা শুনিয়া এ দেশের সে যুগের শিক্ষিত সমাজ বিশ্বাস করিলেন যে ভারতবর্ষ এশিয়াখণ্ডের একটি হটহাউজ, এখানে বাহিরের শৈত্য তাপ কিছুই প্রবেশ করে নাই।

এই ধারণা ভিত্তিহীন। প্রাগৈতিহাসিক আমলের জাতি সংমিশ্রণের কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিক যুগে দেখা যায় ইরাণী, গ্রীক, শক, কুশান বা যিয়ুচী বা তুখাব, হুণ, মোঙ্গল, তুর্ক, আরব প্রভৃতি যে সকল জাতি এদেশে আসিয়াছিল তাহাদের তালিকা ছোট নয়। সুতরাং ভারতবর্ষের সভ্যতার যদি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তাহাব কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, ভারতবর্ষ পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ছিল ইহা তাহার কারণ নহে।

অতি প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির কৃষ্টিগত, জাতিগত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংযোগ ছিল। ভারতবর্ষের অধিবাসীব এই পরিচয় কিছু দেওয়া হইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ ইরাণ, আফগানিস্তান, পামীর ও পূর্ব-তুর্কীস্তান, তিব্বত, নেপাল, সিকিম, ভুটান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের কথাও এই প্রসঙ্গে বলা হইবে। চীন পূর্বে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী বাষ্ট্র ছিল না, তিব্বত অধিকার করিবার পরে প্রতিবেশী বাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীনের কথাও কিছু বলা হইবে।

ইরাণ

আরিয়ানা বা আইরিয়ানা হইতে ইরাণ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। দেশের পারস্য নাম আকামণি সম্রাটগণের জন্মস্থান ফার্শ হইতে আসিয়াছে। কুর্দিস্তান হইতে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত মালভূমির নাম ইরাণ। হিন্দুকুশ হইতে পশ্চিমে আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রন্থি পর্যন্ত বিস্তৃত এলবোরজ পর্বতশ্রেণী মালভূমির উত্তর সীমানা এবং প্রাচীন ইরাণীদের চোখে দেবতাত্মা হিমালয়ের তুল্য পবিত্র ছিল! ঐতিহাসিকগণের মতে "The inhabitants of this upland together with certain tribes of the same race shared with their near knismen in India the name of Aryans." এই নিকটবর্তী অঞ্চলের মধ্যে পড়িতেছে আফগানিস্তান ও

মীডিয়া। হেরোডোটসের মতে মীডজাতির প্রাচীন নাম ছিল আরিওয়াই (Arioi)।

প্রাচীন ইরাণের অধিবাসী ও প্রাচীন ভারতবর্ষের অধিবাসী যাহারা আর্য নামে আপনাদের পরিচয় দিত শুধু এই এক গোষ্ঠীয়তায় নহে, ধর্মে, সংস্কৃতিতে ভাষায় তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইরাণের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তায় আর্যদের দেশের (Aryano danhavo) কথা বলা

আর্যজাতির প্রাচীন বাসভূমি

হইয়াছে এবং প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির যে সকল বিবরণ দেওয়া হইয়াছে বৈদিক দেবতা ও ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনার সঙ্গে তাহার তুলনা করিলে এই সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। জেন্দাবেস্তার গাথার ভাষার সঙ্গে ঋগ্বেদের ভাষার তুলনা করিলে কিছু সাদৃশ্য অনভিজ্ঞের চোখেও ধরা পড়িবে।

আসিরীয় সাম্রাজ্য ক্ষীণশক্তি হইলে একবাটানার (আধুনিক ইরাক, আদ্রাজেনি, আজারবাইজান ও কুর্দিস্তানের অংশ) মীড সাম্রাজ্য (খ্রীঃ পূঃ ৭১৫) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পারস্য বা ফার্শ প্রদেশ মীড সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভূত ছিল। কিয়াজারেকসাস (খ্রীঃ পূঃ ৬২৫) মীড সম্রাটগণের মধ্যে সবাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লাভ করেন। বাবিলোনীয় লেখনে তাঁহার নাম Huwakshatara, তাঁহার পুত্র আষ্টাইগেসের নাম Ishtuvigu। এই সময়ে জরাথুষ্ট্রের ধর্মমত মীডিয়াতে প্রবল হয় এবং মাজি (Magi) নামে প্রসিদ্ধ এই ধর্মের পুরোহিত সম্প্রদায় প্রতিপত্তি লাভ করে।

ফার্শের আনশানের রাজা কিরুস (Cyrus) শক্তিশালী হইয়া মীডিয়ান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। Spiegel কিরুস (Cyrus—Karush) নামটি ভারতবর্ষের প্রাচীন কুরুগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ কিরুসের ব্যর্থ ভারতবর্ষ আক্রমণের কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন।

কিরুসের মৃত্যুর পরে (খ্রীঃ পূঃ ৫২৯) রাজবংশের সম্পর্কিত এবং এক পরিবারভুক্ত দারয়ুস (Darayavahu) আকামণি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পার্সিপোলিসের লেখনে ভারতবর্ষে অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দারিয়ুস দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। বসফোরাস প্রণালীতে সেতু বাঁধিয়া তিনি পুনঃপুনঃ গ্রীসে অভিযান বাহিনী পাঠাইয়াছিলেন, রুশিয়ার সিথিয়ান জাতির বিরুদ্ধেও অভিযানবাহিনী পাঠাইয়াছিলেন। গ্রীসদেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করিবার চেষ্টায় মারাথনের বিখ্যাত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটে। তৃতীয় দারায়ুস শেষ আকামণি সম্রাট। আলেকজাণ্ডারের বাহিনীর হাতে তাঁর পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে সিন্ধুনদের পূর্বের যে সকল অঞ্চল গ্রীকদের দখলে গিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর আগে সেইগুলি হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে বিরাট সাম্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়। ইরাণে সেলুকিদ (সেলুকাস নিকেটর) রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আফগানিস্তান তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ব্যাকট্রিয়া বাদে আফগানিস্তানের অন্য প্রদেশগুলি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ফলে উত্তরে হিন্দুকুশ ও পশ্চিমে হিরাট ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমানা নির্দিষ্ট হয়। সেলুকাসের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্তা ডিয়োডোটস স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া যে গ্রীক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন প্রায়

একশত ত্রিশ বৎসর তাহা স্থায়ী হইয়াছিল। শক আক্রমণের ফলে এই রাজ্য ধ্বংস হয়।

যখন ব্যাকট্রিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল প্রায় সেই সময়ে আবসাকেসের (Arsaces) নেতৃত্বে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল পার্থিয়ায়। এই বিদ্রোহের ফলে ইরাণে যে আবসিকিডান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা প্রায় পাঁচশত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল (খ্রীঃ পূঃ ২৪৮ হইতে খ্রীষ্টীয় ২২৬)। ব্যাকট্রিয়া ও সমগ্র আফগানিস্তান পার্থিয়ান সাম্রাজ্যেব অন্তর্ভূ্ত হইয়াছিল।

ইরাণের তৃতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পার্সিপোলিসেব আনাহিতার মন্দিবেব প্রধান পুরোহিত সাসানের পুত্র পাবক এবং পৌত্র আর্দেশিয়ের দ্বারা (খ্রীঃ ২১২-২৪২)। প্রথম শাপুর (২৪২-২৭২) রোমের সম্রাট ভ্যালেরিনকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। পঞ্চম বাহরামের হস্তে পরাজিত হইয়া রোম সাসানীয় সম্রাটকে করপ্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিল।

সাসানীয় সাম্রাজ্য পূর্বদিকে ব্যাকট্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সাসানীয় সাম্রাজ্যকে প্রথম হইতে রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম চলিয়াছিল। শেষের দিকে সাসানীয় সম্রাটদিগকে ইসলামে দীক্ষিত আরবদের সঙ্গে, হুণ ও মোঙ্গলদের সঙ্গেও সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। রোমের সঙ্গে দুই শত বৎসর সংগ্রাম চালাইবার ফলে দুই পক্ষেরই বিশেষ শক্তিক্ষয় হইয়াছিল এবং আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

প্রায় চারিশত বৎসর পরে আরবদের সঙ্গে কাদিসিয়া (৬৩৭) ও নেহাভেন্দের যুদ্ধে (৬৪২) শেষ সাসানীয় সম্রাটের পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আকামণি, আরসিকিডান ও সাসানীয়, এই তিনটি ইরাণী সাম্রাজ্যকে হাজার বছরের বেশী (খ্রীঃ পূঃ ৫২১—খ্রীষ্টীয় ৬৪২) য়ুরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। আকামণি সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল আলেকজাণ্ডারের হাতে, আরসিকিডান শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল ইরাণ ও পশ্চিম এশিয়া হইতে গ্রীকদের বিতাড়িত করিবার উদ্যম হইতে। রোমান শক্তিকে ঠেকাইবার জন্য

আরসিকিডান সাম্রাজ্যকে ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল। সাসানীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল অ-ইরাণী (পার্থিয়ান) রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার উত্তম হইতে। এই সাম্রাজ্যকেও বারবার রোমের সঙ্গে সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইরাণের শুধু স্বাধীনতা গেল না, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার এবং প্রাচীন জাতির পবিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল।

ইরাণের আর্য জাতিব সঙ্গে ভারতীয় আর্য জাতির সম্পর্কের কথা অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের মতে প্রাচীন ইরাণের অধিবাসীদের মধ্যে গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক ইবাণের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মত মিশ্র জাতি। এই সংমিশ্রণ আসিয়াছে প্রধানতঃ সেমাইট ও তুর্ক-মোঙ্গল গোষ্ঠী হইতে। প্রাচীন ইরাণের গোলমুণ্ড টাইপের জাতির নাম তাজিক ("the old type which is preserved in the Parsi who migrated to India"—হেডন)।

ঐতিহাসিক আমলে ইরাণের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ ঘটিয়াছিল খ্রী: পূ: ষষ্ঠ শতাব্দীতে আকামণি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম দারিয়ুসের সময়ে। সিন্ধু, বেলুচীস্তান ও সিন্ধুনদের পশ্চিমের অঞ্চলগুলি তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল এইরূপ জানা যায়। এই রাজনীতিক সম্পর্ক বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। মৌর্য সম্রাটদের রাজসভার রীতিনীতির উপরে পরবর্তী ইরাণী রাজসভার কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল বলা হইয়াছে। ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজাদের এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইন্দো-পার্থিয়ান রাজাদের আমলে গ্রীক ও ইরাণী ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সংযোগ ঘটিয়াছিল। সাসানীয় আমলে ইরাণে জোরোষ্ট্রীয়ান ধর্ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই ধর্মের উপরে সুমের-বাবিলোনীয় ধর্মের প্রভাব পড়িয়াছিল এবং সেই প্রভাব কিছু পরিমাণে ভারতবর্ষেও প্রবেশ করিয়াছিল ইরাণ হইতে। ইরাণী সূর্য উপাসনা ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল জানা যায়।

কয়েক শতাব্দী আরব দখলে থাকিবার পরে দিগ্বিজয়ী মোঙ্গল খাকান চেঙ্গিজ খাঁ ইরাণ দখল করেন (খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী)। তাঁহার

সাম্রাজ্য ভাগ হইলে কুবলাই খাঁন পাইয়াছিলেন চীন ও হুলাকু পাইয়াছিলেন ইরাণ। ১৪শ শতাব্দীর শেষ দশকে তুর্কগোষ্ঠীর তৈমুর লঙ ইরাণ দখল করেন এবং প্রায় একশত বৎসর ইরাণ তৈমুর বংশীয়দের দখলে ছিল। দিল্লীর তুঘলক বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ তোগলকের রাজত্বকালে তৈমুরের ভারত আক্রমণ, লুণ্ঠন ও হত্যার কাহিনী ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ১৫শ শতাব্দীর শেষ দশকে সুফি মতের প্রবর্তক শেখ সইফুদ্দিন ইজাকের বংশীয় এক প্রধান তৈমুর বংশীয়দের বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া সাফাবি (Safawi) রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ইরাণে শিয়া সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুফী মত ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল।

ইহার পর ইরাণ আফগান দখলে যায়। সুফাই বংশের শেষ শাহকে পরাজিত করিয়া কান্দাহারের খিলজাই গোষ্ঠীর মীর ওয়াজিজ সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি নাদির কুলি সিংহাসন অধিকার করিয়া নাদির শাহ নাম গ্রহণ করেন। মুঘল শাসনের শেষের দিকে নাদির শাহের ভারত আক্রমণ ও ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের কাহিনী (১৭৩৮) ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন ইরাণী জাতিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল কিন্তু গোঁড়া সুন্নিমত ইরাণে প্রবল হয় নাই, ইরাণীরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ইরাণ হইতে শিয়া মত ভারতবর্ষে ইসলামীদের মধ্যে আসিয়াছে। সুফীমতও ইরাণ হইতে আসিয়াছে। দীর্ঘকাল ভারতে মুসলমান শাসনের যুগে পারশী ভাষা, লিপি ও সাহিত্যের প্রভাব এবং রীতিনীতির প্রভাব এদেশে আসিয়াছে।

পারশী সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে খোরাসান রিভাইভ্যালের পরে যখন খিলাফতের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। একজন ঐতিহাসিকের মতে "The few poets who arose under the Suffarids and Tahirids show already the germs of the characteristic tendency of all later Persian literature which aims at amalgamating the enforced spirit of Islam with their own Aryan spirit."

আফগানিস্তান

ভৌগোলিক পরিচয়ঃ দক্ষিণ পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্বে ৭০০ মাইল দীর্ঘ এবং প্রায় ৩৫০ মাইল প্রশস্ত ২,৪৬,০০০ বর্গ মাইল আয়তনের দেশ আফগানিস্তান। উত্তর পূর্বে অঞ্চল সরু হইয়া পামীর এলাকায় পৌছিয়াছে (ওয়াখান)।

ভারতবর্ষের মত আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীয় অধিবাসীরা বাস করে। শকস্তান বা সিস্টানের একাংশ দেশের অন্তর্ভূত, তাহা ছাড়া তুর্কীস্তান, রেজিস্তান, হাজারিস্তান, মালিস্তান, কাফিরিস্তান ইত্যাদি নামে পরিচিত বিভিন্ন অঞ্চল আছে। দেশের অধিবাসীদের মধ্যে আফগানরা অন্যতম গোষ্ঠী।

পামীর পর্বতগ্রন্থি হইতে বাহির হইয়া হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া দেশকে উত্তরে অকসাস অববাহিকা ও দক্ষিণে সিন্ধু অববাহিকায় বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণে বেলুচীস্তান, পূর্বে উপজাতীয় (পাখতুন) অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উত্তরে বোখারা, পশ্চিমে ইরাণ।

উত্তরের অংশে বালখ (প্রাচীন ব্যাকট্রিয়া), বাদাকশান, আফগান তুর্কীস্তান, ও হিরাট উপত্যকা। সিন্ধু অববাহিকায় কাবুল উপত্যকা ও জেলালাবাদ সিন্ধুনদের পশ্চিমভাগের পাখতুন এলাকার সঙ্গে সম্পর্কিত। দক্ষিণ আফগানিস্তানের সঙ্গে বেলুচীস্তানের সম্পর্ক বেশী। দুরানী, খিলজাই প্রভৃতি আফগান গোষ্ঠীর বাস এই অঞ্চলে, কান্দাহার হইতে উত্তরে হিরাট পর্যন্ত এলাকায়।

আফগানিস্তানের তিনটি প্রাচীন নদী অতি প্রাচীনযুগ হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগানিস্তানের আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছে। কাবুল নদী কাবুলের ৪০ মাইল পশ্চিমে উনাই গিরি সংকটের নিকট হইতে বাহির হইয়া কাবুল, জেলালাবাদ, মোমান্দ এলাকা, এটক ও পেশোয়ার পর্যন্ত ৩১৬ মাইল পথ পর্যটন করিয়া সিন্ধুনদে পড়িয়াছে। কাবুল নদী ঋগ্বেদের কুভা। কুরাম নদী আফগানিস্তানের খোস্ত, কুরাম এজেন্সী, কোহাট, বান্নু হইয়া সিন্ধুনদে পড়িয়াছে। ঋগ্বেদে ইহার নাম ক্রমু। গোমাল নদী আফগানিস্তান হইতে

বাহির হইয়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচীস্তানের ঝোব এজেন্সীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুনদে পড়িয়াছে। ঋগ্বেদে ইহাব নাম গোমতী। এই তিনটি ছাড়া সিন্ধুর চাবিটি পশ্চিম শাখা নদীব নাম আছে ঋগ্বেদে, সুসর্তু, রসা, শ্বেতী ও মেহাত্নু। এইগুলির বর্তমান নাম পাওযা যায় না।

ভৌগোলিক অবস্থান হেতু আফগানিস্তান ভারতবর্ষের সমতল অঞ্চলে প্রবেশ করিবার দ্বাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রীক, পার্থিয়ান, শক, য়ুচী, হুণ, মোঙ্গল ও তুর্কীরা এই দ্বারপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। ভৌগোলিক অবস্থান হেতু আফগানিস্তান দুইটি প্রাচীন সভ্যতা, ভারতবর্ষীয় ও ইরাণী সভ্যতার সংযোগক্ষেত্রের কাজ করিয়াছে। দুইটিই আর্য সভ্যতা। পশ্চিম আফগানিস্তানে যেমন ইরাণী প্রভাব প্রবল ছিল, পূর্ব আফগানিস্তানে সেইরূপ ভাবতীয় প্রভাব প্রবল ছিল।

অধিবাসীর পরিচয়ঃ আফগানিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে তাজিকদের সংখ্যা প্রবল। শুধু উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে নহে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহারা ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহারা আপনাদের ফার্শিওযান বলিয়া পরিচয় দেয়। তাজিক গোষ্ঠীব পরিচয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "eastern Iranians regarded as the Aryan race belonging to the type of Homo Alpinus." বিশিষ্ট লক্ষণ "broad head, characterised by eagle nose." আফগান তুর্কীস্তানের ও হিন্দুকুশের গলচাদের প্রাচীন তাজিক গোষ্ঠীর বর্তমান প্রতিনিধি মনে করা হয়। কেহ কেহ বলেন, আফগান সিস্তানের সিগজীরা প্রাচীন শক জাতির বংশধর। দক্ষিণ আফগানিস্তানে, উত্তর পশ্চিমে হিরাট পর্যন্ত ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। খিজিলবাস নামে পরিচিত তুর্কী গোষ্ঠীকে নাদির শাহ আফগানিস্তানে আনিয়াছিলেন। হিরাট প্রদেশের ফার্শি ভাষাভাষী চাহার আইমক উপজাতি আফগান নহে। হাজারিস্তানের হাজরা জাতি মোঙ্গল গোষ্ঠীয়। চেঙ্গিজ খাঁ ইহাদের আনিয়াছিলেন কথিত আছে। কাফিরিস্তানের অধিবাসীরা আফগান বা পাঠান নহে। স্যর জর্জ রবার্টসনের মতে ইহারা পূর্ব আফগানিস্তানের ভারতীয় অধিবাসীদের বংশধর। খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া ইহারা বর্তমান বাসস্থান পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়া যায়। ১৯শ শতাব্দীতে আমীর আবদুর

রহমানের দ্বারা পরাজিত হইয়া ইহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহারা ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকদের বংশধর। লোফি উপজাতির সঙ্গে কাফিরদের সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে। পাঠানদের পূর্ব আফগানিস্তানে দেখা যায়। আফগান গোষ্ঠীর দুরাণীরা কান্দাহার ও কান্দহার হইতে হিরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং খিলজাইরা কান্দাহারের উত্তরের মালভূমি হইতে সুলেমান পর্বতের পশ্চিমের অধিত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করে। ইহারা ছাড়া আফগানিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে আরব, হিন্দু, শিখ, লাঘমনীদের (লাঘমন জেলালাবাদের প্রাচীন নাম) দেখা যায়।

(গোলমুণ্ড) তাজিক গোষ্ঠী ইরাণ, আফগানিস্তান, পামীর, পূর্ব তুর্কীস্তানের প্রাচীন অধিবাসী, উত্তরে বোখারা, সমরকন্দ ও মার্ভে ইহাদের বসতি ছিল। এই পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় সে আলোচনা করা হইয়াছে। আফগান গোষ্ঠীর টাইপ হইতে ইন্দো-আফগান টাইপের (dolichocephalic, leptorrhine, tall to medium stature) নাম হইয়াছে। ডাঃ হেডনের মতে এই টাইপের উৎপত্তিস্থান আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং এই অঞ্চল হইতে এই গোষ্ঠী উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার মতে আফগান, বার্লিট, কাশ্মীরী, কাফির, দরদ, রাজপুত, পাঞ্জাবী, শিখ প্রভৃতি এই টাইপের। এই টাইপ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। আফগান জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক রকমের মত আছে। জাঠ, গুজর, মেড়, শক, য়িহুদী সংমিশ্রণের কথা উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য এই যে, উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দৈহিক লক্ষণের সঙ্গে আফগান গোষ্ঠীর দৈহিক লক্ষণের কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

রাজনৈতিক ইতিহাস : খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী হইতে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস কিছু পরিমাণে জানিতে পারা যায়। আফগানিস্তান ও সিন্ধুনদের পশ্চিমের অঞ্চল আকমণি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল, তারপর সেলুকিড সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে উত্তরের ব্যাকট্রিয়া বাদে আফগানিস্তানের অন্য প্রদেশগুলি সেলুকাসকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল, গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে জানা যায়। উত্তরে হিন্দুকুশ ও পশ্চিমে হিরাট পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হয়।

সম্রাট অশোকের সময়ে এই সীমানা বজায় ছিল , পূর্ব ও দক্ষিণ আফগানিস্তান যে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাঁহার শিলা লেখন হইতে তাহা প্রমাণ হয়। সাম্রাজ্যের এই অংশের শাসনকর্তা (রাজপ্রতিনিধি) রূপে তিনি পেশোয়ারে (পুষ্পপুর) কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন জানা যায়। পরে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজারা প্রায় এক শতাব্দীকাল আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহার পরে দেশের পশ্চিম অংশ আরসিকিডান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূ্ক্ত হয়, পূর্বাংশ শকরা দখল করে। পরবর্তী কালে শক ও পার্থিয়ানদের বিতাড়িত করিয়া য়িয়ুচী বা কুশান গোষ্ঠী আফগানিস্তান অধিকার করিয়াছিল। ভারতে কুশান অধিকার লুপ্ত হইবার অনেক পরে চীনা পরিব্রাজক হুয়েন স্যাং (৭ম শতাব্দীতে, হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কুশান গোষ্ঠীর শাহী রাজাদের পূর্ব আফগানিস্তানে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। ইরাণের সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন হইলে আফগানিস্তানের পশ্চিম অঞ্চল আরব দখলে গিয়াছিল। পূর্বাঞ্চলে আরব বাহিনীর অগ্রসর হইবার প্রয়াস শাহী রাজারা ব্যর্থ করেন। শাহী বংশের পরে পূর্ব আফগানিস্তান হিন্দু (জাজোতিয়া) রাজবংশের অধিকারে আসে। শাহী ও হিন্দু রাজবংশের রাজধানী ছিল ওহিন্দ বা উন্তাওপুর (পুষ্কলাবতী, পুষ্পপুর, পেশোয়ার)। ইঁহারা ছিলেন গান্ধারের রাজা। সিন্ধুনদ পর্যন্ত সমগ্র কাবুল উপত্যকা, দক্ষিণে সফেদ কো ও কোহাট পর্বতশ্রেণী ও উত্তরে সোয়াত (সুভাবস্তু) নদীর উপত্যকা পর্যন্ত গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভূ্ক্ত ছিল। ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর শাসনকর্তা তুর্কগোষ্ঠীয় সবক্তগিন স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গজনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ওহিন্দের রাজা জয়পালকে পরাজিত করিয়া তিনি ওহিন্দ রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করেন। গজনীর মাহমুদ ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জয়পালকে এবং ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র আনন্দপালকে পরাজিত করিয়া পূর্ব আফগানিস্তানে ও গান্ধারে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটান।

মাহমুদ এই সময়ে আফগানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। গজনী ও সুলেমান পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাহারা বাস করিত। ইতিহাসে এই প্রথম আফগানদের উল্লেখ পাওয়া গেল।

গান্ধার রাজ্যের উত্তরে ছিল উদ্যান রাজ্য। সোয়াত, পাঁজকোরা, .

বাজাউর, বুনির, দীব, উদয়ন রাজ্যের অন্তর্ভূ্ক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে ইয়ুসুফজাই পাঠানগোষ্ঠী এই অঞ্চলে প্রবেশ করিবার আগে পর্যন্ত বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল এখানে।

পূর্ব আফগানিস্তানে শাহী ও হিন্দু রাজত্বের অবসানের পরে (১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে) গজনী ও ঘুরের রাজবংশ ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে আফগানিস্তানে রাজত্ব করিয়াছিল। তারপর কিছুকাল খিবা সাম্রাজ্যের অধীনে থাকিবার পরে মোঙ্গলরা (চেঙ্গিজ খান) আফগানিস্তান দখল করে। মোঙ্গলদের হাত হইতে দেশ তৈমুর লঙ্গের হাতে যায়। তৈমুর লঙ্গের বংশধরগণ হিরাট, বালখ, কাবুল ও কান্দাহারে দুই শতাব্দী রাজত্ব করেন। বাদাকশান, কাবুল ও কান্দাহারের অধিপতি তৈমুর বংশীয় বাবর ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বাবরের পৌত্র আকবরের রাজত্বকালে বাদাকশান উজবেগরা দখল করিয়া লয়। কান্দাহার ও হিরাট ইরাণের সুফাভি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূ্ক্ত হয়, শুধু গজনী ও কাবুল মুঘলদের দখলে থাকে। নাদির শাহ দিল্লীর মুঘলদিগের অধিকারভুক্ত অঞ্চলসহ সমগ্র আফগানিস্তান অধিকার করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে আব্দালি বা দুরাণী গোষ্ঠীর প্রধান আহমদ শাহ আফগানিস্তানে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া দেশে জাতীয় রাজতন্ত্র স্থাপন করিলেন।

ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক : প্রাচীন যুগে আফগানিস্তান নামের কোন দেশ ছিল না। বর্তমানে আফগানিস্তান নামে পরিচিত অঞ্চল ছিল আর্য জাতির বাসভূমি আইরিয়ানা ভাএজাবোর অন্তর্ভূ্ক্ত। গ্রীক অভিযানের সময়েও দেশের কয়েকটি অঞ্চলের আরিয়ানা, আরিয়া, আরাকোশিয়া নাম প্রচলিত ছিল এবং আফগানিস্তান পূর্ব আরিয়ানার অন্তর্ভূ্ক্ত বলিয়া গণ্য হইত। পশ্চিমে ইরাণী আর্য জাতি ও দক্ষিণ পূর্ব ভারতীয় আর্য জাতি, এই দুইটি জাতি-গোষ্ঠীর সংযোগক্ষেত্র ছিল এই দেশ। পশ্চিমাংশে ইরাণী আর্য অধিবাসী ও পূর্বাংশে ভারতীয় আর্য অধিবাসী প্রবল ছিল। সিন্ধু নদের পশ্চিমের সাতটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে।

গ্রীক আক্রমণের ফলে কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষের সঙ্গে এই অঞ্চলের

সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল কিন্তু সেলুকাসের চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধির ফলে উত্তরেব বালখ বাদে সমগ্র অঞ্চল ভাবতবর্ষের রাজনৈতিক সীমানাব মধ্যে আসিয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য ক্ষীণশক্তি হইলে এই বাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কিন্তু কুশান রাজশক্তি অভ্যুদয হইলে এই সম্পর্ক আবার স্থাপিত হয়। মধ্য এশিয়ার পূর্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাইবাব পথে এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পথে অবস্থিত আফগানিস্তানে শক, য়িয়ুচী, হুণ, মোঙ্গল, তুর্কীজাতি পুনঃ পুনঃ হানা দিয়াছে। সাসানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পরে আববগণ দেশেব অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। ৭ম শতাব্দীতে দেখা যায় এত বিপর্যয় সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজাবা পূর্ব আফগানিস্তানে আপনাদিগের অধিকাব বজায় বাখিতে পারিয়াছিলেন।

১১শ শতাব্দীতে কাবুল, জেলালাবাদ, সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব হিন্দু-বাজাদের হস্তচ্যুত হইল। সিন্ধুতে আবব শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহার আগে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে (১১৯২-৯৩) মুহম্মদ ঘুরী দিল্লী অধিকার করিলেন। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সকল সম্পর্কের অবসান ঘটিল।

এই প্রাচীন সম্পর্ক ছিল জাতিগত, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত এবং রাজনৈতিক।

আর্য জাতির বাসভূমিব অন্তর্ভূক্ত এই অঞ্চলে ইরাণী ও ভারতীয় আর্য জাতি পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়াছিল। জাতিতে এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা আর্য গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, ধর্মে, সংস্কৃতিতে, ভাষায় আর্য গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। ইরাণী ও ভারতীয় আর্য জাতির মধ্যে ধর্ম লইয়া পরবর্তীকালে যে বিবাদ আরম্ভ হয় এবং জরাথুস্ট্রের ধর্মমত প্রচারিত হয়, তাহার উদ্ভব হয় বালখে। বালখে কিন্তু ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর মত প্রবল হয়, জবাথুস্ট্রের প্রচারিত ধর্ম জন্মস্থান হইতে নির্বাসিত হইয়া মিডিয়ায় প্রচারিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। মিডিয়া হইতে এই ধর্ম নানা নূতন বস্তু সংগ্রহ করিয়া ইরাণে ফিরিয়া আসিয়াছিল। জেন্দবেস্তায় এই বিবাদের কথা আছে। *(Cp. Zend-Avesta Yasna XIVI. II, XIVI-1,2).*

মৌর্যযুগে আফগানিস্তানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। আফগানিস্তান হইতে প্রাচীন অকসাস নদী পার হইয়া সম্রাট অশোকের প্রেরিত ধর্ম-

প্রচাবকগণ উত্তব আফ্রিকায়, সিবিয়াষ এবং গ্রীসে গিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবেব প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় আফগানিস্তানের সকল অঞ্চলে।

কাবুল উপত্যকায় বৌদ্ধযুগের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শনের মধ্যে ভূপ্রোথিত নগর ও ধর্মস্থানেব ধ্বংসাবশেষ আছে। কাবুল প্রদেশে কো-ই বাবার উত্তরে বামীযান নগরেব ধ্বংসাবশেষেব মধ্যে বিবাট বুদ্ধমূর্তি ও বহু বৌদ্ধযুগেব পর্বত-গুহা আছে। কিম্বদন্তী মতে, এই নগব চেঙ্গিস খাঁ ধ্বংস কবিয়াছিলেন। সৈয়দাবাদে, জোহাকে, আফগান তুর্কীস্তানেব হাইবাকে বামীয়ানের পর্বত-গুহার অনুরূপ গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বালখ, বাদাকশান, কাফিরিস্তানের উপত্যকাগুলিতে, জেলালাবাদে, বহু বৌদ্ধযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। জেলালাবাদের বৌদ্ধযুগের নাম ছিল নিনগ্রহার (নববিহার)। একজন ঐতিহাসিক বলিতেছেন, "Although it has been occupied by the Muhammadans for a thousand years there still remain abundant traces of an ancient Hindu population."

সম্রাট অশোকেব কয়েকটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে আফগানিস্তানে। জেলালাবাদেব লাঘমনের নিকট প্রাপ্ত শিলালিপি আরমায়েক লিপিতে লিখিত এবং কান্দাহারে প্রাপ্ত শিলালিপি আরমায়েক ও গ্রীক লিপিতে লিখিত। সীমান্ত প্রদেশের শাহবাজগর্হি ও মানসেরার লেখনগুলি খরোষ্ঠি লিপিতে লিখিত।

পামীর

পামীর পর্ব্বত-গ্রন্থির ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করিতে হইবে। ১ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ মাইলব্যাপী এশিয়াখণ্ডের যে পর্বতময় অক্ষ-রেখা পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত প্রসারিত, তাহার কেন্দ্র পামীর পর্বত-গ্রন্থি। এই পর্বতরেখার মধ্যে পশ্চিম অংশে ইরাণ, আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়ার মালভূমি। পর্বতবলয়ের উত্তরে বলখাস হ্রদ এবং আরল ও কাস্পিয়ান সাগরের নিম্নভূমি। পূর্বদিকে, উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি পৃথক পর্বতশ্রেণী, তিয়েনশান ও কুয়েন লুন-কারাকোরাম। পামীর হইতে বাহির

হইয়া তিয়েনশান পর্বতশ্রেণী মোঙ্গলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে মিলিয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ পাদভূমিতে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কুচার, অক্সু, তুর্ফান, হামি প্রভৃতি অঞ্চল। ইহার দক্ষিণে তারিম নদী ও তাকলামাকান মরুভূমি। আরও দক্ষিণে, ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি অঞ্চল ও তিব্বতের উত্তর সীমানার কুয়েনলুন পর্বতশ্রেণী। তিয়েনশান ও কুয়েনলুনের মধ্যবর্তী অঞ্চল পূর্ব তুর্কীস্তান।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পামীরের এই ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের কথা বলা হইয়াছে। পামীর ও তাহার পশ্চিমের মালভূমিগুলির, অর্থাৎ ইরাণ, আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়ার প্রাচীন অধিবাসী জাতিগুলিকে পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড (Western brachycephals) গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়। কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব ও উত্তর তীর হইতে তিয়েনশানের উত্তরে জুঙ্গেরিয়া, মোঙ্গলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী এবং পামীরের পূর্বে তিয়েনশান ও কুয়েনলুনের মধ্যবর্তী সিনকিয়াংয়ের প্রাচীন অধিবাসী প্রাচ্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে মোঙ্গল, তুঙ্গুজ তুর্কী ও এই সকল গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি আছে। তিব্বতের অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি মিশ্র জাতি আছে, তাহারা প্রধানতঃ গোলমুণ্ড। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতে পামীরের অধিবাসী দক্ষিণে হিন্দুকুশ ও পশ্চিমের মালভূমিগুলির জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত, উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলের জাতিগুলির সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক নাই, যদিও সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে তাঁহারা আরও বলেন, ইরাণী মালভূমির জাতির যে টাইপ সেই টাইপ বিশুদ্ধ অবস্থায় দেখা যায় পামীরের অধিবাসীদের মধ্যে। এই টাইপের নাম পামীরী, ইরাণো-পামীরী বা আলপাইন (Alpine) টাইপ।

ইরাণী মালভূমি আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রন্থি হইতে পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে আনাতোলিয়ার মালভূমি আর্মেনিয়ার উচ্চভূমির সহিত যুক্ত। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে আজারবাইজান হইতে খোরাশান, খোরাশান হইতে আফগানিস্তান, বেলুচীস্তান, পামীর ও সিন্ধু উপত্যকা প্রাচীন ইরাণী গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতির অধ্যুষিত এলাকা ছিল। আফগানিস্তানের উত্তরে বোখারা, তাসখন্দ ও মার্ভ এই

এলাকার অন্তর্ভূ'ত ছিল। ইরাণ ও তুর্কীর মধ্যবর্তী কুর্দীস্থানের অধিবাসীরা কোন কোন মতে প্রাচীন ইরাণী গোষ্ঠীভুক্ত। আজারবাইজান, কুর্দীস্থান, আর্দলেন এবং ইরাক আজেমীর অংশ লইয়া গঠিত প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ মিডিয়ার অধিবাসী এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল।

ইরাণের প্রাচীন অধিবাসীর সঙ্গে সেমিটিক ও উরল-আলতাইক গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। পামীরের উপত্যকাগুলির অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলা হয় যে, বোখারায় তুর্কগোষ্ঠীর উজবেগদিগের অভিযানের ফলে প্রাচীন অধিবাসী তাজিকদিগের বিভিন্ন দল পামীরের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লয়। তাহাদিগকে গলচা বা পার্বত্য তাজিক নাম দেওয়া হইয়াছে। আফগান পামীরের ওয়াখানি ও ইসকাসমী, রুশিয়া-অধিকৃত পামীরের বোশানী, সিগনানী, ইয়াজখুলানী, দরবাজী, বনজী ও কারাতেঘিনী এবং চীনা পামীরের সারিকোলী প্রভৃতি উপজাতিগুলি ইরাণী ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে এবং তাহাদিগকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়। পামীরের উত্তর-পশ্চিম উপত্যকাগুলিতে মোঙ্গল-তুর্কী গোষ্ঠীর খিরঘিজ ও উজবেগদিগের সঙ্গে সংমিশ্রণ দেখা যায়। রুশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্বে বোখারায় শাসকগোষ্ঠী ছিল উজবেগজাতীয়, কিন্তু দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশ ছিল তাজিক। পামীর উপত্যকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে স্যর অরেল ষ্টাইন ও ব্যারন উজফালভির সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন,—"So far as Asia is concerned the Pamir valleys seem to be the locality where Homo-Alpinus appears in his greatest purity," (T. A. Joyce)। চীনা পামীরের সারিকোলের একজন ব্যক্তির বর্ণনা করিয়া স্যর অরেল ষ্টাইন বলিতেছেন,—"With his tall figure, fair hair and blue eyes he looked the very embodiment of the Homo-Alpinus tribe which prevails in Sarikol." ব্যক্তিটি অবশ্য ধর্মে মুসলমান, নাম মুহম্মদ ইয়ুসুফ বেগ।

পূর্ব তুর্কীস্তান

এইবার পামীরের সংলগ্ন, বর্তমানে মোঙ্গল-তুর্কগোষ্ঠীয় জাতির অধ্যুষিত এলাকা, পূর্ব তুর্কীস্তানের কথায় আসা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জানিতে হইলে পূর্ব-তুর্কীস্তানের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও বর্তমান অধিবাসীদের সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সহিত চীনের ও চীনের সহিত পশ্চিম জগতের সংযোগ রক্ষা হইত এই এলাকার মধ্যের পথ দিয়া। বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত হইয়াছিল এই পথ দিয়া। মোঙ্গলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল এই পথে। ফা হিয়েন, হুয়েন সাং প্রমুখ বহু প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক এই পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। শক, য়িয়ুচী বা কুশান, হূণ, মোঙ্গল অভিযান এই পথে অগ্রসর হইয়া ভারত, ইরাণ ও পূর্ব ইয়ুরোপে প্রভাবিত করিয়াছিল। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের বর্তমান অধিবাসী গোলমুণ্ড জাতিগুলির পূর্ব পুরুষগণ এই অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মোহেঞ্জোদারোর সভ্যতা যাহাদের হাতে ধ্বংস হইয়াছিল তাহারা আসিয়াছিল এই অঞ্চল হইতে। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে, আর্য জাতির আদি বাসভূমি ছিল এই অঞ্চলে। ("It appears very probable that at the dawn of history East Turkistan was inhabited by an Aryan population, the ancestors of the present Slavonic and Teutonic races").

৪ লক্ষ ৬৫ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত পূর্ব তুর্কীস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনা উপরে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা তিব্বতের উত্তরে হইলেও ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ প্রতিবেশী অঞ্চল। তিব্বতের মালভূমি সংকীর্ণ হইয়া উত্তর-পশ্চিমে পামীরের সঙ্গে মিশিয়াছে। এই অঞ্চলে কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের অন্তর্ভূত লাডাক। লাডাক হইতে মুজতাঘ পাশ ও কারাকোরাম পাশ হইয়া পূর্ব তুর্কীস্তান এলাকায় প্রবেশ করা যায়। পামীর হইয়া এই অঞ্চলে প্রবেশ করিবার পথের কথা বলা

হইয়াছে। তাকলামাকান ও তাহার পূর্বে লপ মরুভূমি পূর্ব তুর্কীস্তানকে উত্তর ও দক্ষিণ, এই দুই অঞ্চলে ভাগ করিয়াছে। দক্ষিণ অঞ্চলে ইয়ারখন্দ, খোটান, কোরিয়া, চরচেন প্রভৃতি ও উত্তর অঞ্চলে পর পর কতকগুলি মরু উদ্যান, অক্ষু, কুচার, কারাশহর ও ইহার উত্তর-পূর্বে তুরফান এবং পেইসান বা গোবি মরুভূমির প্রান্তে হামি।

পূর্ব তুর্কীস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক আমলের সম্পর্কের বিবরণ মৌর্য আমল হইতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে। প্রথমে অতি সংক্ষেপে পূর্ব তুর্কীস্তানের ইতিহাসের উল্লেখ করা হইতেছে।

খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে চীনের হান রাজবংশের আমলে পূর্ব তুর্কীস্তানের কতকগুলি জাতির চলাচলের (রেসিয়াল মাইগ্রেসান) বিবরণ পাওয়া যায় প্রাচীন চীন ইতিহাস হইতে। এই আলোড়নের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্পর্ক আছে। প্রথমে উত্তর-পশ্চিম চীনের কানসু বা সেন-সে প্রদেশের য়িয়ুচী জাতি হিয়েং-নু জাতির (De Guignes-এর মতে ইহারা হূণ জাতি) আক্রমণের ফলে বাসভূমি ত্যাগ করিয়া পূর্ব তুর্কীস্তানের মধ্য দিয়া অকসাস উপত্যকায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। য়িয়ুচীরা অকসাস উপত্যকায় আসিবার পূর্বে তাহাদের হাতে পরাজিত হইয়া শকজাতি পূর্ব তুর্কীস্তান হইতে (কোন কোন মতে ইলি নদীর অববাহিকা হইতে) অগ্রসর হইয়া অকসাস উপত্যকায় বাস করিতেছিল। য়িয়ুচী-দিগকে পরাজিত করিবার পরে পূর্ব তুর্কীস্তানে হিয়েংনুদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর শেষে হিয়েংনুদিগের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার পর পূর্ব তুর্কীস্তানে চীন সাম্রাজ্যের শক্তি বিস্তার লাভ করিতে থাকে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পূর্ব-হান বংশের আমলে, চীন সেনাপতি পাঞ্চাও, খোটান, কুচার এবং কাশগড় দখল করেন। এই সেনাপতির হাতে কুশান সম্রাট কণিষ্কের চীন অভিযানে প্রেরিত বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এই সময়ে (খ্রীষ্টীয় ৬৩ অব্দে) বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রথম প্রচারিত হয় এইরূপ জানা যায়। ইহার পরে অন্তর্দ্বন্দ্বে চীনে শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং পূর্ব তুর্কীস্তান চীনের হস্তচ্যুত হয়। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষে দেখা যায় যে পশ্চিম অঞ্চল এপথালাইট বা শ্বেত হূণদিগের দখলে ও পূর্ব অঞ্চলে তুর্কী (তাজুট বা কারলুক)

শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুর্কীরা ইরাণের সাসানীয় বংশের সম্রাট খসরুর সহায়তায় এপথালাইট সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইহার কিছু পূর্বে ভারতবর্ষে হূণ শক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল মগধের নরসিংহ গুপ্ত ও মধ্যভারতের যশোধর্মনের হাতে। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ট্যাং রাজবংশের আমলে চীনশক্তি আবার পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং পূর্ব-পারস্য ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত চীন সাম্রাজ্যের সীমানা প্রসারিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর চতুর্থ পাদে আরবের মরুবক্ষে যে ঝটিকার উদ্ভব হইয়া ক্রমে পূর্বে সিন্ধুদেশ ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়া দেয় তাহার আঘাত ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ব তুর্কীস্তানেও অনুভূত হয়। ওম্মিয়াদ খলিফের ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজের এক সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু বিজয় করেন। তাঁহার অন্য এক সেনাপতি কোতইবা সেই সময়ে মাভর-উন-নহর (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) বিজয় করিয়া পূর্ব তুর্কীস্তানে প্রবেশ করেন এবং তুর্ফান অধিকার করিয়া চীনের সীমানা পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু আরব প্রভাব যেমন ভারতবর্ষে স্থায়ী হইতে পারে নাই সেইরূপ পূর্ব তুর্কীস্তানেও স্থায়ী হইতে পারে নাই। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে তিব্বত বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র পূর্ব তুর্কীস্তান তিব্বতী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। ইহার পরে তুর্কীগোষ্ঠীর উইগুর (Uigur) জাতি পূর্ব তুর্কীস্তানের পূর্ব অংশে শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং পশ্চিম অংশ তুর্কীগোষ্ঠীর কারলুক জাতির দখলে যায়। ১০ম শতাব্দীতে তুর্ক বা মোঙ্গল গোষ্ঠীর কারা খিতাই জাতি তিয়েনশানের উত্তর অঞ্চল হইতে পূর্ব তুর্কীস্তানে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে পূর্বে কোরিয়া হইতে পশ্চিমে পূর্ব-য়ুরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে মোঙ্গলশক্তি দুর্বার হইয়া উঠে। ইহার এক শতাব্দী পরে পূর্ব তুর্কীস্তানে ইসলাম প্রচারিত হয়।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব তুর্কীস্তানে চীনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার পূর্বে সেখানে শক, য়িয়ুচী ও হিয়েংনু প্রভাব বর্তমান ছিল। ইহাদের কেহ যে পূর্ব তুর্কীস্তানের প্রাচীন অধিবাসী ছিল এ কথা বলা হয় নাই। তাহার পরে চীনা, এপথালাইট, তুর্কী, তিব্বতী ও মোঙ্গল প্রভাবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। চীনের প্রাচীন ইতিহাসে এই অঞ্চল সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে তিয়েনশানের দক্ষিণের অক্ষু, কুচার

কারাশহর, তুর্ফান ও হামি এবং কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ অঞ্চলগুলির নিজস্ব ইতিহাস ও তাহাদের অধিবাসীদের সম্বন্ধে কোন কথা নাই।

এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার স্থান এখানে নাই। শুধু বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাইবার জন্ম দুই একটি কথা বলা হইতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত কিম্বদন্তী মতে মৌর্য আমলে (অশোকের সময়ে) ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, বিশেষ করিয়া কাশ্মীর হইতে ভারতীয়গণ খোটানে উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিম্বদন্তী মতে, অশোকের পুত্র কুণাল এই রাজ্যের রাজা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। খোটান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন লেখনে খোটানের ভারতীয় রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুচার বা কুচি পূর্ব তুর্কীস্তানের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। "Chinese historians took notice of the country for 1000 years and recognised its greatness in the political and cultural history of central Asia." কুচারের প্রাচীন রাজাদের নাম ভারতীয়। কারাশহরের নাম ছিল অগ্নিদেশ। ভারতবর্ষের সঙ্গে এই সকল অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানী স্যর অরেল ষ্টাইনের গ্রন্থগুলিতে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু বৌদ্ধধর্ম নহে, ভারতীয় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি সমগ্র পূর্ব তুর্কীস্তানে প্রচলিত ছিল। পূর্ব তুর্কীস্তানে ইসলাম প্রচার ও উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ ইসলামধর্মী রাজাদিগের কবলিত হইলে ভারতবর্ষের সহিত এই অঞ্চলের সহস্রাধিক বৎসরের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়।

পূর্ব তুর্কীস্তানের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হইতেছে। এই অঞ্চলের পশ্চিমে পামীরী বা ইরাণো-পামীরী গোষ্ঠীর জাতিকে দেখা যায়। উত্তরে, উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে উরল-আলতাইক গোষ্ঠীর জাতিকে দেখা যায়। পূর্বে চীনজাতি। দক্ষিণে তিব্বতী জাতি। পূর্ব তুর্কীস্তানে বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে এই সকল গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ দেখা যায়।

পূর্ব তুর্কীস্তানে যে সকল জাতি বর্তমানে বাস করে তাহাদের মধ্যে তুর্কীগোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায়। এই সকল মিশ্র জাতির মধ্যে পামীরী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংমিশ্রণ তারিম অববাহিকার অধিবাসীদের মধ্যে স্পষ্ট। ইহারা

ছাড়া পূর্ব তুর্কীস্তানের একটি লুপ্তজাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাকলামাকান মরুভূমির বালুকা-প্রোথিত শহরগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে। এই লুপ্ত জাতি সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মত এইরূপ: "The original inhabitants of the Pamirs and the Taklamakan desert including the cities now buried beneath the sand, is the type of man described by Lapouge as Homo-Alpinus" (T. A. Joyce *Journal of the Royal Anthropological Institute.*) অর্থাৎ পামীরের প্রাচীন অধিবাসী এবং তাকলামাকানের এই লুপ্ত জাতি এক টাইপের। স্যর অরেল ষ্টাইনের মতে তাকলামাকান ছাড়াইয়া লপ মরুভূমির উত্তরে লৌ-লানের প্রাচীন অধিবাসী ছিল এই টাইপের। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পামীর উপত্যকা, তাকলামাকান ও লপ মরুভূমির প্রাচীন অধিবাসীরা যে গোষ্ঠীভুক্ত সেই গোষ্ঠীর জাতি এককালে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের মতে এই গোষ্ঠী গোলমুণ্ড (আলপাইন) টাইপ।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে অনুমান করা যায় যে, তুর্কীগোষ্ঠীর জাতি পরবর্তী কালে বাহির হইতে (সম্ভবতঃ তিয়েনশানের উত্তর অঞ্চল হইতে) পূর্ব তুর্কীস্তানে আসিয়াছিল।

রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার প্রসিদ্ধ *Indo-Aryan Races* গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড জাতিগুলি পামীর ও তাকলামাকানের এই গোলমুণ্ড জাতি হইতে উদ্ভূত। তাঁহার মতে এই জাতির ভাষা ছিল আর্য বা ইন্দো-য়ুরোপীয় (…"it is evident that in the pre-historic period the Taklamakan desert and the Pamir were inhabited by a very brachycephalic population of Aryan or Indo-European speech.")

এই গোলমুণ্ড, আর্যভাষাভাষী যে জাতির কথা চন্দ মহাশয় বলিতেছেন তাহারা মোহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার মনুষ্যদেহাবশেষ যে সকল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে, সিন্ধু উপত্যকার তাম্রযুগে (খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০-৩২৫০) ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিল। এই জাতি ইরাণ, পামীর ও পূর্ব তুর্কীস্তানের প্রধান অধিবাসী।

পূর্ব পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে যাহা বলা হইল তাহা হইলে পূর্ব তুর্কীস্তানের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সামান্য ধারণা করা সম্ভব হইবে। পূর্ব তুর্কীস্তান আর্য জাতির আদি বাসভূমি ছিল—কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন পূব পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। এখন পূর্ব তুর্কীস্তান হইতে কুয়েনলুন পর্বতশ্রেনী অতিক্রম করিয়া উত্তর তিব্বতের চ্যাংট্যাং অঞ্চলে প্রবেশ করিতে হইবে।

তিব্বত

উত্তরে পূব তুর্কীস্তান ও মোঙ্গলিয়া এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে ৭ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী তিব্বতের সুউচ্চ মালভূমি। তিব্বত শুধু ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ নহে, প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের এক অংশ তিব্বতী গোষ্ঠীয়। সুতরাং ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জানিতে হইলে তিব্বতের ও তিব্বতের অধিবাসীদের কিছু পরিচয় জানা আবশ্যক।

তিব্বতের মালভূমি পশ্চিমে সংকীর্ণ হইয়া পামীরের সঙ্গে মিশিয়াছে। এই মিশিবার স্থান হইতে দুইটি পর্বতশ্রেণী মালভূমিকে উত্তরে ও দক্ষিণে বেষ্টন করিয়া পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। উত্তরের পর্বতশ্রেণী কুয়েন লুন্ প্রথমে তুর্কীস্তান তারপর কোকনর ও তিব্বতের মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া চীনের য়ুনলিং পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়াছে। দক্ষিণের হিমালয় হইতে গঙ্গার সমতল ভূমির উত্তর সীমানা ও তিব্বতের মালভূমির দক্ষিণ সীমানার মধ্যে সমান্তরাল রেখায় পর পর কতকগুলি পর্বতশ্রেণী পূর্বে চলিয়া গিয়াছে। মনে হয় গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর প্রান্ত হইতে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটার পর একটা তরঙ্গ উঠিয়াছে। এই তরঙ্গশ্রেণীর পরে পাঁচশত মাইল প্রশস্ত ও ১০০০০ হইতে ১৭০০০ ফুট উচ্চ তিব্বতীয় মালভূমির স্থির সমুদ্র। এই সমান্তরাল পর্বত-শ্রেণীর একটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেষ্ট। ভৌগোলিকগণ এই পর্বত-শ্রেণীটিকে ভারতবর্ষ ও তিব্বতের ভৌগোলিক সীমানা বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণের এই পর্বতশ্রেণী পূর্বে প্রসারিত হইয়া আসাম ও উত্তর-ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া চীনের য়ুন্নানের পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়াছে। উত্তরে পূর্ব তুর্কীস্তান ও

মোঙ্গলিয়া, পূর্বে চীন ও দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারতবর্ষ তিব্বতের প্রতিবেশী অঞ্চল।

সাত লক্ষ বর্গ মাইলের (অখণ্ড ভারতবর্ষের অর্ধেকের কিছু কম) বিশাল মালভূমির অধিকাংশ মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত। মনুষ্যের বসতি মালভূমির দক্ষিণ অঞ্চলে দেখা যায়। এই অঞ্চলের নাম বোদ-য়ুল বা ভোট ; এই ভোটভূমি চারটি প্রদেশে বিভক্ত। পশ্চিমে নারি, পূর্বে খাম ও মধ্যে স্যাংও উ। মনুষ্য বসতি এলাকার উত্তরে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা মধ্য বা হোর অঞ্চল। ইহা যাযাবর বোদ পাদিগের পশুচারণের ক্ষেত্র। ইহার উত্তরে চ্যাংট্যাং অসংখ্য বন্য পশুর বাস-ভূমি, স্থানে স্থানে তুর্কী ও মোঙ্গল যাযাবরদিগকে দেখা যায়।

মনুষ্যবসতি এলাকার পশ্চিম অংশের নাম নারি। কাশ্মীর-জম্মু রাজ্যের অন্তর্ভূর্ত লাডাক ও বাল্টীস্থান নারির মধ্যে। লাডাক ও বাল্টীস্থান বাদে খোরসুম ও মাঙ-য়ুল নারির মধ্যে। খোরসুমের দক্ষিণে পাঞ্জাব হিমালয়ের ও যুক্তপ্রদেশের পার্বত্য জেলাগুলি, পশ্চিমে মাঙ-য়ুল বা দোকথোল। ইহার দক্ষিণে নেপালের পশ্চিম অংশ। দোকথোলের পশ্চিমে উ ও স্যাং এই দুই প্রদেশ। ইহার দক্ষিণে নেপাল, সিকিম, ভুটান। পূর্বে খাম প্রদেশের দক্ষিণে উত্তর-আসাম, উত্তর-ব্রহ্ম ও য়ুন্নানের পার্বত্য অঞ্চল।

গাঙ্গেয় উপত্যকার সমতলভূমি হইতে উত্তরে দৃষ্টিপাত করিলে যে পর্বতপ্রাকার দৃষ্টি রোধ করে সেই প্রাকার একটানা চলিয়া পূর্ব তুর্কীস্তান ও মোঙ্গলিয়ার দক্ষিণে শেষ হইয়াছে। প্রস্থে একহাজার মাইলের উপরে এই পর্বতপ্রাকারের সর্বোচ্চ শীর্ষ ভারতবর্ষ ও তিব্বতকে ভাগ করিয়াছে। এই শীর্ষের পর প্রাকারের উচ্চতা প্রায় ১৫ হাজার ফুটের নীচে নামিয়া গিয়াছে। তারপর উত্তর সীমানার কাছে উচ্চতা আবার বাড়িয়াছে। দক্ষিণে ২৮ হাজার ফুট উচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গ, উত্তরে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি, এই দুইটির মধ্যে অবস্থিত তিব্বত কতকটা অবরুদ্ধ অঞ্চলের মত। দক্ষিণ অঞ্চল বাদে সমগ্র দেশটি নীরস পাহাড়ী মরুভূমি, সহস্র সহস্র কিয়াং বা বন্য তিব্বতী গর্দভ, ইয়াক, হরিণ ও উটের চারণ ক্ষেত্র।

সিন্ধু, শতদ্রু ও কর্ণালি নদীর উৎপত্তি তিব্বতের দক্ষিণ পশ্চিমের খোরসুম প্রদেশে। তিব্বতের ৎসাংপো, আসামের ডিহিং ও পূর্ব ভারতের ব্রহ্মপুত্র।

তিব্বতের বহু হ্রদের মধ্যে মানস সরোবর ও রাক্ষসতাল সরোবরের নাম অতি পরিচিত।

তিব্বতের ইতিহাসে পূর্ব তুর্কীস্তান, মোঙ্গলিয়া, চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক দেখা যায়। ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক প্রধানতঃ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক, চীনের সঙ্গে এই দুইটি ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে।

চীন ও মোঙ্গলিয়া, ভূটান, সিকিম, নেপাল, লাডাক ও কাশ্মীর হইতে পণ্য বহন করিয়া ব্যবসায়ীরা লাসা ও সিগাজে বা দিগারচির প্রসিদ্ধ ব্যবসায়-কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। তাওয়াঙের পথে আসাম হইতে, চুম্বি উপত্যকার পথে দার্জিলিং হইতে, নেপাল হইয়া বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে, পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও লাডাক হইতে চ্যাংচেনমো উপত্যকা হইয়া, নবগঠিত হিমাচল প্রদেশ হইতে সিপকী পাশ হইয়া পণ্য তিব্বতে প্রবেশ করে। তিব্বতের পূর্ব প্রান্তের প্রদেশ খামের সীমান্তে দারচিয়েণ্ডো চীন হইতে প্রেরিত পণ্য সংগ্রহের কেন্দ্র। দারচিয়েণ্ডো হইতে দুইটি পথ ৯০০ মাইল দূরে লাসা অভিমুখে গিয়াছে। লাসা হইতে পশ্চিম তিব্বতের রুডোক (লাডাক সীমান্তে) ৯০০ মাইল।

শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে সংগৃহীত তিব্বতী রাজবংশের যে বংশতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় তিব্বতী কিম্বদন্তী মতে কোশোলের রাজা প্রসেনজিতের পঞ্চম পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচের তেরছা (oblique) চক্ষু লইয়া। বড় হইয়া সেই পুত্র বোদ দেশে পালাইয়া যান। দক্ষিণ ও মধ্য তিব্বতের প্রধানগণ তাঁহাকে আপনাদিগের রাজা নির্বাচিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিব্বতে যতদিন রাজতন্ত্র বর্তমান ছিল এই রাজবংশ ততদিন চলিয়াছিল। কোন কোন মতে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে নূতন মোঙ্গল বা তাতার রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ লিয়াং রাজবংশের ও কানসুর অন্তর্গত লিন-সুংয়ের শাসন-কর্তা ছিলেন নূতন রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সে যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে নেপাল হইতে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মাঝা-মাঝি স্রং-সান-গাংসো ভারতবর্ষ হইতে লিপি ও বৌদ্ধ ধর্ম স্বদেশে প্রচারিত করেন। ইনি লাসার প্রতিষ্ঠাতা, ইঁহার রাজ্যের সীমা নেপালের দক্ষিণেও বিস্তৃত ছিল—এইরূপ কথিত আছে।

নেপালের দক্ষিণে তিব্বতী অধিকার বিস্তৃতির কথা একটু বিস্তারিতভাবে বলা প্রয়োজন।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে (৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার মন্ত্রী অর্জুন বা অরুণাশ্ব সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে চীনসম্রাট কর্তৃক হর্ষবর্ধনের নিকট প্রেরিত একদল চীনা প্রতিনিধি ভারতবর্ষে ছিলেন। কথিত আছে অর্জুন সিংহাসন অধিকার করিয়া এই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রক্ষীদিগকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের জিনিষপত্র কাড়িয়া লন। প্রতিনিধিদলের প্রধান ওয়াঙ্ হিউয়েন-সে ও তাঁহার এক সঙ্গী নেপালে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। নেপাল এই সময়ে তিব্বতের অধীন ছিল এবং তিব্বতের রাজা ছিলেন প্রসিদ্ধ স্রং-সান-গাংপো। তিনি চীনা ও এক নেপালী রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চীনা রাজদূতের সাহায্যার্থে তিনি ১২০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। এই ১২০০ তিব্বতী সৈন্য ও ৭০০০ নেপালী অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ওয়াঙ্ ত্রিহুতের প্রধান নগর আক্রমণ ও দখল করেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি ও কর্ণেল ওয়াডেলের হাতে ওয়াঙের বীরত্বের এক চিত্তচমৎকারী কাহিনী পাওয়া যায়। ৮২০০ সৈন্য লইয়া ওয়াঙ দুইবার অর্জুনকে পরাজিত ও সমগ্র রাজপরিবারকে বন্দী করেন, পরাজিত ভারতীয় বাহিনীর ৪০০০ সৈন্যের মুণ্ডচ্ছেদ করেন, ১০০০০ সৈন্য জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ১২০০০ সৈন্য বন্দী হয়, ৫৮০টি প্রাকার বেষ্টিত নগরী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তিনি ত্রিশ হাজার অশ্ব ও গো-মহিষাদি পশু হস্তগত করেন। ইহা ছাড়া পূর্ব ভারতের কুমার নামে একজন রাজা বহু পশু ও অস্ত্রশস্ত্র তাঁহাকে উপঢৌকন পাঠান। অর্জুনকে বন্দী করিয়া তিনি চীনে লইয়া যান। এই বিস্ময়কর বিজয় অভিযানের ফলে ভিনসেণ্ট স্মিথের ভাষায়, "Tirhut apparently remained subject for some time to Tibet."

এই কাহিনীর উপর গড়িয়া উঠিয়াছে আরও বিস্ময়কর একটি কাহিনী। Nothing is said about this Tibetan rule in India except in the Chinese annals where it is mentioned that until the end of the monarchy in the 10th century, as extending over Bengal to the sea, the Bay of Bengal being called the Tibetan

Sea.” অর্থাৎ নেপাল রাজ অংশুবর্মার প্রেরিত ৭০০০ হিন্দু সৈন্য ও তিব্বত হইতে প্রেরিত ১২০০ সৈন্য, মোট ৮২০০ সৈন্য লইয়া ওয়াঙ ত্রিহুত দখল করিয়াছিলেন ৬৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তী বৎসরে তিনি স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত সমগ্র বাংলা ৩৫০ বৎসর তিব্বতের অধীনে কোন উপায়ে রহিয়া গিয়াছিল ইহাই অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু জানা যায় যে নেপালে ও ত্রিহুতে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথমেই (৭৩০ খ্রীঃ অঃ) এক প্রবল বিদ্রোহ হয় এবং এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া স্রং-সান-গাংপোর পরের এক তিব্বতী রাজা সসৈন্যে নিহত হইয়াছিলেন।

এই ব্যাপারটি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে এই প্রকারের প্রমাণের ভিত্তিতে দুই চারিজন পণ্ডিত বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ ঘটিবার থিওরীর সমর্থন করিয়াছেন, যদিও মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের থিওরীর প্রচারক স্যর হারবার্ট রিজলে এই প্রমাণের কোন উল্লেখ করেন নাই।

খ্রীষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দী তিব্বতী শক্তি প্রসারণের যুগ। স্রং-সান-গাংপো পশ্চিমে লাডাক ও দক্ষিণে নেপালে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার পুত্র মং-স্রং-মাং-সান কোকনরের মোঙ্গলদিগকে বশ্যতা স্বীকার করান ও পুনঃপুনঃ পশ্চিম চীন আক্রমণ করেন। পূর্ব তুর্কীস্তানের পশ্চিম অঞ্চলের কুচার, খোটান ও কাশগড়ে তিব্বতী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের ট্যাং বংশের সম্রাজ্ঞী উ-হাউয়ের সময়ে এই আধিপত্য নষ্ট হয়। কিন্তু ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতী শক্তি আবার প্রবল হইয়া বারবার পশ্চিম চীন আক্রমণ করিতে থাকে। চীন সম্রাটকে তুর্কদিগের (উইগুর) সাহায্য গ্রহণ করিয়া তিব্বতীদিগকে বাধা দিতে হয়। স্যর অরেল ষ্টাইন ডারকোট গিরিসংকটে একটি তিব্বতী লেখনের উল্লেখ করিয়াছেন। ডারকোট পাশ চিত্রল ও ইয়াসিনের মধ্যে। কাশগড় হইতে প্রেরিত সেনাপতি কাও-সিয়েন-চিং-এর অধীনে এক চীনা বাহিনী তিব্বতীদের পশ্চিমদিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্য ইয়াসিন ও গিলগিটে প্রবেশ করিয়াছিল (৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ৮ম শতাব্দীর শেষ দিকে সমগ্র পূর্ব তুর্কীস্তানের তিব্বতীদিগের করতলগত হয়। এই সময়ে তিব্বতের সম্রাট ছিলেন খি-স্রং-ইদেন-সান।

তিব্বতের বৌদ্ধ সাহিত্যের মতে ইনি তিব্বতের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি।

ইহার পরে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে দেশে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হয় এবং তিব্বত কয়েকজন শাসন-কর্তার মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। চীন প্রথমে কিন তাতার ও পরে চেঙ্গিজ খাঁর বংশের অধীনে যায়। মোঙ্গল রাজ বংশের কুবলাই খাঁ পূর্ব তিব্বত অধিকার করেন। কুবলাই খাঁ শাক্যমঠের প্রধানকে তিব্বতের শাসন কর্তা বলিয়া স্বীকার করেন। খ্রীষ্টীয় ১৭ম শতাব্দীতে তুমেদ মোঙ্গলদিগের রাজারা গাল্ডেন মঠের অধ্যক্ষকে দালাইলামা ও তিব্বতের প্রধান শাসন-কর্তা বলিয়া স্বীকার করেন। চীনে মাঞ্চুরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে মাঞ্চু সম্রাট কাং-হে তিব্বত অধিকার করেন।

খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী (৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে চীনে এই ধর্ম প্রসারের ধারাবাহিক ইতিহাস মিলে। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে স্রং-সান-গাংপোর রাজত্বকালে সমগ্র তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান আরম্ভ হয়। নেপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ তিব্বতে গমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে কুমার, শঙ্কর ব্রাহ্মণ, শীলমঞ্জুর প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। স্রং-সান-গাংপো বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ভারতবর্ষে দূত পাঠান। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত ও তাঁহার আত্মীয় পদ্মসম্ভব তিব্বতে গমন করেন। পদ্মসম্ভব ছিলেন নালন্দার অধ্যাপক, তাঁহার দেশ ছিল উদয়ন। তিব্বতে লামা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। তিব্বতে তাঁহার নাম হয় গুরু রিন্-পো-চে। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে অতীশ তিব্বতে গমন করেন। তিনি নারির প্রসিদ্ধ থোডিং মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ইঁহারা ছাড়া ভারতবর্ষ হইতে আরও বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে ধর্ম-প্রচার করিতে গিয়াছিলেন।

তিব্বত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম মোঙ্গলিয়ায় প্রচারিত হয়। য়ুরোপের মোঙ্গল ও তাতার আক্রমণকারীদের সঙ্গে ইহা পূর্ব য়ুরোপে প্রবেশ করে ("...it penetrated to Europe where the early Christians had to pay

tribute to the Tarter Buddhist lords of the Golden Horde and it still survives in European Russia among the Kalmuks on the Volga who are professed Buddhists of the Lamaist school.")

তিব্বতের লিপি ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এই লিপি মোঙ্গলিয়ায় প্রচারিত হয়। পরবর্তী কালে এই লিপির পরিবর্তন সাধিত হইলেও পণ্ডিতগণের মতে সেই লিপির উপর ভারতবর্ষ ও তিব্বতের প্রভাব দেখা যায়। তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্য প্রধানতঃ ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ। মোঙ্গলিয়ার প্রাচীন সাহিত্য আবার প্রধানতঃ তিব্বতী ও চীনা বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ। পণ্ডিতগণের মতে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না এরূপ অনেক গ্রন্থের চীনা, তিব্বতী, মোঙ্গলিয়ান ও কালমুক অনুবাদ পাওয়া যায়।

তিব্বতের পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত যে দক্ষিণ অঞ্চলের কথা বলা হইয়াছে সেখানে, অর্থাৎ নারি, উ-স্যাং ও খামে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী বাস করে। ইহারা ভোট বা তিব্বতী জাতি। এই অঞ্চল ছাড়া উত্তরের হোর, অঞ্চলের কতক অংশে, বিশেষ করিয়া খামের উত্তরে আমদো অঞ্চলেও (উত্তরে কোকনর, দক্ষিণে কানসু) ভোট জাতির বাস। হোর নাম আসিয়াছে তিব্বতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী তুর্কী গোষ্ঠির জাতির নাম হইতে। উত্তর-পূর্ব তিব্বতের মোঙ্গল গোষ্ঠীর অধিবাসীরা গোক নামে পরিচিত। তিব্বতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত। চীনাদিগের নিকট ইহারা সিফান নামে পরিচিত। সিফান অর্থ পশ্চিম অঞ্চলের বিদেশী জাতি। চীনের সীমান্তে দক্ষিণে (সে-চুয়ানে) লোলো, লিসো, মোসো নামে পরিচিত জাতিরা বাস করে। ইহারা বর্মীদিগের সমগোষ্ঠীয়, এইরূপ বলা হইয়াছে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ দক্ষিণের উর্বর উপত্যকাগুলির অধিবাসীদিগকে বোদ-পা ও ইহার উত্তরের মালভূমির অর্ধযাযাবর, পশুপালক অধিবাসীদিগকে ড্রু-পা নাম দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে তিব্বতীদিগের মধ্যে দুইটি পৃথক গোষ্ঠীর জাতি দেখা যায়। একটি দক্ষিণ মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত। ইহাদের মস্তকের আকৃতি গোল, রং পীত, চোখ তেরছা। অপরটির মস্তকের

আকৃতি মধ্যমাকৃতির (mesocophalic) মোঙ্গলয়েড লক্ষণ বিশেষ দেখা যায় না, মুখমণ্ডল চওড়া (broad-faced, ragged and massive)। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই জ্রু-পা টাইপের সঙ্গে পূর্ব তুর্কীস্তানের খোটান, কেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং এই সাদৃশ্য সংমিশ্রণের ফলে আসিয়াছে। কোন কোন মতে পূর্ব তুর্কীস্তানের প্রাচীন পামীরী টাইপের প্রভাব তিব্বতীদিগের মধ্যে দেখা যায়।

তিব্বতের সীমানা পশ্চিমে কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে পূর্ব পাঞ্জাবের হিমালয় অঞ্চল, দক্ষিণে নেপাল, সিকিম, ভুটান ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী অঞ্চল স্পর্শ করিয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এই সকল অঞ্চলে তিব্বতী টাইপ ও ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সহিত তিব্বতী টাইপের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

হিমালয়ের প্রাচীর

নেপাল, সিকিম, ভুটান

দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ মাইল ও প্রস্থে ১৫০ মাইল পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে পূর্বে পটকোই পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভারতের সমতল ভূমির উত্তরে প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে।

হিমালয় ভারতবর্ষের উত্তর সীমানা নহে। পামীরের পর্বত গ্রন্থি হইতে নির্গত হইয়া একটি পর্বতশ্রেণী, যাহার অংশ হিন্দুকুশ নামে পরিচিত, পশ্চিম-দিকে প্রসারিত হইয়া আফগানিস্তানকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ইরাণে প্রবেশ করিয়াছে। ইরাণকে বেষ্টন করিয়া উত্তরদিকে একটি শাখা ককেশাস, অন্য শাখা আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রন্থিতে মিশিয়াছে। পামীরের এই পর্বতগ্রন্থি হইতে পূর্বদিকে হিমালয়ের উত্তরে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী, কারাকোরামের উত্তরে কুয়েন লুন পর্বতশ্রেণী। কুয়েন লুন তিব্বতের পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে, কারাকোরাম লাডাকের উত্তরে প্রসারিত। উত্তর-পশ্চিমের হিন্দুকুশ (Indian Caucasus) ও উত্তর-পূর্বের কারাকোরাম ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানা।

হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত সুলেমান পর্বতশ্রেণী (সফেদ কোহ, সুলেমান, কীরথর) দক্ষিণে আরব সাগরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সুলেমান পর্বতশ্রেণী উত্তর-পশ্চিমে মোড় লইয়া ইরাণের উপকূল ধরিয়া (জাগ্রোস নামে পরিচিত) আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রন্থিতে মিশিয়াছে। ইরাণের উত্তরের পর্বতশ্রেণীর কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিকের অংশ এলবোরজ নামে পরিচিত।

পশ্চিমে সিন্ধুনদ ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের সীমার মধ্যে বিস্তৃত হিমালয় ভূখণ্ডের আয়তন সোয়া দুই লক্ষ বর্গ মাইল। এই অঞ্চলটির পশ্চিম অংশে কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশের ছয়টি জেলা। পার্বত্য পাঞ্জাবের তিনটি জেলা কাংড়া, সিমলা, লাহাউল-স্পিটি এবং উত্তর প্রদেশের আটটি জেলা, উত্তর কাশী, চামোলী, পিথোর গড, তেহরি গাড়োয়াল, আলমোড়া, দেরাদুন গাড়োয়াল

এবং নৈনিতাল। শেষের তিনটি জেলা কুমায়ুন নামে পরিচিত। পশ্চিম হিমালয়ের সীমা এইখানে শেষ হইয়াছে।

পূর্ব হিমালয়ের সীমার মধ্যে পড়ে নেপাল, সিকিম, ভুটান ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী।

নেপাল

নেপালের উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে বিহারের পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, চম্পারণ, উত্তর প্রদেশের গোরখপুর, পশ্চিমে কালী নদী ও কুমায়ুন, পূর্বে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং।

দৈর্ঘ্যে ৫২৫ মাইল, প্রস্থে ১৪০ হইতে ৯০ মাইল ৫৪০০০ বর্গমাইল আয়তনের দেশ। লোকসংখ্যা চুরাশি লক্ষের অধিক। নেপালের সঙ্গে তিব্বতের সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৫২৫ মাইল।

উত্তরের পর্বতশ্রেণী ও উপত্যকায় তিব্বতী গোষ্ঠীর ভোটিয়াদের বাস। পশ্চিম অঞ্চলে খশ, গুরুং, মাগারদের বসতি। ইহাদের মধ্যে তিব্বতী সংমিশ্রণ আছে। মধ্যের উপত্যকা অঞ্চলে মুসি, গোর্খা, নেওয়ারদের বাস। পূর্ব অঞ্চলে কিরাতি, লিম্বু, লেপচাদের বসতি। ইহারা ছাড়া তরাই অঞ্চলে থারু, বোকরা প্রভৃতি মিশ্র গোষ্ঠীর উপজাতি আছে। ব্রাহ্মণ ও ছত্রি আছে নেপালের অধিবাসীদের মধ্যে। গোর্খা ও নেওয়ার ভারতের সমতল অঞ্চল হইতে নেপালে আসিয়াছিল। গোর্খাদের মধ্যে কিছু সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

মুসলমান শাসনকালে গোর্খারা রাজপুতানার বাসভূমি ত্যাগ করিয়া কুমায়ুনে বাস করিতেছিল। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোর্খা রাজা পৃথ্বিনারায়ণ নেপাল জয় করেন। নেপালের অধিবাসীরা হিন্দু ও বৌদ্ধ, ভাষা প্রধানতঃ নেপালী পার্বতীয়। ইহা সংস্কৃত গোষ্ঠির ভাষা।

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্তু নেপালের মধ্যে। সম্রাট অশোক নেপালে তীর্থ পরিক্রমায় গিয়াছিলেন। বহু পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য নেপাল দর্শনে গিয়াছিলেন।

মুসলমান ও ইংরাজ আমলে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিলেও প্রাচীন কাল হইতে নেপাল ভারতবর্ষের অঙ্গরূপে বিবেচিত হইয়াছে। মুসলমান

শাসনকালে লোকে বিপদগ্রস্ত হইয়া সমতল অঞ্চলের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হইবার ভয়ে কেহ কেহ মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থরাজি সঙ্গে লইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে এই সকল গ্রন্থ রক্ষিত আছে।

ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসন হইতে মুক্ত হইবার পরে নেপালের পূর্বের প্রশাসনিক ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সেই পরিবর্তন ঘটাইতে ভারত সরকার সাহায্য কবিয়াছে। চীন তিব্বতে ক্ষমতা দখল করিবার পরে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বহেতু ভারতবর্ষ ও নেপালের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সিকিম

নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত, সিকিম বৌদ্ধ রাজ্য।

সিকিমের আয়তন ২৭৪৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। সিকিমের উত্তরে তিব্বত। তিব্বতের সঙ্গে সিকিম সীমান্তের দৈর্ঘ্য ১৪০ মাইল। পশ্চিমে সাংগিলা গিরিশ্রেণীর ওপারে নেপালে যাইবার গিরিবর্ত্ম আছে। পূর্বে ডংখিয়ালা পর্বতশ্রেণীর ওপারে চুম্বি উপত্যকা। সিকিম হইতে চুম্বি উপত্যকা হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করিবার গিরিবর্ত্মগুলির মধ্যে নাথুলা (১৪১৪০), জেলেপ-লা (১৪৮৯০) নাম সুপরিচিত।

লেপচারা সিকিমের আদিম অধিবাসী। উচ্চতর অঞ্চলের অধিবাসী ভোটিয়ারা তিব্বতী গোষ্ঠীর। বহু নেপালী (নেওয়ার, গুরুং, লিম্বু) সিকিমে স্থায়ীভাবে বাস করে। সিকিম ভারতের রক্ষণাধীন রাজ্য।

চুম্বি উপত্যকা—হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালের উপরে অবস্থিত সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে সাড়ে নয় হাজার ফুট উচ্চ চুম্বি উপত্যকা আঙুলের মত সিকিম ও ভুটানের মধ্যে কিছু দূর প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব ভারতে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষা করিবার পথ সিকিম সীমান্তে চুম্বি উপত্যকার দুইটি প্রধান গিরিবর্ত্ম নাথুলা ও জেলেপ লা। তিব্বতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিবার গিরিবর্ত্মগুলি চুম্বি উপত্যকায় অবস্থিত বলিয়া ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। দার্জিলিং হইতে চুম্বি উপত্যকার ইয়াটুঙের দূরত্ব ১০২ মাইল। এই উপত্যকা পূর্বে ভুটানের দখলে ছিল।

প্রধান গ্রাম ফারি জোংয়ে (Phari djong) ভারত সরকারের ডাক বাংলো ছিল এবং এখানকার পোষ্ট অফিস বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টাব জেনারেলের অধীন ছিল। বঙ্গদেশের গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে ফারি জোংয়ে এবং আমজো নদীর (তোরসা) উৎপত্তি স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন একবার জেলেপ লা, একবার নাথু লা গিরিবর্ত্ম দিয়া। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভুটানের রাজাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য চুম্বি উপত্যকার ইয়াটুংয়েব পথে ভুটানে গিয়াছিলেন। চুম্বি উপত্যকা এখন তিব্বতের জবরদখলিকার চীনের দখলে এবং এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সেখানে অবস্থান কবিয়া ভুটান ও সিকিমের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কার সৃষ্টি কবিতেছে।

ভুটান

ভুটানের উত্তরে তিব্বত। তিব্বতেব সঙ্গে ভুটানের সীমানার দৈর্ঘ্য ৩০০ মাইল। দক্ষিণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ভুটানেব সীমানা ২০০ মাইল দীর্ঘ। পশ্চিমে সিকিম ও দার্জিলিং জেলা, পূর্বে উত্তব-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী। আয়তন ১৯৩০৫ বর্গমাইল, জনসংখ্যা প্রায় সোযা ছয় লক্ষ।

আসামের দারাং রাজাদেব বংশাবলীর সূত্রে জানা যায় ভুটান কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পবে কোচবিহার রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠিলে ইহা কোচবিহার রাজ্যের অধীনে আসে। কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহের (১৬শ শতাব্দী) তৃতীয় পুত্র নরসিংহ ভুটানের শাসনকর্তা ও পরে রাজা হইয়াছিলেন। স্যর এশলে এডেন তাঁহার ভুটান মিশনের রিপোর্টে বলিয়াছেন, "Apparently the Bhutiyas have not possessed Bhutan for more than two centuries, it belonged formerly to a tribe called by the Bhutiyas Tephui. They are believed to have been the people of Koch Bihar. The Tephuis were driven down into the plains by some Tibetan soldiers who have been sent from Lhasa to look at the country."

নরসিংহ ভুটানে রাজত্ব করিয়াছিলেন ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ১৬৬২ অব্দে বাংলার সুবেদার মীর জুমলা কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ এবং আসামের আহোম রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন।

প্রাণনারায়ণ পরাজিত হইয়া ভূটানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মীর জুমলার এই অভিযান সফল হয় নাই, ভগ্নাবশেষ সৈন্যবাহিনী লইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। প্রাণনারায়ণ ইতিমধ্যে ভূটান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোচবিহারে মীর জুমলা যে পাঁচ হাজার সৈন্যবাহিনী স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন (১৬৬৩)।

ভূটান এই সময়ে কোচবিহার রাজের দখলে ছিল। আহোমগণ আসামে শক্তিশালী হইবার পূর্বে নিম্ন ও উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, কাছাড়, জয়ন্তিয়া, মণিপুর, শ্রীহট্টের রাজারা কোচবিহার রাজ শিলরায়ের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং গারো পাহাড, জলপাইগুড়ি, রংপুর ও দিনাজপুর তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূ্ত ছিল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভুটিয়া সৈন্য কোচবিহার আক্রমণ করিলে ভুটান ইংরাজের সংস্পর্শে আসে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আসাম ভারতের ব্রিটিশ শক্তির দখলে আসিবার পরে ভূটানের সঙ্গে লডাই হয় এবং আসাম ও বাংলা ডুয়ার্স (গিরিবর্ত্ম) ইংরাজের দখলে আসে।

টেফুইদিগকে বিতাড়িত করিয়া তিব্বতী আগন্তুকরা দেশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্য হইতে পেনলোপ বা ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। নামে মাত্র দালাই লামার বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইহারা স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিল। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ দুই সম্প্রদায়ের দ্বারা শাসিত, লামা সম্প্রদায় ও পেনলোপ সম্প্রদায়। পূর্বে তিব্বতে দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামা নির্বাচন ব্যবস্থা অনুকরণ করিয়া ভূটানে ধর্মরাজাও দেবরাজা নির্বাচিত হইত পেনলোপ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে। বর্তমানে এ ব্যবস্থা বন্ধ হইয়াছে, তংশায় পেনলোপ এখন বংশ পরম্পরায় ভূটানের রাজা।

দেশের অধিবাসীরা অধিকাংশ তিব্বতী গোষ্ঠীর, ধর্মে বৌদ্ধ বা লামাধর্মী। সমতল অঞ্চলে চায়ের কাজে নিযুক্ত নেপালীদের দেখা যায়।

ভূটান হইতে তিব্বতে যাইবার কয়েকটি গিরিবর্ত্ম আছে। আগে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য এই পথে চলিত, এখন বন্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে ভূটানের থিম্পু পর্যন্ত রাস্তার যোগাযোগ হইয়াছে ১৯৬৩ অব্দে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ নয়, ভারতবর্ষের এলাকা। ভুটানের পূর্বে অবস্থিত এই অল্পপরিচিত এজেন্সী হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষের সীমান্ত এলাকা বলিয়া এই অঞ্চলের কথা এখানে বলা হইতেছে। ইহা শুধু দুর্গম নয়, প্রায় অপরিচিত, অবহেলিত এলাকা। এই অবহেলিত এলাকার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে দুইটি কারণে। চীনাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দালাই লামার ভারতে আশ্রয় লইবার অভিপ্রায় ভারত সরকার অনুমোদন করিলে তিনি এই এলাকার কামেং বিভাগের বমডিলার পথে ভারতে পৌঁছিয়াছিলেন। অন্য কারণ ১৯৬২ অব্দে ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম করিয়া চীনাদের ব্যাপকভাবে নেফা আক্রমণ। তারপর হইতে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, অধিবাসীদের অবস্থার উন্নয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে।

নেফার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে তিব্বত, পশ্চিমে ভুটান, দক্ষিণে আসাম, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশ। সবটাই পর্বতময়। আয়তন ৩১৪৩৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। ত্রিশটি ভাষা উপজাতীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

এই অঞ্চলে অধিবাসীরা ভুটান ও সিকিমের অধিবাসী হইতে ভিন্ন গোষ্ঠীর। একদিকে উত্তর ব্রহ্মের উপজাতি, অন্যদিকে আসামের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিগুলির সঙ্গে ইহাদের গোষ্ঠী-সম্পর্ক আছে। সাধারণতঃ নাক ও মুখ চেপ্টা, গালের হাড় উচ্চ, মুখ ও দেহে রোমের অপ্রাচুর্য, চক্ষু তির্যকভাবে চেরা, গায়ের রং বাদামি। ধর্মে ইহারা এনিমিষ্ট।

কিছুকাল আগে টুয়েনসাঙ বিভাগকে নেফা হইতে পৃথক করিয়া নাগাভূমি গঠন করা হইয়াছে। বর্তমানে নেফা পাঁচটি বিভাগ লইয়া গঠিত, ভুটানের পূর্বে কামেং (প্রধান শহর বমডিলা), সুবানসিরি (জিরো), সিয়াং (আলং), লোহিত (তেজু) এবং টিরাপ (খংশা)। লোহিত বিভাগের উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণ-পূর্বে টিরাপ। লোহিত ও টিরাপ হিমালয়ের বহির্ভূত পাটকোই হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত।

কামেং বিভাগে টোয়াংয়ের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ অবস্থিত। অধিবাসী

প্রধানতঃ মনপা ও দাফলা উপজাতি। সুবানসিরির অধিবাসী আপাতানি, তাগিন, গালং, দাফলা ও সিরি। সিয়াংয়ের অধিবাসী আবর, গালং, মিনিয়ং, আশীং, শীমং, তাঙ্গাম, বোরি, বোকার। লোহিতের অধিবাসী মিশমি।

ভারতবর্ষের সমগ্র পূর্ব সীমান্ত পর্বতময় অঞ্চল। নেফার লোহিত ও টিরাপ অঞ্চল, আসামের পার্বত্য অঞ্চল, টুয়েন সাং, মণিপুর লুসাই অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে সকল পর্বতশ্রেণী ছড়াইয়া রহিয়াছে উত্তর ব্রহ্মের আরাকোমা ইয়োমা তাহাদের সম্পর্কিত। ভারতবর্ষ হইতে উত্তর বর্মায় যাইবার কয়েকটি পথ এই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত, টুজু গ্যাপ, মণিপুরের পথ, টাজুপ গিরিবর্ত্ম।

হিমালয়ের প্রাচীরের দ্বার

প্রাচীরের দ্বার অর্থ গিরিবর্ত্ম।

উত্তর-পশ্চিমের প্রধান দুইটি দ্বার খাইবার ও বোলান গিরিবর্ত্ম। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের মধ্যে অবস্থিত খাইবার পর্বতশ্রেণীর মধ্যে খাইবার গিরিবর্ত্ম। দৈর্ঘ্য ৩৩ মাইল। রেল লাইন হইয়াছে। বেলুচীস্তানের সীমান্তে কীরথর পর্বতশ্রেণীর মধ্যে বোলান গিরিবর্ত্ম। দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল। গোমাল গিরিবর্ত্ম খাইবারের দক্ষিণে। মাক্রাণের উপকূল ধরিয়া প্রবেশ করিবার পথ আছে।

কাশ্মীরের জোজি-লা লাডাকের রাজধানী লেহ যাইবার পথ। কারা-কোরাম গিরিবর্ত্ম লেহ হইতে তিব্বতে যাইবার পথ। গিলগিট হইতে আমুদরিয়া অঞ্চলে যাইতে বুজিল ও রাজদিয়াগণ গিরিবর্ত্ম।

সিমলার উত্তরে শতদ্রু নদী ধরিয়া অগ্রসর হইলে শিপকি লা (১৫৪০০)। ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্য পথরূপে এই পথ বহুকাল ব্যবহৃত হইতেছে। এই পথ পশ্চিম তিব্বতের গারটক শহরে পৌছিয়াছে। শিপকি লা হইতে গারটকের দূরত্ব ১০০ মাইল। শিপকি লা হইতে পূর্বদিকে কামেট গিরিশৃঙ্গ অঞ্চলে নিতি ও মানা গিরিবর্ত্ম। কুমায়ুনে ভারত সীমান্তে জুংরি বিংরি, দর্মা ও লিপুলেখ। এইগুলি মানস সরোবর ও কৈলাসে যাইবার পথ।

সিকিমের সুপরিচিত নাথু লা ও জেলেপ লা ছাড়া তোরসা নদীর উপত্যকায় টালাং গিরিবর্ত্ম হইয়া তিব্বতে যাইবার প্রাচীন পথ আছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীতে তিব্বতে যাইবার পথ বম লা (১৪২০৯)। আসামের সমতলে নামিবার পথ ইহা। অন্য গিরিবর্ত্ম ৎসে লা (১৫০০০)।

ব্রহ্মদেশ

স্থলপথে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের মধ্যে দক্ষিণে প্রলম্বিত বৃহৎ উপদ্বীপের ব্যবধান। এই উপদ্বীপের উত্তর অংশে ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দো-চীন। আগেকার দিনে ইন্দো-চীনের ফরাসী শাসকগণ ব্রহ্মকে ব্রিটিশ ইন্দো-চীন বলিয়া উল্লেখ করিতেন। উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ মালয় উপদ্বীপ নামে পরিচিত।

প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে সংযোগের বড় ইতিহাস আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে উপজাতি প্রবাহের অনেক ধারা উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। একদা তাহার সৈন্যবাহিনী আসাম উপত্যকা দখল করিয়া শাসন বিস্তার করিয়াছিল। নিম্ন ব্রহ্মে ভারতীয় শাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম, সংস্কৃতি ও উপনিবেশ বিস্তার হইয়াছিল ব্রহ্মে।

"বিদেশে ভারতবর্ষের অধিবাসী" অংশে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের প্রাচীন সম্পর্কের কথা কিছু বলা হইয়াছে, সেজন্য এখানে আর কিছু বলা হইল না।

সিংহল

ভূবিজ্ঞানিগণের মতে সিংহল দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপের অংশ, "a detached portion of the Deccan plateau, very nearly joined to India by sandbanks and rocks known as Adam's bridge." ব্যবধান ২২ মাইল মাত্র (ধনুষ্কোটি হইতে তালাই মান্নার)। সিংহলের পর্বতশ্রেণীর প্রকৃতি দক্ষিণী মালভূমির পর্বতশ্রেণীর প্রকৃতির অনুরূপ ; "same old, hard, crystalline rocks as in Deccan."

সিংহল দ্বীপের আয়তন প্রায় ২৫৪৮১ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ। অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলী, তারপর তামিল, পর্তুগীজ

ও ডাচ (বার্গার, Burgher মিশ্র), মুর বা আরব ও আফ্রিকান ও মালয়ী মুসলমান। কিছু চীনা ও য়ুরোপীয় আছে। আদিম অধিবাসীরা বেদ্দা গোষ্ঠীভুক্ত।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসের মতে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের (বঙ্গদেশ ?) বিজয় সিংহ নামে এক রাজপুত্র লঙ্কা জয় করিয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহ উপাধি হইতে বিজেতা ও তাঁহাব অনুচরদের বংশধরগণ সিংহলী নামে পরিচিত। সিংহলীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং সিংহলেব বর্তমান প্রধান ধর্ম বৌদ্ধধর্ম।

ইহার পরবর্তীকালে তামিলরা উত্তর সিংহলেব বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করিয়া আপনাদিগকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। চা ও রবার ক্ষেতের মজুররূপে পরে বহু সংখ্যক তামিল সিংহলে প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা হিন্দু।

সিংগলের শতকরা আশি ভাগ অধিবাসী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে ভাবতবর্ষের অধিবাসীদের গোষ্ঠীভুক্ত।

ইসলামধর্মী আরব ও আফ্রিকান ব্যবসায়ী, মালয়ী ব্যবসায়ী ও মৎসজীবি শ্রেণীব সঙ্গে সিংহলে ইসলাম আসিয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম আসিয়াছিল ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ও ডাচ ব্যবসায়ীরা দেশের একাংশ অধিকার কবিবার পর হইতে। ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে সিংহলের য়ুরোপীয় উপনিবেশগুলি এবং ১৮১৫ অব্দে কাণ্ডির স্বাধীন সিংহলী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব সুযোগে সমগ্র সিংহল ইংরাজের দখলে আসিয়াছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের য়ুরোপীয় উপনিবেশগুলি আগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীব অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৮০২ অব্দে এগুলিকে মাদ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্রাউন কলোনিতে পরিণত করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পরে ইংরাজরা সিংহল ত্যাগ করিয়াছে।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হইতে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের দিক হইতে সিংহল ও সিংহলীদের ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী হইতে পৃথক মনে করা যায় না, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দিক হইতে সিংহলকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নহে।

চীন

এশিয়াব যে সকল দেশ প্রাচীন যুগে সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল চীন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। চীন ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ প্রতিবেশী ছিল না, তিব্বত ও বর্মার প্রতিবেশী। সম্প্রতিকালে তিব্বত জবরদখল করিয়া চীন ভারতের সীমান্তে পৌছিয়াছে।

প্রতিবেশী দেশ না হইলেও এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যে চীনের যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হইতে প্রমাণ হয় তিব্বত ও বর্মার ব্যবধান থাকিলেও প্রাচীন যুগে চীন ও ভারত পরস্পরের অপরিচিত ছিল না।

একজন পণ্ডিতের মতে দেশের চীন নাম যে নামে উহা বহির্জগতের নিকট পরিচিত, সেই নামে ভারতবর্ষের নিকট প্রথম পরিচিত হয়। চীনের অভিজাত সম্প্রদায়ের মান্দারিন নামটি সংস্কৃত মন্ত্রীন হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত চীন নামটি সিন (Tsin) রাজবংশের নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। সিন রাজবংশ (খ্রীঃ পূঃ ২৫৫—২০৬) বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত চীনদেশকে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে আনিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের সহিত চীনের পরিচয় খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে, অর্থাৎ হ্যান যুগে ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়ে ভারতবর্ষে মৌর্য যুগ চলিতেছিল।

প্রাচীন সাহিত্যে চীনেব উল্লেখ: প্রাচীন সাহিত্যে চীনের যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হইতে চীনদেশ ও চীন জাতির সম্বন্ধে কোন খবর পাওয়া যায় না। মহাভারতের আদি, সভা, উদ্যোগ, বন, ভীষ্ম ও শান্তি পর্বে চীনের উল্লেখ মিলে। প্রাগজ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের সঙ্গে চীনাদের সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে অনেক স্বর্ণালঙ্কারধারী চীনা সৈন্য ছিল। ভগদত্ত চীনা ও কিরাত সৈন্য পরিবৃত হইয়া অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি দুর্যোধনের পক্ষে এক অক্ষৌহিনী চীনা ও কিরাত সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। ভীষ্ম পর্বে যবন, চীন, কম্বোজদিগকে দেশের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী বলা হইয়াছে। সভাপর্বে দেখা যায় পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে চীনারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

বনপর্বে দেখা যায় শক, হুন, হারহুন, যবন, তুষার প্রভৃতি জাতি রাজসূয় যজ্ঞে আহুত হইয়া পরিবেশক মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। শান্তিপর্বের যে সকল জাতি ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা মানিয়া চলিত তাহাদের তালিকায় যবন, শক, তুষারদের সঙ্গে চীনাদের নাম পাওয়া যায়। উদ্যোগপর্বে দেখা যায়, ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের সম্মানার্থ তাঁহাকে চীন দেশোদ্ভব এক সহস্র ঘোটক উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পর্বে দেখা যায়, ভীম দুর্যোধনের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন তিনি হৈহয়দিগের উদাবর্ত, তালজঙ্ঘদিগের বহুল, বিদেহদিগের হয়গ্রীব, চীনাদিগের ধৌতমূলক প্রভৃতির ন্যায় অষ্টাদশ ভূপতিবংশের কলঙ্কস্বরূপ ; ইহারা যুগান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় জাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন করিয়াছে। চৈনিক ভূপতিবংশের ধৌতমূলকের কাহিনীর আর কিছু জানা যায় না। বশিষ্ঠের গাভী হইতে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির কথা রামায়ণ ও মহাভারতে আছে। মহাভারতের আদিপর্বে বশিষ্ঠের গাভী নন্দিনী হইতে যবন, পুলিন্দ, চীন প্রভৃতির উৎপত্তির কথা আছে। রামায়ণের এই কাহিনীতে চীনের উল্লেখ নাই। গোরেসীয় রামায়ণে বর্বর ও তুষারদিগের সঙ্গে চীন ও অপর চীনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় কয়েকটি জাতির উল্লেখ আছে যাহারা ক্রিয়ালোপহেতু এবং ব্রাহ্মণের দর্শন না পাইয়া বৃষল বা শূদ্র হইল। তালিকায় পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পহ্লব, খশদিগের সঙ্গে চীনাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাভারতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এবং শক, যবন, পারসীক, তুষার হুণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির সঙ্গে চীনাদের কয়েকবার উল্লেখ হইতে এই অনুমান করা যায় যে, মহাভারত রচনার যুগে একটি পৃথক গোষ্ঠীরূপে তাহারা এদেশে বাস করিত এবং তাহাদের গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ভারতীয়দিগের সঙ্গে মিশিয়া যায় নাই। ভারত ও চীনের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কও কিছু ছিল। চীন রাজ বংশোদ্ভব ধৌতমূলকের সঙ্গে দুর্যোধনের তুলনা হইতে চীনের ইতিহাসের সঙ্গে কিছু পরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অভিজ্ঞান শকুন্তলায় চীনাংশুকের উল্লেখ (চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য) হইতে অনুমান করা যায় চীনা রেশম বস্ত্র ভারতে পরিচিত ছিল।

ঐতিহাসিকযুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক সংযোগের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকের মধ্যভাগে (হান যুগে)।

ভৌগোলিক পরিচয় : চীনের ভৌগোলিক পরিচয় ও অধিবাসীদের জাতি পরিচয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

চীনাদের দেওয়া তাহাদের দেশের একটি নাম "সি-পাং-সে", অর্থাৎ আঠারো প্রদেশ। খাস চীন দেশ (China proper) এই আঠারোটি প্রদেশ লইয়া গঠিত। খাস চীন ভারতবর্ষ অপেক্ষা আয়তনে বড় দেশ নয়। হিয়েং-নুদের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য হান আমলে যে প্রাচীর (Great Wall of China) সমগ্র উত্তর সীমানা হইতে কানসুর পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত তৈয়ারী হইয়াছিল সেই প্রাচীরকে খাশ চীনের উত্তর সীমানা বলা যাইতে পারে। উত্তর-পূর্বের বৃহৎ সমতল অঞ্চল ও ইয়াংসির সমতল অঞ্চল বাদে চীন দেশ পর্বতসমাকীর্ণ। ভারতবর্ষের মত চীনেও মৌসুমি বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু চীন ট্রপিকসের বাহিরে। উত্তর ও দক্ষিণ চীনের আবহাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। শীতের সময় উত্তরাঞ্চলে অত্যধিক শীত পড়ে, দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষাকৃত গরম। ভারতবর্ষের মত চীন কৃষিপ্রধান দেশ। দুই দেশেই প্রচুর জমি ও চাষী থাকিলেও মাঝে মাঝে খাদ্যাভাব ঘটে। চীনের সর্বাপেক্ষা বড় প্রদেশ সেচুয়ান পশ্চিমে তিব্বতের সীমানা স্পর্শ করিয়াছে। ইউন্নানের দক্ষিণে বর্মা, পশ্চিমে তিব্বত ও বর্মা। ইউন্নান হইতে বর্মার ভামো পর্যন্ত রাস্তা আছে এবং পশ্চিমে ইউন্নান হইতে তিব্বত পর্যন্ত রাস্তা আছে।

খাস চীনের বাহিরে যে সকল দেশ ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাচক্রে চীনাদের দখলে আসিয়াছে সেগুলির নাম মাঞ্চুরিয়া, মোঙ্গলিয়া,পূর্ব তুর্কীস্তান এবং সর্ব শেষ তিব্বত।

এই অ-চীনা দেশগুলি দুইটি কিছুটা ভাগ্যের অনুকূলতা, কিছুটা বিশিষ্ট চৈনিক উপনিবেশ স্থাপনের জনসংখ্যার চাপ প্রয়োগের মৌলিক ও প্রাচীন নীতির ফলে চীনাদের হস্তগত হইয়াছে। বাকী দুইটি হস্তগত করিতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। এইগুলিকে চীনের Outer Territory বলা হয়। অধিকৃত দেশগুলি আয়তনে খাস চীন-অপেক্ষা দেড়গুণ বড়।

৩৬৩৬০০ বর্গ মাইল আয়তনের মাঞ্চুরিয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত অল্প সংখ্যক উপজাতি বাদে মাঞ্চুজাতি এখন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। মাঞ্চুরা প্রাচীন কায়া কিতান গোষ্ঠী (মিশ্র মোঙ্গল-তুর্কী) হইতে উদ্ভূত। ট্যাং বংশের যুগে কায়া কিতান শক্তি প্রবল হইয়া চীনের উত্তরের প্রদেশগুলি আক্রমণ করিতে

থাকে। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে মিং যুগের শেষের দিকে দেখা যায় মাঞ্চুজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। দুইজন চীনা সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে বিবাদের সুযোগে মাঞ্চুরিয়ার রাজা তিন-নিং সসৈন্যে চীনে প্রবেশ করিয়া রাজধানী দখল করিয়া বসিলেন এবং সু-চে নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে চীনের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৬৪৪)। ১৯১১ পর্যন্ত বিদেশী মাঞ্চু রাজবংশ চীনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিপ্লবের ফলে চীনে মাঞ্চু শাসনের অবসান হইলে শাসকজাতির দেশ মাঞ্চুরিয়া চীনের নব-প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রী সরকারের হাতে আসিল।

বিরলবসতি দেশে উত্তরের প্রদেশগুলি হইতে ঔপনিবেশিকদল প্রচুর সংখ্যায় মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছে। বিপ্লবের পরে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া রেলপথ খুলিয়া, কৃষি ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া অনগ্রসর দেশের প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল। দেশ চীনাদের হাতে ফিরিয়া আসিবার পরে ইহার সকল সুবিধা তাহারা ভোগ করিতেছে।

চীনের আর একটি প্রতিবেশী দেশ মোঙ্গলিয়ার আয়তন ১৩৬৭৬০০ বর্গ মাইল। উত্তরে সাইবেরিয়া, দক্ষিণে কানসু ও সে-কিয়াং। দেশের কেন্দ্রস্থলে গোবি সমভূমি।

খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কারা খিতান এবং নয়-চে তাতারগণ (Golden Dynasty) মাঞ্চুরিয়া ও চীনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ১২শ শতাব্দী হইতে কিন তাতারদের অধীন চীনে মোঙ্গলদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিজ খান উত্তরের প্রদেশগুলি দখল করিয়া চীনে মোঙ্গল বা ইউয়েন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। একশত বৎসরের উপর এই রাজবংশ স্থায়ী হইয়াছিল।

কুবলাই খান দক্ষিণ চীনের প্রদেশগুলি দখল করিয়া সমগ্র চীন দেশ মোঙ্গল শাসনের অধীনে আনিয়াছিলেন। কোরিয়া ও ইন্দো-চীনে তাঁহার শাসন বিস্তৃত হইয়াছিল।

চীনে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অবসানের পরে (১৩৬৮) মোঙ্গল গোষ্ঠীর দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। যাযাবর মোঙ্গল গোষ্ঠীর এবং কালমুক গোষ্ঠীর মাত্র কয়েক লক্ষ অধিবাসী ছিল বিরল বসতি, মরুময়, বিরাট আয়তনের দেশে।

মাঞ্চু যুগে মোঙ্গলিয়ায় চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দলে দলে চীনারা মোঙ্গলিয়ায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। একজন ঐতিহাসিক বলিতেছেন, "In the present times there has been an extension of Chinese immigrants and a large part of what was known as Mongolia extending from China proper and Manchuria to the Gobi desert, is now indistinguishable from Chinese territory. The Chinese settlers are invading the Gobi desert."

মাঞ্চুবংশের পতন হইলে মোঙ্গলিয়ার এক অংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে এবং রুশিয়ার সাহায্যে স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে।

দেখা যাইতেছে যে দুইটি বিরাট আয়তনের দেশ, যে দুইটি দেশের অধিবাসীরা সাড়ে তিন শত বৎসরের বেশী চীনদেশ শাসন করিয়াছিল, তাহারা হৃতশক্তি হইবার পরে তাহাদের দেশ বিনা যুদ্ধে চীনের কুক্ষিগত হইল। এ রকম সৌভাগ্যের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

পূর্ব তুর্কীস্তানের (সিংকিয়াং) আয়তন ৫৫০৩৪০ বর্গ মাইল। ইহা বিভিন্ন তুর্কী ও মোঙ্গল উপজাতির (উইগুর, কালমুক, খিরগিজ, তুঙ্গুজ, তরাঞ্চি প্রভৃতি) দেশ। প্রাচীন যুগে এই দেশ এবং উত্তরের অঞ্চলগুলি হিয়েংনুদের দখলে ছিল।

হান সম্রাট উ-তি (খ্রীঃ পূঃ ১৪০) তারিম অববাহিকার মধ্য দিয়া পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে রেশমের বাণিজ্য চালাইবার অভিপ্রায়ে পূর্ব তুর্কীস্তানে সৈন্যদল পাঠাইয়াছিলেন। এই বাণিজ্য পথ রক্ষা করিবার জন্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা সম্ভবত বিশেষ কার্যকরী হয় নাই; কারণ, খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট মিং-তিকে (ইঁহার) রাজত্বকালে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন হয়) সেনাপতি পান চাওকে হিয়েংনুদের বিরুদ্ধে পাঠাইতে হইয়াছিল। পান চাওয়ের চেষ্টার ফলে কুচা, খোটান, কাশগর প্রভৃতি রাজ্য চীনের আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ইতিহাসে দেখা যায় বারবার তুর্কীস্তানের রাজ্যগুলি চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে।

৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে দেখা যায় সমগ্র অঞ্চল তিব্বতের দখলে আসিয়াছে। পশ্চিম চীনের কয়েকটি অঞ্চলও তিব্বতীরা দখল করিয়া লইয়াছিল। ৯ম

শতাব্দীতে এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী উইগুর জাতি প্রবল হইয়া উইগুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উইগুর শক্তি দুর্বল হইলে দেশ কারা কিতানদের হাতে গেল। কিতানরা চীনের কয়েকটি প্রদেশ দখল করিয়া লইয়াছিল এবং মাঞ্চুরিয়ায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে সমগ্র অঞ্চল চেঙ্গিজ খানের এক পুত্র চাঘতাইয়ের এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদের হাতে আসে। চেঙ্গিজ খানের এক পৌত্র তখন চীনের সম্রাট। মোঙ্গল শক্তির পতন হইলে পূর্ব তুর্কীস্তানের বিভিন্ন রাজ্যগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। প্রায় দুই শতাব্দীকাল স্বাধীনতা ভোগ করিবার পরে মাঞ্চু সম্রাট কাঙ্‌হের শাসনকালে দেশে আবার চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঞ্চুশক্তির পতনের পরে দেশে পুনঃ পুনঃ চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, রাজ্যগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনারা আবার পূর্ব তুর্কীস্তানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

পশ্চিম তুর্কীস্তানের তুর্কী রাজ্যগুলি (Khanates) যেমন রুশিয়ার ফরোয়ার্ড নীতির ফলে লোপ পাইয়াছে, পূর্ব তুর্কীস্তানের স্বাধীন রাজ্যগুলি (Amirates) সেইরূপ চীনের ফরোয়ার্ড নীতির ফলে লোপ পাইয়াছে। মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গলিয়ার মত পূর্ব তুর্কীস্তানেও চীনাদের প্রাচীন massive colonisation-এর নীতি অনুসৃত হইতেছে বিরল বসতি দেশের অস্থির অধিবাসীদিগকে দমনে রাখিবার জন্য। পর দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া চীনারা কখনও সন্তুষ্ট রহে না। অধিকৃত দেশকে চীনা ভূমিতে পরিণত করিবার ইচ্ছা তাহাদের মজ্জাগত।

সম্প্রতিকালে চতুর্থ যে দেশটি চীনের কুক্ষিগত হইয়াছে তাহা ৪৬৩২০০ বর্গ মাইল আয়তনের বিরল বসতিদেশ তিব্বত।

ইতিহাসে দেখা যায় দুইবার চীনা বাহিনী তিব্বত আক্রমণ করিয়া দেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা হরণ করে নাই। একবার ১৩শ শতাব্দীতে চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খানের সময়ে এবং দ্বিতীয়বার ১৭শ শতাব্দীতে চীনের মাঞ্চু সম্রাট কাঙ্‌হের সময়ে চীনা বাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিল।

চীনের কর্তৃত্ব ছিল নাম মাত্র, দেশের শাসন, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবহার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

তিব্বতের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা রক্ষা পাইবার একটি কারণ ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির উপস্থিতি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে তিব্বতে রুশিয়ার আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া ব্রিটিশ শক্তি সতর্ক দৃষ্টি রাখিত তিব্বতের উপরে। তিব্বতে চীনেব প্রভাব বিস্তৃতিও ব্রিটিশ শক্তি সুদৃষ্টিতে দেখিত না। স্যর ইয়ং হাজবেণ্ডের সামরিক অভিযান তাহার প্রমাণ।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুবংশের পতনের পরে তিব্বত নিজের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের স্বাধীনতার-রক্ষা-কবচ ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিল। দুই বৎসর পরে চীনা বাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করিল। মাঞ্চুরিয়া, মোঙ্গলিয়া, পূর্ব তুর্কীস্তানে অনুসৃত প্রাচীন massive colonisation-এর নীতি তিব্বতেও অনুসরণ করা হইতেছে।

চীনের অধিবাসী : চীনারা চীনের আদি অধিবাসী নয়, মূল চীন গোষ্ঠী বাহির হইতে আসিয়াছিল পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করেন। কোন্ অঞ্চল হইতে তাহারা আসিয়াছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে।

হোনান (উত্তর-পূর্ব চীন) এবং কানসুতে (উত্তর-পশ্চিম চীন) যে নিয়োলিথিক বা নূতন প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই সভ্যতা অনুমান খ্রীঃ পূঃ চার হাজার বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বলা হইয়াছে। এই প্রোটো-চীনা যুগের সভ্যতার বাহক কাহারা জানা যায় নাই।

কৃষিকার্যরত সভ্য চীনা গোষ্ঠী সম্ভবতঃ কানসুর উত্তরের অঞ্চল হইতে চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে তাহারা দক্ষিণে পেই-হো এবং উত্তরে ইয়াংসির উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। পরবর্তীকালে দেশের আদি অধিবাসীদের বিতাড়িত করিয়া তাহাদের বাসভূমি দখল করিয়াছে।

চীনা জাতি প্রধানতঃ মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের (mesocephalic), নাসিকা সরল ও উন্নত নয় (mesorrhine), গাত্রবর্ণ পীত, দক্ষিণী মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ (Pareoean বা Southern Mongoloid) কিছু আছে। মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল, তুর্কী, টুঙ্গুজ, মাঞ্চুরা পুনঃপুনঃ উত্তর চীন আক্রমণ করিয়াছে। ইহাদের সহিত সংমিশ্রণে চীনাদের প্রাচীন টাইপের পরিবর্তন হইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদের মধ্যে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কিছু পার্থক্য

লক্ষিত হয়। দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদের মধ্যে দক্ষিণী মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ বেশী প্রবল। কয়েক শতাব্দী আগে কোয়াংটুংয়ে শান-টাই গোষ্ঠীর আক্রমণ হইয়াছিল। দক্ষিণ চীনের ইউন্নান, কুই-চৌ, কোয়াংসে ও কোয়াংটুংয়ের অধিবাসীদের মধ্যে মিশ্র অধিবাসীদের (the Punti) সংখ্যা প্রচুর।

চীনের আদি অধিবাসীদের দক্ষিণ ও পশ্চিম চীনে বিচ্ছিন্ন উপজাতিরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। লোলো বা নোস্থ উপজাতিকে সেচুয়ান ও ইউন্নানে দেখা যায়। ঐ অঞ্চলের সিও-সে উপজাতি এবং উত্তরের সমতল অঞ্চলে দীর্ঘকায় মো-সো উপজাতিদিগকে দেখা যায়। এই উপজাতিগুলির নাসিকা উন্নত, চোখ তির্যক নয় এবং গাত্রবর্ণ পীত নয়, কতকটা বাদামি। ইহারা এক গোষ্ঠীয় (লম্বামুণ্ড) এইরূপ অনুমান করা হয়। কোয়াংসে অঞ্চলে এবং দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে অনেক মিও-সে উপজাতি বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। ইহাদিগকে টাই ও বর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া অনুমান করা হয়। কোয়াংটুঙের হাক্কা উপজাতি সম্ভবতঃ ইহাদের সমগোষ্ঠীয়।

রাজনৈতিক ইতিহাস : চীনের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে বলা যায় চীনের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে সিন (T'Sin) বংশের (খ্রীঃ পূঃ ২৫৫-২০৬) আমল হইতে। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে রত বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত দেশে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া সিন বংশের সি-হুয়াং-তে নিজেকে চীনের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। হিয়েংনুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সুবিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্মাণ করিবার কাজ তাঁহার সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল। দেশে প্রাচীন সামন্ত যুগের প্রভাব বিলোপ করিবার জন্য সম্রাট কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত একটি ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশের অধিবাসী, বিশেষ করিয়া অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে, প্রাচীন যুগের প্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্য যে সকল গ্রন্থে প্রাচীন যুগের গুণকীর্তন ছিল তিনি সে সকল গ্রন্থ ধ্বংস করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এই আদেশ পালন না করাতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পরে দেশে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। এই বিশৃঙ্খলা দমন

করিয়া নূতন রাজবংশের (হ্যান বংশ, খ্রীঃ পূঃ ২০৬—২২১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন উ-তে। হ্যান বংশের আমলে চীন প্রথমবার পূর্ব তুর্কীস্তানে সৈন্যবাহিনী পাঠায় এবং ভারতবর্ষ ও পশ্চিম জগতের (ইরাণ, মেসোপটেমিয়া রোমান জগৎ) সঙ্গে চীনের সংযোগ স্থাপিত হয়। চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন হয় হ্যান যুগে।

২২১ খৃষ্টাব্দে হ্যান বংশের কর্তৃত্বের অবসানের পরে দেশ আবার বিভক্ত হইয়া গেল। চার শতাব্দীকাল পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে সংগ্রাম এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতির আক্রমণের ফলে বিপর্যস্ত চীনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল ট্যাং রাজবংশের (৬১৮—৯০৮) প্রতিষ্ঠা হইলে।

হ্যান বংশের রাজত্বকালের মত ট্যাং বংশের রাজত্বকাল চীনের শক্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির যুগ। পূর্ব তুর্কীস্তানের সীমানা ছাড়াইয়া চীনের প্রভাব পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। রোম, ইরাণ, মগধ প্রভৃতি দেশ হইতে চীনের রাজসভায় রাজদূত প্রেরিত হইয়াছিল। এই যুগেই হুয়েন স্যাং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

কিন্তু এ গৌরব বেশীকাল স্থায়ী হয় নাই। মোঙ্গলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় কাবা খিতান গোষ্ঠী প্রবল হইয়া চীনের উত্তর প্রদেশগুলি আক্রমণ করিতে থাকে। ইরাণ জয় করিয়া ইসলামে দীক্ষিত আরব বাহিনী পূর্ব তুর্কীস্তানে হামলা করিতে থাকে। তিব্বত পরাক্রমশালী হইয়া পূর্ব তুর্কীস্তান দখল করিয়া চীনের পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে আক্রমণ চালাইতে থাকে। দেশের কেন্দ্রীয় শাসনশক্তির দুর্বলতার ফলে হ্যান যুগের শেষে যেমন হইয়াছিল দেশ আবার বিভক্ত হইল। কারা খিতান ও কিন তাতার দল চীনের কতকগুলি প্রদেশ দখল করিয়া লইল। ১২শ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের আক্রমণ আরম্ভ হইল। তিন শতাব্দীকাল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পরে মোঙ্গল বা ইউয়েন রাজবংশের অধীনে চীনে আবার কেন্দ্রীয় শাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

এক শতাব্দীকাল মোঙ্গল শাসনের পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। এইরূপ একটি বিদ্রোহের নেতা, একজন শ্রমিকের পুত্র হুং-ভে নাম গ্রহণ করিয়া মিং বংশের (১৩৬৮—১৬৪৪) প্রতিষ্ঠা করিলেন।

১৬শ শতাব্দীতে দেশের বিভিন্ন অংশে তাতার দলের আক্রমণ চলিতেছিল। জাপানী নৌ-বাহিনী চীনের উপকূলবর্তী প্রদেশগুলি আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিল। বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল। মিং সম্রাটের দুইজন সেনাপতির মধ্যে কেন্দ্রীয় শক্তি দখলের জন্য বিবাদের সুযোগ লইয়া মাঞ্চু সৈন্য দেশে প্রবেশ করিয়া রাজধানী দখল করিল।

বিদেশী মাঞ্চু রাজবংশের অধীনে (১৬৪৪—১৯১৯) আসিয়া চীনে আবার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মাঞ্চু সম্রাটগণ চীনের হৃত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার দিকে মন দিলেন। পূর্ব তুর্কীস্তানে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইল। কুবলাই খানের পরে এই দ্বিতীয়বার তিব্বতের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইল। মাঞ্চু রাজবংশ শাসিত চীন গৌরবের শিখরে উঠিল সম্রাট কাঙ্‌হের রাজত্বকালে।

১৯শ শতাব্দীর প্রথমদিক হইতে মাঞ্চু রাজশক্তির দুর্বলতার পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল, বিশেষ করিয়া য়ুরোপীয় শক্তিগুলির সঙ্গে বিরোধ বাধিবার ফলে অফিং যুদ্ধ, তাইপিং বিদ্রোহ, বক্সার বিদ্রোহ মাঞ্চুশক্তির দুর্বলতার যুগের ঘটনা। বহু অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল চীনকে য়ুরোপীয় শক্তিবর্গের হাতে। ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে গুরুতর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া দেশে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে মাঞ্চুবংশের পতন হইল এবং দেশে সাধারণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। কার্যত না হইলেও নামে নূতন বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রী সরকারের হাতে মাঞ্চু যুগের ঐক্যবদ্ধ চীন সাম্রাজ্যের শাসনভার আসিল।

১৯১২ হইতে ১৯৪৯ এই কয়েক বৎসর নেতাদের মধ্যে বিবাদ, কুয়ো-মিণ্টাং দল গঠন, গৃহযুদ্ধ, চীনে রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট দলের হস্তক্ষেপে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন, এবং জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে (১৯৩৭—'৪০) কাটিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। দেশের কর্তৃত্ব তখন কুয়োমিণ্টাং বা জাতীয়দলের হাতে। ১৯৪৯ সনে চীনে জনগণের সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইল কম্যুনিষ্ট পার্টি'র নেতা মাও-সে-তুংয়ের নেতৃত্বে।

চীনের জনগণের সাধারণতন্ত্র আজ মাঞ্চু সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী যেমন রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট সরকার রুশিয়ার জারের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক যোগাযোগ আরম্ভ হইয়াছিল মাঞ্চু যুগে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আমলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের ব্রিটিশ সরকার চীনের (জাতীয় দল শাসিত) প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইয়াছিল জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইবার প্রয়োজনে। ১৯৪৭ সনে ভারতে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের সম্পর্কে চীনের নীতির যে পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল তাহা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইতে প্রায় পনের বৎসর সময় লাগিল। নেফা আক্রমণ ১৯৬২ সনের ঘটনা। ভারতের অংশ আকশাই চীন ১৯৪৯ সনেই চীন জবর-দখল করিয়া লইয়াছিল। তিব্বত দখল করিয়া হিমালয়ের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে চীন। সিন রাজত্ব হইতে মাঞ্চু রাজত্ব, এই দুই হাজার বৎসরকাল প্রতিবেশীরূপে চীনের পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে নাই ভারতবর্ষের, এইবার সে সুযোগ আসিয়াছে।

চীনের গৌরবের যুগ চারিটি, হান যুগ, ট্যাং যুগ মোঙ্গল যুগ, মাঞ্চু যুগ। শেষের দুইটি যুগ চীনে বিদেশী শাসনের যুগ।

ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক সংযোগ : ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল হান যুগে পূর্ব তুর্কীস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্য দিয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা হইলে। চীনে প্রবর্তিত হইবার আগে বৌদ্ধধর্ম আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে, পূর্ব তুর্কীস্তানে জনপ্রিয়তা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের এই খ্যাতির কথা হান সম্রাট মিংয়ের কাছে পৌঁছিয়াছিল। সম্রাটের রাজদূত দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষকে চীনে লইয়া গিয়াছিলেন। চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, বৌদ্ধ মঠের প্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রের চীনা ভাষায় অনুবাদ তখন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রমণদের জন্য রাজধানীতে "শ্বেত অশ্ব বৌদ্ধ মঠ" নির্মিত হইয়াছিল। চীনা ভাষায় ত্রিপিটকে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও বৌদ্ধরত্নের অনুবাদ রক্ষিত হইয়াছে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে মহাযান ও সিংহল হইতে হীনযান বৌদ্ধমত চীনে প্রচারিত হইয়াছিল। বহু সংখ্যক ভারতীয় শ্রমণ চীনে গিয়া ধর্ম প্রচারের কাজে এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করিতেন। চীন হইতে বুদ্ধদেবের জন্মভূমি দর্শনার্থী, ধর্মান্বেষী পরিব্রাজক

দল ভারতে আসিতেন এবং প্রচুর শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া চীনে লইয়া যাইতেন। এই পরিব্রাজকদলের মধ্যে ইৎসিং, ফা হিয়েন, হুয়েন স্যাংয়ের নাম পরিচিত। ইৎসিং এদেশে আসিয়া প্রায় ৪০০ পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং হুয়েন স্যাং প্রায় হাজারের মত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফা হিয়েন ও হুয়েন স্যাং স্বয়ং বহু পুঁথির অনুবাদ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে এমন বহু ধর্ম গ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল যাহার মূল গ্রন্থ ভারতে পাওয়া যায় না কিন্তু চীনা অনুবাদ রক্ষিত হইয়াছে।

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া খ্রীষ্ট ধর্ম, মাজদা ধর্ম, ইসলাম ধর্ম প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের মত জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। চীনা জাতি সমগ্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এরূপ মনে করা ভুল হইবে। চীনা জাতি কনফুসীয় নীতিশাস্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত, কেজো বা প্র্যাকটিকেল জাতি, তাহার সমাজ চিন্তা, জীবন দর্শন ধর্ম চিন্তা ভারতীয় জীবন দর্শন, সমাজ চিন্তা ও ধর্ম চিন্তা হইতে একেবারে ভিন্ন। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, সম্পূর্ণ মেটিরিয়ালিষ্টিক। জীবনে সাফল্য, সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিজেদের লাভ-ক্ষতির চিন্তা তাহাদের নিকটে অধ্যাত্মতত্ত্ব ও তাহা লইয়া গবেষণা অপেক্ষা অনেক বড় জিনিস। বৌদ্ধ ধর্মকে বহু প্রতিকূলতা ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল কনফুসীয় নীতি শাস্ত্রে দীক্ষিত শাসনতন্ত্রের ধারক ও বাহকদের হাতে। ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে চল্লিশ হাজার বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস, মন্দিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও দুই লক্ষ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের সংসারী জীবনে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

শুধু বৌদ্ধ ধর্ম নয়, খ্রীষ্ট ধর্ম, মাজদা ধর্ম, ইসলাম ধর্মও কনফুসীয় নীতি-শাস্ত্রের শিষ্য, ধর্মবিমুখ চীনা শাসক গোষ্ঠীর হাতে মধ্যে মধ্যে উৎপীড়ন ভোগ করিয়াছে। মাঞ্চু যুগে সম্রাট কাঙ্‌হের রাজত্বকালে কানসুতে ইসলামধর্মীদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিলে বিদ্রোহ দমন করিয়া পনের বৎসর বয়সের বেশী সব ইসলামী পুরুষকে হত্যা করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

চীনের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে বিশাল, সুসভ্য চীনা জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মজ্জায় ধর্মবিমুখতা নিহিত রহিয়াছে। এতবড় দেশ ও জাতির মধ্য হইতে এমন কোন ধর্মমত বা দার্শনিক চিন্তা উদ্ভূত হয় নাই যাহা বাহিরের কোন দেশকে প্রভাবিত করিয়াছে। কনফুসীয় নীতিধর্ম চীনের নিজস্ব

জিনিস, কিন্তু আসলে ইহা ধর্মমত নয়, ব্যবহারিক নীতি শাস্ত্র বা code of conduct। লাওৎসের ধর্মমতেব সঙ্গে গোড়ায় ভারতীয় ধর্ম চিন্তার কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও পরে পরিবর্তিত হইয়া ইহা অপদেবতা, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি লৌকিক আচারে পরিণত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের অধ্যাত্মতত্ত্ব নয়, মহাযান-পন্থীদের দেবদেবী, পূজা অর্চনা ইত্যাদি সাধাবণ চীনা সম্প্রদায় গ্রহণ করে, কিন্তু কনফুসীয় সম্প্রদাযের নিকটে বৌদ্ধ ধর্ম ছিল cult of a Western barbarian, যে সাংসারিক কর্তব্য পালনে বিমুখ হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সংযোগ এক তরফা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না, যদি ভারত যাহা দিয়াছে তাহার সঙ্গে চীনের কাছে কি পাওয়া গিয়াছে তাহার তুলনা করা হয়।

আঞ্চলিক বিভাগ মতে

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

॥ ৪ ॥

উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ যে সকল থিওরী প্রচার করিয়াছেন সেই সকল থিওরী অবলম্বন করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় সেই সকল তথ্যের আলোকে সমগ্র (ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক) ভাবতবর্ষের অধিবাসীদের পরিচয় কি দাঁড়ায় সংক্ষেপে তাহা বলা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এক একটি অঞ্চল ধরিয়া তাহার অধিবাসীর পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইবে। আলোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যেব উল্লেখ কবা প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রথমে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কথা বলা হইতেছে।

এই অঞ্চলের মধ্যে পড়িতেছে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, উপজাতীয় এলাকা, কাশ্মীর, পূর্ব হিন্দুকুশ অঞ্চল, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু। উপজাতীয় এলাকা বলিতে ভাবতবর্ষ ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী প্রধানতঃ পাঠানজাতিসমূহ অধ্যুষিত অঞ্চল বুঝায়। পূর্ব হিন্দুকুশ বলিতে পূর্বে কাশ্মীর ও কাগান হইতে পশ্চিমে কাফিরীস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বুঝাইতেছে। এই অঞ্চলকে দর্দিস্তান নাম দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে চিত্রল, মাস্তজ, গিলগিট এজেন্সীভুক্ত অঞ্চল, হুনজা, নগর, বাল্টিস্তান প্রভৃতি পড়িতেছে।

এই সকল অঞ্চলের মধ্যে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতীয় এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে লম্বামুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও হিন্দুকুশ অঞ্চলে গোলমুণ্ড টাইপের সঙ্গে লম্বামুণ্ড টাইপের সংমিশ্রণ দেখা যায়; স্থানে স্থানে গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার অর্থ, এই অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের মধ্যে ছটি বা

ততোধিক টাইপের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীকে কেহ কেহ ইন্দো-আফগান, আবার কেহ কেহ ইন্দো-আরিয়ান বা আর্য নাম দিয়াছেন। কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে এই গোষ্ঠীর মধ্যে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর প্রাচ্য টাইপ ও প্রোটো-নর্ডিক টাইপের সংমিশ্রণ আছে (গুহ, ফিশার, আইকষ্টেড্‌ট)। রিজ্‌লের মতে সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী পাঠান ও উপজাতীয় এলাকার পাঠান পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত। তাঁহার মতে সীমান্ত প্রদেশের ও পশ্চিম পাঞ্জাবের পাঠান ইন্দো-আরিয়ান আর উপজাতীয় এলাকার অধিবাসীর মধ্যে তুর্কী ও ইরাণী সংমিশ্রণ আছে। মিশ্র মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের গোষ্ঠী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ইন্দো-আফগান টাইপের সঙ্গে পামীরী বা ইরাণী টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, প্রোটো-নর্ডিক টাইপের সঙ্গে পামীরী বা আলপাইন বা আল্পো-দিনারিক টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে (গুহ)। রিজলের মতে বেলুচীস্তানের অধিবাসী তুর্কো-ইরাণী গোষ্ঠীভুক্ত। গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে পামীরী আলপাইন, দিনারিক, আর্মেনয়েড ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে এই লম্বামুণ্ড গোলমুণ্ড ও মিশ্র টাইপের অধিবাসী কাহারা এবং তাহাদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় কি, জানিবার চেষ্টা করা হইবে।

সীমান্ত প্রদেশ

পাঞ্জাবে এবং তাহার বাহিরে সীমান্ত প্রদেশে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য বর্তমান। অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পাঞ্জাবের লম্বামুণ্ড টাইপ এবং সীমান্তের লম্বামুণ্ড টাইপের মধ্যে কোন পার্থক্যের কথা বলেন না।

সীমান্ত প্রদেশের প্রায় চল্লিশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে পাঠান জাতি প্রধান। পেশোয়ার জেলায় পাঠানগণ শতকরা ৬১, বান্নুতে ৫৬, ডেরাইস-মাইল খাঁ জেলায় ৩০। সীমান্ত প্রদেশের শুধু হাজারা জেলাটি সিন্ধুনদের পূর্বে। হাজারা জেলায় গুজরগণ প্রাচীন অধিবাসী। তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষের অধিক। পাঠানের সংখ্যা অর্ধ লক্ষের উপর। প্রায় এক লক্ষ আবান এই জেলায় বাস করে। ইহারা ও গুজরগণ মুসলমান। যাহারা পাঠান নহে, সীমান্ত প্রদেশে তাহারা হিন্দকী নামে পরিচিত। হিন্দকী ও

জাঠকী সাধারণতঃ ভাষার নাম। কোন কোন পাঠান উপজাতির মধ্যে হিন্দকী গোষ্ঠীর লোক গৃহীত হইযাছে। পেশোয়ার জেলায় হিন্দকীদের মধ্যে বহু আবান ও গুজর আছে। ইহারা মুসলমান। বান্নু জেলায় বহু জাঠ, রাজপুত, আবান বাস করে। বান্নুচিদিগকে মিশ্র জাতি বলা হয়, ইহারা পাঠান নহে।

গুজর ও পাঠান ছাড়া বহু রাজপুত ও জাঠ সীমান্ত প্রদেশে বাস করে। ডেরাইসমাইল খাঁ জেলায় জাঠের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। ইহারা মুসলমান। পাঠান বাদে বহু মুঘল, গাক্কার, আফগান ও বেলুচী এই অঞ্চলের অধিবাসী। তুর্ক গোষ্ঠীর ও আরব মিশ্র জাতির লোকও কিছু আছে। সিন্ধু নদ ও সুলেমান পর্বতশ্রেণীর মধ্যে ডেরাজাতের (ডেরা ইসমাইল খাঁ, ডেরা ফতে খাঁ ও ডেরা গাজী খাঁ ডেরাজাত নামে পরিচিত) বেলুচীরা এই অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে আসিয়াছে।

প্রাচীনকালে সমগ্র কাবুল উপত্যকা গান্ধার নামে পরিচিত ছিল। আলিনগর হইতে সিন্ধু ও উত্তরে সোয়াত উপত্যকা হইতে দক্ষিণে সফেদ কোহ্ ও কোহাটের পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল,—পেশোয়ার, কোহাটের অংশ, মোমান্দ উপজাতীয় এলাকা, সোয়াত, বাজাউর ও বুনের গান্ধারের অন্তর্ভূ্ত ছিল। দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (খ্রীঃ ৯৮৮) এই অঞ্চল কাবুলের হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল। চিত্রলের নিকটে মাস্তজে প্রাপ্ত একটি সংস্কৃত লিপিতে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় ৯০০ অব্দে পার্শ্ববর্তী সমগ্র অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্মে ছিল বৌদ্ধ ও কাবুলের রাজা জয়পালের অধীন ছিল। গজনী ও ঘোরের রাজাদের দখলে আসিবার পরেও এই অঞ্চলে হিন্দুপ্রভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে উত্তর হইতে পাঠান জাতির প্রবাহ আসিয়া এই অঞ্চলকে প্লাবিত করিয়া ফেলে।

এই সমগ্র অঞ্চল গ্রীকো-বৌদ্ধ আর্টের ও বৌদ্ধ ধর্মের নানা প্রাচীন নিদর্শনের জন্য প্রসিদ্ধ। দীর ও সোয়াত এলাকার প্রাচীন নাম ছিল উদ্যন। হাজরা জেলার প্রাচীন নাম উরস বা অভিসার। খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ সনে আলেকজাণ্ডারের বাহিনী কুনের, বাজাউর, সোয়াত ও বুনের হইয়া সিন্ধু তীরে অবতরণ করিয়াছিল।

পাঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলমান রাজপুত, জাঠ ও গুজর প্রভৃতি যে সম্প্রদায়ও

গোষ্ঠীভুক্ত, সীমান্ত প্রদেশের প্রধান অধিবাসী পাঠান সেই গোষ্ঠীভুক্ত। সীমান্ত প্রদেশের পাঠান ও উপজাতীয় এলাকার পাঠান এক লম্বামুণ্ড টাইপের সীমান্ত প্রদেশে পাঠান বাদে মুসলমান জাঠ, রাজপুত, গুজর প্রভৃতি অধিবাসী হিন্দকী নামে পরিচিত হইলেও তাহারা ও পাঠানরা এক লম্বামুণ্ড টাইপের। হিন্দকী নামের অর্থ ইহারা পুস্তু-ভাষী নহে এবং ইহারা পাঠানদিগের সামাজিক রীতিনীতি ও আইন-কানুনের বাহিরে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাঞ্জাব হইতে উপজাতীয় এলাকা পর্যন্ত এক লম্বামুণ্ড টাইপের প্রাধান্য বর্তমান। এই প্রাধান্য আফগানিস্তানের কোন কোন অঞ্চলেও বর্তমান। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এই টাইপের সঙ্গে কিছু পরিমাণে আরব, তুর্ক ও ইরাণী এবং ঐতিহাসিকদের মতে সিথিয়ান বা শক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সংমিশ্রণের ফলে প্রধান টাইপের যে বিশেষ কোন পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বলা হয় না।

পাঠান (পাখতুন) অঞ্চল

সীমান্ত প্রদেশের বাহিরে উপজাতীয় এলাকাতেও লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য বর্তমান। এই এলাকা পাঠানদিগের নিজস্ব এলাকা, কিন্তু এই এলাকাতেও অন্য গোষ্ঠীর অধিবাসী দেখা যায়।

উপজাতীয় এলাকার মধ্যে দীর, সোয়াত, বাজাউর বা রিন্দ, সামবাণীজাই ও উতমনখেল পাঠানদিগের এলাকা। দীর, দক্ষিণ সোয়াত, বুনের ও পাঁজকোরা উপত্যকা ইউসুফজাই পাঠানদিগের দখলে। বাজাউর বা রিন্দ জিজিয়ানী ও তরকীলানরী পাঠানদিগের দখলে। দীর কোহিস্তানের উত্তরাংশ বাসকর নামে পরিচিত। বাসকর উপত্যকার অধিবাসীরা এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদিগের বংশধর। ইহারা পাঠান নহে। সোয়াতের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে সোয়াত-কোহিস্তানে দেখা যায়। দীর উপত্যকা ও বাসকরে বহু গুজর অধিবাসী আছে। সোয়াত-কোহিস্তানের অধিবাসীর মধ্যে গুজর, তোরওয়া ও গারহবুইগণ প্রধান। ইহাদের ভাষার সঙ্গে হাজারার গুজরদিগের ব্যবহৃত হিন্দকী ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন সোয়াতী হিন্দু জাতি ঝিলাম হইতে জালালাবাদ

পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র অঞ্চলে আধিপত্য করিত। প্রথমে দিলজকগণ এই অঞ্চল দখল করিয়া ইহাদিগকে সোয়াত ও বুনেরের পার্বত্য অঞ্চলে বিতাড়িত করে। পরে ইউসুফজাই পাঠানগণ তাহাদিগের অধিকাংশকে হাজারা ও কাফিরীস্তানে বিতাড়িত করে। সোয়াত সমতল অঞ্চলের তানাওলিগণ পাঠান বলিয়া পরিচিত। অনুমান করা হয়, ইহারা এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের সম্পর্কিত। দিলজকগণ শক গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। ইউসুফজাই ও মোমান্দগণ ইহাদিগকে সিন্ধুর পূর্বতীরে বিতাড়িত করে। পূর্ব আফগানিস্তানের দেগান জাতি প্রাচীন সোযাতী-দিগের সম্পর্কিত বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহাদিগকে বুনের, বাজাউর, লুঘান ও নিনগ্রহারে দেখা যায়। কুরাম নদীর তীরে সিলমানের অধিবাসী সিলমানীদিগকে দেগানদিগের সম্পর্কিত বলা হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ১৬ শতাব্দীতে খাকাই গোষ্ঠীর ইউসুফজাই ও অন্যান্য পাঠান জাতির আক্রমণের পূর্বে ধর্ম ও জাতিতে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সম্পূর্ণ ভারতীয় ছিল। পাঠান আক্রমণের ফলে একদিকে ইসলামের প্রাধান্য স্থাপিত হইল এবং অন্যদিকে প্রাচীন অধিবাসীদের কিয়দংশ বাসকর ও সোয়াত-কোহিস্তানের দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। অধিকাংশ নিঃশেষ হইয়া গেল অনুমান করা যাইতে পারে। চিত্রল, মাস্তজ ও ইযাসিনের অধিবাসীরা পাঠান নহে। ইহাদের কথা পরে বলা হইতেছে।

কোহাট, খাইবার গিরিসঙ্কট ও খাইবারের দক্ষিণে টিরা আফ্রিদি পাঠানদিগের এলাকা। কুরাম এজেন্সী মিশ্র আফগান ও তুর্কী জাতীয় করলাকই, ওয়াজিরস্তানের উত্তর অঞ্চল ওয়াজির ও দক্ষিণ অঞ্চল ওয়াজির-দিগের শাখা মাসুদদিগের এলাকা। টিরার পার্শ্ববর্তী উপত্যকা ওরাকজাই পাঠানদিগের এলাকা। অনুমান করা হয় যে টিরার প্রাচীন অধিবাসী তাজিক গোষ্ঠীয় ছিল। ইহারা টিরাত্তি নামে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ইহারা পীর-ই-রোশন কর্তৃক এই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হয়। ডেরাজাত ও মাসুদ এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চল ভিটানী এলাকা। ডেরা ইসমাইল খাঁর পশ্চিমে শিরাণী পাঠানদিগের এলাকা।

পাঠান জাতি ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী কি না এবং পাঠান ও

আফগানেরা বাস্তবিক এক জাতি কি না এই প্রশ্ন বহুকাল ধরিয়া আলোচিত হইতেছে। প্রথমে পাঠানদিগের কথা বলা যাইতে পারে।

পাঠান বা পাখতুন ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী। ঐতিহাসিকদিগের মতে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে তাহারা সফেদ কোহ্ ও উত্তর সুলেমান পর্বতশ্রেণী, অর্থাৎ সিন্ধু হইতে হেলমন্দ এবং সোয়াত ও জেলালাবাদ হইতে পেশিন ও কোয়েটা পর্যন্ত অঞ্চলে বাস করিত। গ্রীক ঐতিহাসিকদের উল্লিখিত পাক্‌তি (Paktyke) জাতি আরাকোশিযা বা কান্দাহারে বাস করিত। এই পাকতিকে হইতে পাখতুন নাম আসিয়াছে। ঋগ্বেদে পকৃথ্ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় (খ্রীঃ ৭।১৮।৭)। কেহ কেহ মনে করেন ঋগ্বেদের এই পকৃথ্ গ্রীকদের পাক্‌তিকে ও পরবর্তীকালের পাখতুন ও পাঠান। গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের মতে প্রাচীন পাকতিকে জাতি চারিটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল: ১। আপারিটি, ২। সত্রাজিদ্দি, ৩। দাদিকী, ৪। গান্ধারী। প্রথম গোষ্ঠীকে আফ্রিদি, দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে খাটক, তৃতীয় গোষ্ঠীকে কাকর ও চতুর্থ গোষ্ঠীকে ইউসুফজাই ও মোমান্দ হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। গজনীর রাজাদের ভারতবর্ষ আক্রমণের সময় আফ্রিদিগণ সফেদকোহ, সত্রাজিদ্দি বা খাটক সুলেমান পর্বতশ্রেণী এবং সিন্ধু ও সফেদ-কোহর মধ্যবর্তী সমতল অঞ্চলের উত্তরাংশে এবং দাদিগণ শকস্তান, কান্দাহার ও সুলেমান পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করিত। পাখতুন জাতির যে শাখা গান্ধারী নামে পরিচিত, তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গান্ধারীগণ বৈদেশিক শত্রু বা হুন আক্রমণের ফলে পেশোয়ার উপত্যকার আদি বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া হেলমন্দ উপত্যকার দিকে চলিয়া যায়। সেখানে তাহারা গান্ধার বা কান্দাহার সহর প্রতিষ্ঠা করে। হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে (৭ম খ্রীষ্টাব্দে) তাহারা আরব ও ঘোরী আফগান-দিগের দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত হয়। খ্রীষ্টীয় ১৫ শতাব্দীর প্রথমভাগে পলাতক গান্ধারীগণ কান্দাহার ত্যাগ করিয়া পুনরায় পেশোয়ার উপত্যকায় আপনাদের প্রাচীন বাসভূমিতে প্রত্যাগমন করে। ইহারাই ইউসুফজাই, মোমান্দ প্রভৃতি নামে পরিচিত পাঠান। ঐতিহাসিকের মতে: "In entering the Punjab during the last few hundred years the Pathans re-entered a

country which their ancestors had left more than a thousand years ago."

পাখতুন জাতির দাদি শাখা কাকরদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, কাকবগণ শক গোষ্ঠীভুক্ত। ওরাক্‌জিবগণ জাতিতে পাঠান নহে, তাহারা রাজপুত। আফগান ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত খাইবার যদুবংশী ভাটি রাজপুতগণের দখলে ছিল। ইহারা লাহোরের রাজার অধীন ছিল। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে আফ্রিদি ও গাকারগণ লাহোরের রাজার নিকটে সিন্ধু নদের পশ্চিম ও কাবুল নদের দক্ষিণের সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল বন্দোবস্ত লয়। এই বন্দোবস্তের সর্ত ছিল তাহারা সীমান্ত অঞ্চল বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। গজনীর মাহ্‌মুদের সময় আফ্রিদিগণ ইসলামে দীক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপার সাহাবুদ্দিন ঘোরীর আমলে পাকাপাকিভাবে সম্পন্ন হয়। সৈয়দ উপাধিধারী আরব প্রচারকগণ পাঠানদিগের এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। তাহারা পাঠানদিগের মধ্যে বিবাহ করিয়া স্থায়ীভাবে তাহাদের মধ্যে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে পাঠানদিগের ধর্মান্তর গ্রহণের কার্য সম্পন্ন হয়।

প্রকৃত পাখতুন জাতির সঙ্গে বহু জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দাদি শাখার সঙ্গে কাকরদিগের সংমিশ্রণ হইয়াছে। করলারুইদিগের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তুর্কী সংমিশ্রণ হইয়াছে। রাজপুত ওয়াজিরগণ পাখতুন জাতির মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

আফগানদিগের সম্বন্ধে একটি বহু প্রচলিত মত এই যে, তাহারা য়িহুদী গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। কেহ কেহ বলেন, তাহারা গ্রীক ঐতিহাসিকগণের সলিমি (Solymi) ; কাহারও মতে য়িহুদী, আরব ও ভারতীয় গান্ধারীদিগের সংমিশ্রণে আফগানদিগের উৎপত্তি। গান্ধারীদিগের পুস্তু ভাষা এখন সকল আফগানের ভাষা। কেহ কেহ বলেন, প্রকৃত আফগান বলিতে শুধু আবদালি দুরানি, তারিন ও সিরাণীদিগকে বুঝায়। দুরাণীরা পুস্তুভাষী অন্যান্য আফগান উপজাতিকে ওপ্রা বলে এবং আপনাদিগকে বেন-ই-ইসরাইল বা বেন-ই-আফগান বলে। বিতর্ক বাদ দিলে প্রকৃত অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, ভারতীয় পাখতুন গোষ্ঠীর শাখা গান্ধারীদিগের ও পূর্ব আফগানিস্তানের ভারতীয় সোয়াতী জাতির রক্ত আফগানদিগের মধ্যে রহিয়াছে এবং উত্তরে ও পশ্চিমে

প্রচুর পরিমাণে ইরাণী সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। সেমিটিক আরব ও তুর্ক-মোঙ্গল গোষ্ঠীর সঙ্গেও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

আফগানিস্তান ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার ইরাণী জগৎ, পূর্ব-মধ্য এশিয়ার চৈনিক জগৎ এবং উত্তরের যাযাবর তুর্ক-মোঙ্গল গোষ্ঠীর অধ্যুষিত মরু অঞ্চলের সংযোগক্ষেত্র, একথা মনে রাখিলে প্রকৃত অবস্থার একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

হুয়েন স্যাংয়ের বিবরণ, প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের বিবরণ এবং প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের বিবরণ হইতে কানিংহাম আফগানিস্তান, উপজাতীয় এলাকা ও সীমান্ত প্রদেশের যে ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন এখানে অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

কানিংহামের বর্ণনামতে গ্রীক আমল হইতে বহু পরবর্তী কাল পর্যন্ত লেখকগণ পূর্ব আরিয়ানাকে (আরিয়া, হিরাট) ভারতবর্ষের একটি অংশ বলিয়া মনে করিতেন ("a portion of the Indian continent")। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় জাতি যে কাবুলের অধিবাসী ছিল তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। হুয়েন স্যাংয়ের মতে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কপিশার (কাফিরীস্তান, ঘোরবাঁধ ও পঞ্জশির উপত্যকা) রাজা ক্ষত্রিয় ছিলেন। কাবুল উপত্যকা খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের রাজার অধীনে ছিল। মাহ্‌মুদ গজনভীর রাজত্বের শেষের দিকে এই রাজ্য বিলুপ্ত হয়। তারপর কানিংহাম বলিতেছেন, "Down to this time a great part of the population of Eastern Afghanistan including the whole of the Kabul valley must have been of India origin while the religion was pure Buddhism"। অর্থাৎ দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সমগ্র কাবুল উপত্যকা সহ পূর্ব আফগানিস্তানের অধিবাসীদের অধিকাংশ জাতিতে ভারতীয় ছিল। "The persecutions of the Ghaznavis led to final disappearance of the Indian element in Eastern Ariana." পূর্ব-আরিয়ানায় ভারতবর্ষীয় জাতির অন্তর্ধানের কারণ গজনীর রাজাদের উৎপীড়ন।

খ্রীষ্টজন্মের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সিন্ধুনদের পশ্চিমে ভারতবর্ষের

প্রদেশগুলির মধ্যে আফগানিস্তান (পশ্চিমে বামীযান ও কৌদাহার হইতে দক্ষিণে বোলান গিরিসংকট পর্যন্ত) অন্তর্ভূক্ত ছিল।

এই অঞ্চল দশটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কপিশা ছিল প্রধান রাজ্য এবং উহার অধীনে ছিল পশ্চিমে গজনী, উত্তরে লাঘমান ও জেলালাবাদ, পূর্বে সোয়াত ও পেশোয়ার, উত্তর-পূর্বে বোলর (বালটিস্তান) এবং দক্ষিণে বান্নু। কপিশার অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৭৭৪ সনেও দেখা যায় যে কাশ্মীর হইতে একটি সৈন্যবাহিনী গজনীতে প্রেরিত হইয়াছে স্থানীয় শাসনকর্তার হাত হইতে উহার দখল লইবার জন্য। এই সময়ে পিরিন নামক এক ব্যক্তি গজনীর শাসনকর্তা ছিল। গজনীতে এই সময়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সবথ্‌তগিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। লাঘমান (সংস্কৃত লম্পক) ও জেলালাবাদ (নগরহার) কপিশার করদরাজ্য ছিল। পেশোয়ার বা গান্ধার রাজ্যের সীমানা ছিল পশ্চিমে লাঘমান ও জেলালাবাদ, উত্তরে সোয়াত ও বুনের পূর্বে সিন্ধু নদ ও দক্ষিণে কালবাগের পার্বত্য অঞ্চল। গান্ধারের রাজধানী ছিল পুষ্কলাবতী বা পুষ্পপুর, পরে উদ্ভাণ্ডপুর বা ওহিন্দ রাজধানী হয়। কাবুলরাজ্য গান্ধারের অধিপতি ব্রাহ্মণ রাজবংশের অধীনে ছিল। পাঁজকোরা, বাজাউর ও বুনের উদয়ন (পালি উজ্জান, গ্রীক Suastene) রাজ্যের অধীন ছিল। কোন কোন মতে সোয়াত হইতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত ইয়ুসুফজাইদিগের অধিকৃত অঞ্চল ছিল উদয়ন রাজ্য। কপিশার অধীন আর একটি করদ রাজ্য ছিল বান্নু (বরণ)। কুরাম ও গোমাল নদীর উপত্যকা, অর্থাৎ ওয়াজিরস্তান ও কুরাম এজেন্সী এলাকা এই রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

পেশোয়ার বান্নু, বুনের ও আফগানিস্তানের বহু স্থান হইতে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বাহির হইয়াছে তাহার কথা এখানে বলা অনাবশ্যক। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উত্তরে অকসাশ অবধি সমগ্র আফগানিস্তান কিরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে ভারতবর্ষের সহিত আবদ্ধ ছিল তাহা উত্তর ভারতে হুয়েন স্যাংয়ের ভ্রমণের বিবরণ পড়িলে উত্তমরূপে জানা যায়। নৃ-তত্ত্ব ছাড়িয়া এখানে ইতিহাসের কথায় আসা হইয়াছে। ইহার কারণ ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর প্রকৃত পরিচয় বুঝিতে হইলে যে যবনিকা বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভারতবাসীর দৃষ্টি অবরোধ

করিয়া রাখিয়াছে তাহা সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম যবনিকা রচিত হইয়াছিল ইসলাম প্রচারের ফলে। দশম শতাব্দীর শেষভাগেও যে গজনীর শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল, দশম শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসর হইতে সেই গজনীর শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া প্রথমে কাবুল ও লাঘমান, তারপর গান্ধার বা পেশোয়ার, তারপর সিন্ধু অতিক্রম করিয়া লাহোর ভারতবর্ষের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অঞ্চল গজনী ও ঘোর রাজাদের স্থায়ী ঘাঁটি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিস্তারের কেন্দ্র এবং সেলজুক ও উজবেগদিগের দ্বারা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইলে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবার আশ্রয়স্থল হইল। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্ম পরিবর্তন করিয়াছে, ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহাদের প্রাচীন রাষ্ট্রীয় বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পর্ক অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করা হইল। দ্বিতীয় যবনিকা রচিত হইয়াছিল ব্রিটিশ জাতির সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে।

আর একটি কথা স্মরণ রাখা যাইতে পারে। হুয়েন স্যাং আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা ৭ম শতাব্দীর মধ্য-ভাগের। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভ্রমণ শেষ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। আফগানিস্তানের পশ্চিম সীমানা হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায়, অর্থাৎ ইরাণ, মেসোপটেমিয়া, আরব সিরিয়া প্যালেষ্টাইন এবং উত্তর আফ্রিকার মিশরে এই সময়ের মধ্যে অথবা ৬৩২ হইতে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ, এই দশ বৎসরের মধ্যে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। আবু বেকর ও ওমরের অধীনে দিগ্বিজয়ী ইসলামবাহিনী এই বিপর্যয় ঘটাইয়াছিল। ইরাণ কবলিত করিয়া পশ্চিম আফগানিস্তানের হিরাটে বিজয়ী আরববাহিনী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সম্রাট-কবি হর্ষবর্ধন যখন কণৌজে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং সভাকবি বাণভট্ট কাদম্বরী রচনা করিতেছিলেন, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তখন হইতে ঘন মেঘ জমিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পূর্ব হিন্দুকুশ অঞ্চল (দর্দিস্তান)

ওয়াজিরস্তান, কুরাম, টিরা, খাইবার এবং তাহার পূর্বে ইয়ুসুফজাই পাঠানদিগের প্রধান বাসভূমি পেশোয়ার উপত্যকা ও মোমান্দ এলাকা ছাড়িয়া উত্তরে মালখন্দ গিরিসংকট অতিক্রম করিলে পূর্ব হিন্দুকুশের উপজাতীয় এলাকায় প্রবেশ করা যায়। এই এলাকা সোয়াত, উতমন খেল, বাজাউর, দীর, বুনের, পাঁজকোরা এবং চিত্রল, মাস্তুজ ও ইয়াসিন পর্যন্ত গিয়াছে।

হিন্দুকুশের অবস্থান ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। পামীরের পর্বতগ্রন্থি হইতে বাহির হইয়া কয়েকটি শাখা দক্ষিণ পশ্চিমে ও দক্ষিণ পূর্বে চলিয়া গিয়াছে। প্রথম শাখা বাদাকশান বাহু। ইহা চিত্রলের উত্তর-পশ্চিমে তিরিচমীর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বাদাকশানের দক্ষিণে কাফিরীস্তান। সীমান্ত প্রদেশের দীর, সোয়াত ও চিত্রল এজেন্সী এবং আফগানিস্তানের বাদাকশান ও কাফিরীস্তানের মধ্যে হিন্দুকুশের বাহুগুলি ছড়াইয়া আছে। চিত্রলের পূর্বে ইয়াসিন ও কাশ্মীরের গিলগিট এলাকা। কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম এবং দীর ও সোয়াত উপত্যকার মধ্যে হিন্দুকুশের দুর্গম বাহু প্রসারিত।

হিন্দুকুশের মধ্যে উপজাতীয় এলাকার যে অংশ পড়ে তাহার অধিকাংশ যথা, উতমন খেল, সোয়াত, দীর, বুনের ও পাঁজকোরার প্রধান অধিবাসী ইয়ুসুফজাই গোষ্ঠীর পাঠান উপজাতি। পাঠান জাতি এই অঞ্চলের আদি অধিবাসী নহে, তাহারা খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে এই অঞ্চল অধিকার করে। দীর, নিম্ন সোয়াত, বুনের ও পাঁজকোরা ইয়ুসুফজাই পাঠান অধিকার করিয়াছে, উচ্চ সোয়াত অধিকার করিয়াছে তাহাদের আকজাই শাখা, বাজাউর অধিকার করিয়াছে জিজিয়ানি ও তুর্কীলানি পাঠান। সোয়াত নদীর উত্তর তীরবর্তী অঞ্চল উতমনখেল পাঠানরা দখল করিয়াছে।

ইয়ুসুফজাই পাঠান এই অঞ্চল দখল করিবার সময়ে প্রাচীন অধিবাসীদের কিছু অংশ কাফিরীস্তান ও হাজারায় চলিয়া যায়, কিছু অংশ দীর ও সোয়াতের দুর্গম অঞ্চলে সরিয়া যায়। ইহার নাম তরহবুই ও গরহবুই। বহু গুজরকেও এই অঞ্চলে দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন এই

অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসী ও উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের আদিবাসী এক গোষ্ঠীর ছিল। ইহাদের নাম দেগান। বুনের, বাজাউর, লাঘমান ও নিনগ্রহারে ইহারা এখনও ছড়াইয়া আছে, অবশ্য মুসলমানরূপে। ইহাদের সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর কোন অভিমত পাওয়া না গেলেও ইহাদের পরিচয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসিবার একটা অবকাশ আছে। সোয়াতের উত্তরে চিত্রল। চিত্রল, মাস্তুজ, ইয়াসিন, হুনজা ও নগর কাশ্মীরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দরদ নামে পরিচিত। দরদ জাতির উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। কেহ কেহ কাফিরীস্তানের অধিবাসীদিগকে দরদ গোষ্ঠীভুক্ত বলেন। ডাঃ লেইটনার পশ্চিমে কাফিরীস্তান হইতে পূর্বে কাশ্মীর ও কাগান উপত্যকা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল দর্দিস্তান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াসিন কাশ্মীরের প্রতিবেশী রাজ্য। ইয়াসিন হইতে ৮০ মাইল দূরে গিলগিট। গিলগিট হইতে দক্ষিণে আষ্টর বা হাসোরা ও দক্ষিণ-পশ্চিমের দাবেল, তাঙ্গির, গোর প্রভৃতি দুর্গম উপত্যকাগুলিও দরদগোষ্ঠীর বাসভূমি।

বোলান গিরিসংকট হইতে সোয়াত পর্যন্ত যেরূপ পাঠান এলাকা দেখা যাইতেছে তেমনি চিত্রল হইতে কাশ্মীর ও চিত্রলের দক্ষিণ-পশ্চিমে আফগানিস্তানের অন্তর্ভূক্ত কাফিরীস্তান পর্যন্ত দরদদিগের এলাকা দেখা যাইতেছে। সুতরাং সোয়াত, দীর, বাজাউর প্রভৃতি এলাকার প্রাচীন অধিবাসী যে দরদ গোষ্ঠীর জাতি হওয়া সম্ভব তাহা অনুমান করা যায়।

গিলগিট হইতে ইয়াসিন, মাস্তুজ ও আফগানিস্তানের বাদাকশান ও কাফিরীস্তানে প্রবেশ করা যায়। মাস্তুজ নদীর উপত্যকা ধরিয়া আফগান পামীরের ওয়াখানে পৌছিবার পথ আছে। হিন্দুকুশ ও পামীরের সংযোগস্থলে ১২০০০ ফুট উচ্চ বারোগাহিল হইতে একটি পথ অকসাস বা আবি পাঞ্জার দক্ষিণ তীরে সরহাদে পৌছিয়াছে। সরহাদের উত্তরে রাশিয়া অধিকৃত পামীর। উত্তর-পূর্বদিকে ওয়াখজির গিরিসংকট হইয়া চীন অধিকৃত সারিকোলের প্রধান শহর তাসকুরগানে পৌছান যায়। আরও পূর্বে সিংকিয়াং বা পূর্ব তুর্কীস্তানে ও তিব্বতে পৌছিবার পথ আছে।

কাশ্মীর উপত্যকার উত্তরে গিলগিট ও আষ্টরের পূর্বে বাল্টিস্তান। ইহার পূর্ব নাম বোলর। বাল্টিদিগের ভাষা তিব্বতী, ধর্মে তাহারা শিয়া

ও মুরবক্সী মুসলমান। বাল্টিস্তানের উচ্চতর অঞ্চলের বোক-পা উপজাতি দরদগোষ্ঠীভুক্ত। চিত্রল, মাস্তজ, ইয়াসিনের ও গিলগিটের কথা বলা হয় নাই।

কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতের মতে বোক-পা, বাল্টী, বাল্টীস্তানের উত্তরের হুনজা, নগর ও ইয়াসিনের অধিবাসীরা দরদগোষ্ঠীভুক্ত! কেহ কেহ বলেন বাল্টী ও লাডাকীরা এক গোষ্ঠীভুক্ত। অর্থাৎ তিব্বতী টাইপের। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেডনের মতে বাল্টীরা ইন্দো-আফগান অর্থাৎ রিজ্‌লের ইন্দো-আরীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। তিনি বলেন তাহারা প্রাচীন শক-জাতির বংশধর। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, ভাষা তিব্বতী হইলেও এবং কিছু পরিমাণ তিব্বতী বা মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ তাহাদের মধ্যে দেখা গেলেও বাল্টী ও লাডাকীরা একগোষ্ঠীভুক্ত নহে।

লাডাকের অধিবাসীদের মধ্যে লাডাকী বা ভোট, চিয়াংপো বা চাম্প ও খাম্বা, ভাষায় ও জাতিতে তিব্বতী এবং ধর্মে বৌদ্ধ। স্কার্ডু হইতে লাডাক যাইবার পথে হানু উপত্যকা পড়ে। হানু উপত্যকার অধিবাসীরা জাতিতে দরদ ও ধর্মে বৌদ্ধ। একমাত্র এই অঞ্চলে বৌদ্ধ দরদজাতি দেখা যায়। খাস দরদিস্তানে তাহারা ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছে। লাডাকে বাল্টীদিগের কতকগুলি জাতি আছে। এইরূপ বাল্টী বসতি ইযারখন্দেও আছে। খাম্বাদিগের আদিবাস পূর্ব তিব্বতের খাম প্রদেশে।

দক্ষিণের পাঠান অধ্যুষিত দীর ও সোয়াত উপত্যকা অপেক্ষা পূর্বদিকে গিলগিট এজেন্সীর অধিবাসীদের সহিত ও পশ্চিমের বাদাকশান, কাফিরী-স্তানের অধিবাসীদের সহিত চিত্রলীদিগের সম্পর্ক অধিক। চিত্রলের ও চিত্রলের পূর্বে মাস্তজ ও ইয়াসিনের অধিবাসীরা পাঠান নহে। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত চিত্রল, মাস্তজ ও ইয়াসিন "রাস" উপাধিধারী হিন্দু রাজার অধীন ছিল। তারপর তাঁহার একজন বিদেশী মুসলমান প্রজা প্রভুকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করে। খ্রীষ্টীয় ১৪শ হইতে ১৬শ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চিত্রালীরা ইসলামে দীক্ষিত হইতে থাকে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, সোয়াত-কোহিস্তান ও বাসকরের অপাঠান অধিবাসী ও চিত্রলীরা এক গোষ্ঠীর। চিত্রলের একটি নাম খাসকর। দীর উপত্যকার একটি নামও খাসকর। যে প্রাচীন সোয়াতী জাতি

ঝিলাম হইতে জালালাবাদ্ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আধিপত্য করিত, চিত্রলীরা সেই জাতির একটি শাখা।

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ৩৪০ মাইল ও শ্রীনগর হইতে ২৩৮ মাইল দূরে গিলগিট। গিলগিটকে কেন্দ্র করিয়া পার্বত্যপথগুলি চারদিকের উপত্যকা-গুলির মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইজন্য গিলগিট নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গিলগিট দুর্গটির বিশেষ সামরিক গুরুত্ব আছে। গিলগিটের প্রাচীন নাম সারগিন। গিলগিটের শেষ হিন্দু রাস বা রাজাকে নিহত করিয়া পারস্য হইতে আগত একজন মুসলমান রাজ্য অধিকার করে। রাজ্যের হিন্দু অধিবাসীরা ইসলামে দীক্ষিত হয়। তারপর প্রাচীন সারগিন চারিটি অংশে বিভক্ত হইয়া যায়, সকার্দু, আষ্টর, রোন্দা ও খারমেনস্। গিলগিট ও আষ্টরের অধিবাসীরা আপনাদের দেশকে বলে শিনাকা। তাহাদের ভাষার নাম শিনা। গিলগিটের উত্তরে হুনজা ও নগর দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য। হুনজার রাজা বা থামের রাজ্যের সীমানা তাগদুম্বাস পামীর পর্যন্ত বিস্তৃত। হুনজা ও নগর এবং গিলগিট এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত আসকুমান, ঘিজর, চিলা সাধারণতন্ত্র, তাঙ্গির, দারেল, পুনিয়াল ও ইয়াসিন কাশ্মীরের মহারাজার করদ রাজ্য। ধর্মে এই অঞ্চলের অধিবাসী সকলেই মুসলমান, অনেকে ইসমাইলী মতে বিশ্বাসী।

ভাষার দিক হইতে হিন্দুকুশ এলাকার উপজাতিদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যাহারা দরদ ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে এবং যাহারা বুরোসস্কি ভাষা ব্যবহার করে। প্রথম দলের মধ্যে পড়ে গিলগিট এজেন্সী অঞ্চলের অধিবাসী, দারেল, দীর কোহিস্তান ও সোয়াত-কোহিস্তানের অধিবাসী, চিত্রল, মাস্তুজ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী ও কাশ্মীরীরা। বালটীস্তানের উত্তর অঞ্চলের বোক-পা ও মাচোন-পা উপজাতি দরদ ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে। লাডাকের হানু উপত্যকার অধিবাসীরা দরদ ভাষা ব্যবহার করে। ইয়াসিন, হুনজা ও নগর এলাকার অধিবাসী বুরোসস্কি ভাষা ব্যবহার করে। চিত্রলের পশ্চিমে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত কাফিরী-স্তানের অধিবাসীদিগের ভাষার সহিত দরদ ভাষার নিকট সম্পর্ক আছে বলা হইয়াছে।

ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ তাঁহার *Racial Composition of the Hindukush*

Tribes নামক প্রবন্ধে দরদ ও বুরোসস্কি ভাষাভাষী উপজাতিদের মধ্যে চারিটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা বলিয়াছেন, যথা—লম্বামুণ্ড ভূমধ্য-সাগরীয় বা প্রাচ্য গোষ্ঠী, লম্বামুণ্ড নর্ডিক বা প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠী গোলমুণ্ড দিনারিক গোষ্ঠী ও মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠী। ইহাদের মধ্যে তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন প্রথমটিকে। তাঁহার মতে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের পরিমাণ সামান্য। দিনারিক সংমিশ্রণ দরদ উপজাতিদের মধ্যে কম, প্রোটো-নর্ডিক সংমিশ্রণ বেশী।

ডাঃ গুহের প্রোটো-নর্ডিক সংমিশ্রণ ও সামান্য মোঙ্গলয়েড মিশ্রণের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, হিন্দুকুশের উপজাতিদের মধ্যে (ডাঃ গুহ কাফিরদিগকে দরদ গোষ্ঠীর সঙ্গে ধরিয়াছেন) একটি লম্বামুণ্ড ও একটি গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ প্রবল। এই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী, উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায়, তাহা হইতে অভিন্ন। পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতীয় এলাকার অধিবাসীদের সহিত কাশ্মীর, গিলগিট, চিত্রল, কাফিরীস্তানের অধিবাসীদের পার্থক্য, ইহাদের মধ্যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণ। চিত্রলী ও মাস্তজীদের মধ্যে এই সংমিশ্রণ প্রবল। দক্ষিণ হিন্দুকুশ ছাড়িয়া উত্তর হিন্দুকুশের উপজাতিদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সঙ্কি, বাদাকশানী এবং পামীরের সারিকেলী, ওয়াখী, ইশকাসমী, সিগনানী, রোশানী, গলচা বা পার্বত্য তাজিকদের মধ্যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ক্রমে কমিয়া গিয়া গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য ঘটিয়াছে। পামীরী উপজাতিগুলি প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতে আলপাইন টাইপের নিদর্শন। উজফালভী তাহাদিগকে ইটালীর সাভয়ের অধিবাসীদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

কাশ্মীর

কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান যেরূপ, তাহাতে মধ্য এশিয়ার প্রভাব এখানে সহজে বিস্তার লাভ করিবার কথা। কিন্তু যে কারণেই হউক এই প্রভাব কাশ্মীরে তেমন বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্য কাশ্মীর একটি সীমান্ত অঞ্চল হইলেও সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতীয় এলাকার ইতিহাসের সঙ্গে কাশ্মীরের ইতিহাসের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত লাডাকে তিব্বতী প্রভাব প্রবল। পূর্বে পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার লাহাউল ও স্পিটি পর্যন্ত এই প্রভাব দেখা যায়।

কুমায়ুন অতিক্রম করিলে নেপাল হইতে ভুটান পর্যন্ত আবার এই প্রভাব প্রবল। কাশ্মীর উপত্যকার উত্তরে তাগডুম্বাস পামীর ও পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সাধারণের নিকট অল্প পরিচিত কতকগুলি উপজাতি বাস করে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের পরিচয় জানিতে হইলে ইহাদিগকে উপেক্ষা করা যায় না। হিন্দুকুশ এলাকার উপজাতির প্রসঙ্গে ইহাদের উল্লেখ করা হইবে।

প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস ও কিংবদন্তী হইতে কাশ্মীরের সঙ্গে চীনা তুর্কীস্তানের খোটান প্রভৃতি অঞ্চলের সম্পর্ক যে বহুকাল অবধি বর্তমান ছিল, খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর একটি ঘটনা হইতে তাহা জানা যায়। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাশ্মীর মুসলমান শাসনে আসিবার পরে দ্বিতীয় মুসলমান শাসনকর্তার সময়ে যখন ব্যাপকভাবে ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য জোর জবরদস্তি চলিতে থাকে, তখন বহু কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কাশগড়ে পলায়ন করিবার চেষ্টা করেন। ধরা পড়িয়া তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন কয়েদ থাকিতে হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে রাইনচান নামে একজন লাডাকী কাশ্মীরের লোহারা বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এই ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হইয়া কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান রাজা বলিয়া পরিচিত হন। তৈমুরলঙ্গের ভারত অভিযানের সময়ে সিকন্দর নামে এক ব্যক্তি কাশ্মীরের সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। সিকন্দরের মাতা ছিলেন হিন্দু কন্যা, নাম সুরুত রায়। সিকন্দরের ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী শিবদত্ত ভাট ইসলামে দীক্ষিত হইয়া উৎসাহী হিন্দুপীড়ক হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পরামর্শে রাজা আদেশ দিলেন মুসলমান ব্যতীত আর কেহ কাশ্মীরে বাস করিতে পারিবে না। ফলে 'Many of the Brahmins rather than abandon their religion or their country poisoned themselves; some emigrated to their native homes, while a few escaped the order of banishment by becoming Muhammedans.'

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের লেখকের মতে, "To the people he offered death, conversion or exile. It is said that he burnt seven maunds of sacred threads worn by Brahmins. By the end of

his reign all Hindu inhabitants of the valley, except the Brahmins, had probadly adopted Islam."

সিকন্দরের উপাধি হইয়াছিল "বুটসিকন" বা কালাপাহাড়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইরাক হইতে শাহ কাশেম নুরবকস্ কাশ্মীরে আসিয়া তৎকালীন রাজার সাহায্যে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। অল্পকালের মধ্যেই বহু কাশ্মীরী ও সমগ্র চাক্ উপজাতি ইসলামে দীক্ষিত হয়। কাশ্মীরের শাসন ক্ষমতা চাক্‌দিগের হাতে যায়।

কাশ্মীরের চাক্ জাতি ছাড়া চিব গোষ্ঠীর অধিকাংশ মুসলমান, সামান্য অংশ হিন্দু। ইহারা রাজপুত। জারাল, ভাও, গাম্বার প্রভৃতি গোষ্ঠীর মুসলমান রাজপুত কাশ্মীরে দেখিতে পাওয়া যায়। ঝিলাম উপত্যকার বাম্বো ও খাকাগোষ্ঠীর মুসলমান রাজপুত। জম্মু ও কাশ্মীরের সাড়ে সতের লক্ষ গুজর ও সওয়া লক্ষ জাঠ মুসলমান। কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এইভাবে শতকরা ৮০ দাঁড়াইয়াছে।

অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হইলেও কাশ্মীর উপত্যকায় বাহির হইতে প্রচুর সংখ্যায় ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত লোক প্রবেশ করিবার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে দেখা যায়, কাশ্মীরী হিন্দু ও মুসলমানের বিশিষ্ট স্থানীয় টাইপ অভিন্ন রহিয়া গিয়াছে এবং এই টাইপের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতে, রাজপুতানা ও পাঞ্জাবের মত কাশ্মীরের প্রধান টাইপ জাঠ ও রাজপুত। অর্থাৎ পূর্ব পাঞ্জাব হইতে উপজাতীয় এলাকা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ও কাশ্মীরের অধিবাসীর মধ্যে লম্বামুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। জয়েসের (T. A. Joyce) মতে ' The Kashmiris are undoubtedly to be connected with the Indo-Afghans, yet they present a peculiar and unmistakable type."

অর্থাৎ রাজপুত, জাঠ, গুজর, পাঠানের মত লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীয় হইলেও কাশ্মীরীদিগের চেহারায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার দরুণ তাহাদিগকে চিনিতে ভুল হয় না। এই বৈশিষ্ট্য কি তাহা খুলিয়া বলা হয় নাই। স্যর অরেল স্টাইনের চোখে কাশ্মীরী ও চীনা ও তুর্কীস্তানের খোটানীদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়িয়াছিল; কিন্তু এই সাদৃশ্য কোথায়, তাহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী কাশ্মীরী টাইপের বর্ণনা করিয়া

বলিতেছেন, "L' Aryen Montagnard qu'un melange de cinque sie`cles avec des e'le'ments differents aepassi sans roussir a lui enlever son cachet aryen"……

অর্থাৎ কাশ্মীরীগণ পার্বত্য আর্যজাতি। পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর জাতিসমূহের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের আর্যত্বের ছাপ শুধু ফিকা হইয়াছে, মুছিয়া যায় নাই।

কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতীয় অঞ্চলের অধিবাসী যদি একই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে হয় যে, ভিন্ন গোষ্ঠীর জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণ অন্যত্র যতখানি হইয়াছে, কাশ্মীরে তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। কাশ্মীরের ইতিহাসও এইরূপ ইঙ্গিত করে। সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা বেশী অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায় আর একটি বিষয় হইতে। এই বিষয়টি হইতেছে ভাষা। ভাষার দিক দিয়া সীমান্ত প্রদেশ, উপজাতীয় এলাকা বা পাঞ্জাব অপেক্ষা কাশ্মীরীদিগের বেশী সম্পর্কে হিন্দুকুশ এলাকার উপজাতিদের সঙ্গে।

বেলুচীস্তান

বেলুচীস্তানের মাক্রাণ অঞ্চলের অংশ পিশিন উপত্যকায় নাম আবেস্তায় পাওয়া যায়। বেলুচীস্তান ও সিন্ধু হাকামনি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূর্ত ছিল। খ্রী পূঃ ১৪০—১৩০ অব্দের মধ্যে শক জাতি বেলুচীস্তানে প্রবেশ করে। ইহার পূর্বে তাহারা কাবুল উপত্যকায় বাস করিতেছিল। সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিবার পূর্বে (খ্রীষ্টীয় ৬৪৩ অব্দে) আরবগণ ইরাণ জয় করিয়া মাক্রাণ দখল করে। এই সময় পর্যন্ত বেলুচীস্তানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন নিদর্শন এখনও বেলুচীস্তানে, বিশেষ করিয়া কাচ্ছিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে জেরোষ্ট্রীয়ান ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় বহুসংখ্যক প্রস্তরের বাঁধে। এইগুলি গাবর বাঁধ (gabrbunds) বা অগ্নি উপাসকদিগের বাঁধ নামে পরিচিত। প্রাক-মুসলমান হিন্দুধর্মের নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায় লাসবেলার হিঙ্গুলাজ মাতার মন্দির ও কালাত শহরে দুর্গের নিকট কালী মন্দির বলিয়া পরিচিত মন্দির।

আরব আক্রমণের সময়ে বেলুচীস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে মেড়, আফগান

ও জাঠ ছিল। মেড়দিগের বাস উপকূল অঞ্চলে, আফগানগণ তখ্‌ৎ-ই-সুলোমান অঞ্চলে বাস করিত। জাঠরা ছিল কৃষিজীবী এবং এখনও কাচ্ছি ও লাসবেলায় কৃষিকার্য তাহাদের হাতে। অবশ্য জাঠরা সকলেই ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছে। মারী ও বুগতির পার্বত্য অঞ্চল ও কাচ্ছি বেলুচদিগের প্রধান এলাকা। কোয়েটা হইতে লাসবেলা পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল ব্রাহুইদিগের প্রধান বাসভূমি। বেলুচ শব্দের অর্থ যাযাবর। সাধারণের এই বিশ্বাস প্রচলিত যে ব্রাহুইগণ আসিবার বহু পূর্বে বেলুচরা বেলুচীস্তানে প্রবেশ করিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন বেলুচগণ শক বা সিথিয়ানদিগের বংশধর এবং এই সিথিয়ানগণ ছিল পূর্ব-ইরাণী জাতির লোক। প্রাচীন বেলুচ জাতীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কুর্দ, লুব, তুর্ক, জাঠ, আরব, মোঙ্গল, তাজিক প্রভৃতি জাতির লোক গ্রহণ করা হইয়াছে। বেলুচদিগের ভাষা ইরাণী ভাষা-গোষ্ঠীর শাখা। অর্থাৎ পাখতুন জাতির পুস্ত বা পাখতু ভাষার মত বেলুচ ভাষার সংস্কৃতের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ আছে। ব্রাহুই বা ব্রাহোকি শব্দের অর্থ উচ্চভূমির অধিবাসী বা পাহাড়িয়া। ব্রাহুই জাতি প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপজাতি-গঠিত একটি সমবায় (Brahui Confederacy)। সাধারণতঃ জাতি বলিতে যেরূপ এক গোষ্ঠীর, এক ভাষাভাষী লোক লইয়া গঠিত সমবায় বুঝায় ব্রাহুই সমবায় সেইরূপ জাতি নহে: "The word Brahui seems to be used to signify a coalition of tribes of the hilly country for political purposes··· It has no ethnological significance."

মধ্য এশিয়ার খাজ জাতি এবং জাঠ, আরব, ইরাণী, আফগান উপ-জাতির লোক লইয়া ব্রাহুই জাতিগুলি গঠিত হইয়াছে। এই সকল উপজাতি অনেকগুলি নামে পরিচিত। মামাসেইনগণ পারস্যের লুর উপজাতি হইতে উদ্ভূত, মিরওয়ারিগণ ওমানের আরব বংশীয়। মেনগলগণের মধ্যে ইরাণী, আফগান ও জাঠ সংমিশ্রণ আছে। মারদৈগণ বুলফাত জাডগল বা জাঠ বংশীয়। রাকসানীগণ তাজিক গোষ্ঠীর। মুমরিয়াগণ সম্ভবতঃ গুজর গোষ্ঠীর, কেহ কেহ বলেন রাজপুত। ব্রাহুইদিগের ভাষা কুর্দগলি নামে পরিচিত। বেলুচ ও ব্রাহুই, উভয়ের মধ্যে জাঠ সংমিশ্রণ বর্তমান। ব্রাহুইদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ঝালাওয়ান ও কেজ-মাক্রাণে, এই সংমিশ্রণ প্রবল।

"An analysis of the tribes now calling themselves Baluch

and Brahui shows a very great and acknowledged admixture of Jats in the composition of those tribes. The largest Brahui tribes are by themselves classed as Jatgal which means Jat."

মাক্রান উপকূলের মেড় জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চলে বাস করিতেছে। ইহাদিগকে বেলুচীস্তান ছাড়া সিন্ধুদেশ, কচ্ছ, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি অঞ্চলেও দেখা যায়।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, বেলুচীস্তানের বেলুচ ও ব্রাহুই উভয়েই মিশ্র জাতি। জাঠ সংমিশ্রণ হইতে অনুমান করা যায় যে, তাহাদের মধ্যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ রহিয়াছে। এই সংমিশ্রণ বেলুচীস্তানের অধিবাসীদিগকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সহিত সংযুক্ত করিতেছে। অপর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সহিত। ইরাণের প্রাচীন অধিবাসী তাজিকগণ এই সংমিশ্রণ আনিয়াছে। ডাঃ হেডন বেলুচদিগকে ইন্দো-ইরাণীয়ান টাইপ বলেন। তাঁহার মতে টাইপ হিসাবে বেলুচ ও ব্রাহুইদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। চুটা ও বন্দিযাদিগকে তিনি পামীরী টাইপের বলিতেছেন। অর্থাৎ জাডগলি-ভাষী এই দুইটি উপজাতি গোলমুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত। হিন্দুকুশ এলাকার কয়েকটি উপজাতির মধ্যে যেমন দুই গোষ্ঠীর (ইন্দো-আফগান ও পামীরী) সংমিশ্রণ দেখা যায় বেলুচীস্তানের অধিবাসীদের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। ব্রাহুইদিগের মধ্যে শক ও বিশেষ করিয়া দ্রাবিড় সংমিশ্রণের কথা যাহা বলা হয় তাহা অনুমান মাত্র।

সিন্ধু

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের কাহিনী মহাভারতে পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ ৫১৫ অব্দে সিন্ধু পারস্যের হাকামনি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রীক ইতিহাসে সিন্ধু দেশের কয়েকটি জাতির সহিত আলেকজান্দারের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সিন্ধু পরে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্য শক্তিহীন হইলে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজারা এই অঞ্চলে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে শক জাতি সিন্ধুদেশ আক্রমণ ও দখল করে। শক আধিপত্য এখানে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, প্রাচীন

রোমক ও অন্যান্য দেশের ঐতিহাসিকগণের নিকট সিন্ধুদেশ ইন্দো-সিথিয়া নামে পরিচিত ছিল। শক আক্রমণের পূর্বে সিন্ধুদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই সময়কার সিন্ধুর রাজবংশ জাতিতে রাজপুত এবং চিতোরের রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাজাকে (২য় সহসী) বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ)। এই নূতন বংশের শাসনকালে সিন্ধু রাজ্য সমুদ্র হইতে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অনুমান ৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে বসরার শাসনকর্তা হিজ্জাজ বেলুচীস্তানের মাক্রাণ অধিকার করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। মহম্মদ হারুণের নেতৃত্বে এই বাহিনী মাক্রাণ দখল করে। বহু বেলুচকে এই সময় ইসলামে দীক্ষিত করা হয়। ইহার কিছু পরে সিংহল হইতে খালিফ ওয়ালিদের জন্য উপঢৌকন সামগ্রী বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে একখানি জাহাজ দেবল বা টাট্টার রাজার আদেশে পারস্য উপসাগরের মুখে আক্রান্ত হয়। এই জাহাজের সঙ্গে সাতখানি মুসলমান তীর্থযাত্রী জাহাজ ছিল। সবগুলি জাহান ধৃত হয়। বসরার শাসনকর্তা খালিফের অনুমতি লইয়া বুদমীন নামক একজন প্রধানের অধীনে এক সৈন্যবাহিনী পাঠান টাট্টা আক্রমণ করিবার জন্য। এই বাহিনী পরাজিত হয়। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাশেমের অধীনে ১২,০০০ অশ্বা-রোহীর একটি বাহিনী সিরাজ ও মাক্রাণের পথে টাট্টা আক্রমণ করে। এই বাহিনীর অধিকাংশ লোক ছিল প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আসিরীয়ার অধিবাসী। দেবল ও সেওয়ান হস্তচ্যুত হইবার পর রাজপুত, সিন্ধী ও মুলতানা সৈন্য লইয়া গঠিত এক সৈন্যবাহিনী লইয়া রাজা দাহির বিন কাশেমকে আক্রমণ করেন। দাহির পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার পরাজয়ের পর তাঁহার বিধবা রাণী এক রাজপুতবাহিনী লইয়া মুসলমান বাহিনী আক্রমণ করেন ও সসৈন্যে নিহত হন। বিন কাশেম সিন্ধু দেশের অবশিষ্ট নগরগুলি দখল করিয়া মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং উহা অধিকার করেন।

শক্তিশালী সিন্ধু রাজ্যের পতনের কাহিনী ব্যাখ্যা করিয়া ঐতিহাসিকগণ বলেন: "Sind was a house divided against itself. The King was a Brahman, the Governors of the forts were generally Buddhists."

আরব আক্রমণের সময়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাম্মা জাতির (দক্ষিণ সিন্ধু অঞ্চলের) আচরণের কথায় বলা হইয়াছে, "The Sammas were specially mentioned as coming with dancing and beating of drum to meet the Arab conqueror Muhammad Kasem and to have gladly accepted him" (Elliot's History 1/191.)

কাশেমের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে সিন্ধুর সুমরাগণ আরবদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া রাজশক্তি অধিকার করে। সুমরাবংশীয় রাজারা প্রায় ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সুমরাগণ রাজপুত। ইহারা সম্ভবতঃ ১৪শ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামে দীক্ষিত হয়। সুমরা রাজবংশের হাত হইতে শাসনশক্তি সিন্ধুর সাম্মা রাজবংশের হাতে যায়। এই বংশ যাদোজা রাজপুত। সাম্মা রাজবংশ ১৪শ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলামে দীক্ষিত হয়। সাম্মা রাজাদের উপাধি ছিল জাম। নবনগরের বর্তমান যাদোজা রাজপুত রাজাদের উপাধি জাম।

গুজরাটের মুজঃফর শাহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জাম ফিরোজ শাহ বেগ অর্ঘুন নামক একজন কান্দাহারী সেনাপতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই ব্যক্তি বাবুর কর্তৃক কান্দাহার হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। বেগ অর্ঘুন প্রথমে গুজরাটি সৈন্য বিতাড়িত করিয়া পরে জাম ফিরোজ শাহকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে)। অল্পকালের মধ্যে শাহ বেগের সেনাপতি তুরখান খান প্রভুর বংশকে বিতাড়িত করিয়া দেশ দখল করিয়া লন (১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে)। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর সিন্ধুদেশ অধিকার করেন।

সাম্মা রাজাদিগের শাসনকালে সিন্ধুদেশ পুনঃপুনঃ গজনী, ঘোর ও দিল্লীর রাজাদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং কতকগুলি নগর অধিকৃত হয়। এই সকল নগরে মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিল।

সিন্ধুদেশের অধিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি জাতি বেলুচীস্তান হইতে আসিয়াছে, কতকগুলি রাজপুতানা ও কাথিয়াবাড় হইতে আসিয়াছে। জাঠ, মেড়, মুহানা, মাহার লোহানা, সোধা, সাম্মা, সুমরা সিন্ধুর প্রাচীন অধিবাসী। বেলুচ, ব্রাহুই ও সুমরিয়া বেলুচীস্তান হইতে আসিয়াছে। রাজপুত, কোলি, ভাটিয়া, ভীল ধেদ প্রভৃতি রাজপুতানা ও কাথিয়াবাড় হইতে আসিয়াছে। জাটদের সম্বন্ধে বলা হয় তাহারা প্রাচীনকালে কাচ্ছি হইতে সিন্ধুদেশে প্রবেশ

করিয়াছে। লোহানা, সোধা, কোলি, রাজপুত প্রভৃতি হিন্দু। সুমরা, সাম্মা ও সুর্মবিয়া রাজপুত গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। সিন্ধুর হিন্দু অধিবাসীর অধিকাংশ লোহানা। থর ও পার্কারের সোধা জাতি রাজপুত গোষ্ঠীর। লারকানা ও সুক্কুরের মাহার ও মৎস্য ব্যবসায়ী মুহানা মেড গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়। কেহ কেহ বলেন সিন্ধুর জাঠ ও মেড জাতি প্রাচীন সিথিয়াম বা শকদিগের বংশধর।

সিন্ধু মুসলমানপ্রধান দেশ। প্রাচীন রাজপুত, জাঠ, মেড় জাতি সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। লোহানাদের এক অংশও ধর্ম পরিবর্তন করিয়াছে। তাহারা মেমন নামে পরিচিত। বেলুচ জাতি বহুকাল সিন্ধুতে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং দেশে তাহাদের সংখ্যা কম নহে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, উপজাতীয় এলাকায় যেমন একটি (লম্বামুণ্ড)টাইপের প্রাধান্য দেখা যায় বেলুচীস্তানে ও সিন্ধুদেশে সেইরূপ দেখা যায় প্রাধান্য। বেলুচীস্তানের মত সিন্ধুর এই মিশ্র গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হইয়াছে ইন্দো-ইরান্স; অর্থাৎ লম্বামুণ্ড ইন্দো-আফগান টাইপের সঙ্গে গোলমুণ্ড ইরাণী টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে।

সিন্দু হইতে দক্ষিণে নামিয়া পশ্চিম উপকূল ধরিয়া দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে দেখা যায় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে ও দক্ষিণ মারাঠা দেশ ও কর্ণাটে আসিয়া গোলমুণ্ড টাইপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবের অধিবাসীদের প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, মুসলমান-প্রধান পশ্চিম পাঞ্জাব ও হিন্দু-প্রধান পূর্ব পাঞ্জাবের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত (racial) পার্থক্য আছে কি না?

পাঞ্জাবের প্রাচীন অধিবাসী প্রধানতঃ রাজপুত জাঠ ও গুজর। শিখ জাতি প্রধানতঃ জাঠ গোষ্ঠীভুক্ত। পশ্চিম পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি ও মূলতান বিভাগের কথা ধরা যাউক। রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগের গুজরাত জেলার লোকসংখ্যার ২৬ ভাগ জাঠ ও ১৫ ভাগ গুজর। ইহারা মুসলমান। শাহপুর জেলায় রাজপুত মোট লোকসংখ্যার ১৪ ভাগ। ইহারা মুসলমান। জাঠ-দিগের অধিকাংশ মুসলমান। রাজপুত গোষ্ঠীর খোকর জাতির সকলেই

মুসলমান। পূর্বতন হিন্দু কৃষিজীবী আবান জাতির সকলেই মুসলমান। ঝিলাম জেলায় জাঠ মোট লোক সংখ্যার ১৪ ভাগ। ইহারা মুসলমান। রাজপুত গোষ্ঠীর অধিকাংশ মুসলমান। আবান জাতির সকলেই মুসলমান। গাক্কার জাতি রাজপুত গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনেকে মনে করেন। মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের সময় হইতে ইহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের হাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গাক্কার জাতির সকলেই মুসলমান। রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় রাজপুত মোট লোক সংখ্যার ১৪ ভাগ। রাজপুত, জাঠ ও গুজরদিগের প্রায় সকলেই মুসলমান। আটক জেলায় রাজপুত, জাঠ ও গুজরদিগের সকলেই মুসলমান। আবান জাতির সংখ্যা এ জেলায় খুব বেশী। তাহারা সকলেই মুসলমান। মুলতান বিভাগের মিয়ানওয়ালি জেলায় জাঠগণ মোট লোকসংখ্যার প্রায় ১/৪ অংশ। তাহারা ও রাজপুতদিগের অধিকাংশ মুসলমান। আবানগণ সকলেই মুসলমান। ঝাং জেলায় জাঠ কৃষকের সংখ্যা অধিক। তাহারা ও রাজপুতগণের অধিকাংশ মুসলমান। খোকর ও আবান জাতির সকলেই মুসলমান। মুলতান জেলায় জাঠগণ মোট লোক সংখ্যার ২০ ভাগ। তাহারা ও রাজপুতদিগের অধিকাংশ মুসলমান। সকল খোকর ও আবান মুসলমান। মুজাফরগড় ও ডেরা গাজি খাঁ জেলায় জাঠদিগের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ২৯ ও ২৫। তাহারা এবং রাজপুত জাতির অধিকাংশ মুসলমান। লাহোর বিভাগের মণ্টোগোমেরী, গুরুদাসপুর, শিয়ালকোট, গুজরাণওয়ালায় জাঠ ও রাজপুতদিগের অবস্থা ঐরূপ। পূর্ব পাঞ্জাবের জলন্ধর বিভাগের হোসিয়ারপুরের জাঠদিগের অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান। সমতল অঞ্চলের রাজপুতগণ সকলেই মুসলমান। জলন্ধর জেলায় রাজপুতদিগের ১/৪ অংশ মুসলমান। ফিরোজপুরের রাজপুতদিগের অধিকাংশ মুসলমান। আম্বালা বিভাগের হিসার, কার্ণাল, আম্বালা জেলার অধিকাংশ রাজপুত মুসলমান। গুরগাঁও জেলার মিও জাতি খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে মুসলমান হইয়া যায়। কার্ণাল ও আম্বালা জেলার বহু গুজর মুসলমান।

পাঞ্জাবের প্রাচীন অধিবাসী রাজপুত জাতির কথা আরও কিছু বলা হইতেছে।

পশ্চিম পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চল পুনওয়ার ও ভাট্টি রাজপুতদিগের দখলে

ছিল। ভাট্টি ও পুনওয়ার যদুবংশী রাজপুত। পশ্চিম পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চল ও সল্টরেঞ্জ এলাকা জম্মুজ এবং জম্মু ও কাশ্মীর যদুবংশী ভাট্টি রাজপুতদিগের দখলে ছিল। শিয়াল, তিওয়ানা, ঘেব পরিবারগুলি পুনওয়ার গোষ্ঠীর রাজপুত-বংশীয়। ইহারা ও খররালগণ পাকপট্টনের বাবা ফরিদ কর্তৃক ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল। ভাট্টি গোষ্ঠীর ওয়াণ্ডুগণও বাবা ফরিদের দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত হয়। সল্টরেঞ্জ অঞ্চলের জম্মুজ রাজপুত রাঠোর কুলের। তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ যোধপুর বা কণৌজ হইতে আসিয়াছিল। আবুল ফজলের মতে জম্মুজগণ যদুবংশীয়। কানিংহামের মতে গাক্কারগণ য়িয়ুচী বা তুখার জাতির বংশধর। ফেরেস্তার বর্ণনা অনুসারে মুহম্মদ ঘোরীর আমলে তাহারা মুসলমানদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। ঐ সময়ে তাহাদের একজন প্রধান বন্দী হইয়া ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল। আবানগণকে সুলেমান ও সফেদ-কোহ পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত দেখা যায়। কোন কোন মতে তাহারা ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকদিগের বংশধর। কানিংহামের মতে তাহারা জম্মুজ রাজপুত গোষ্ঠীয়। ইন্দো-সিথিয়ান আক্রমণের সময়ে তাহারা সল্ট রেঞ্জের উত্তরের মালভূমিতে বাস করিত; এই বাসভূমি হইতে তাহাদের দক্ষিণে হঠিয়া আসিতে হয়। মেজর ওয়েস ও আর কোন কোন পণ্ডিতের মতে তাহারা জাঠ। রাওয়ালপিণ্ডির খাট্টর জাতি কানিংহামের মতে য়িয়ুচী গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। তাহাদের মধ্যে এই কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, তাহাদের আদি বাসভূমি আটক হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা আফগানিস্তানে চলিয়া যায় এবং পরে মহম্মদ ঘোরীর সৈন্যদলের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ঝাং ও শাহপুর জেলার খোকরগণকে কেহ রাজপুত, কেহ জাঠ বলেন। কেহ কেহ বলেন রাভী অঞ্চলের খররালাগণ জাঠ ও তাহারা মুকদম শাহ জাহানিয়া কর্তৃক ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল। মুলতান ও মণ্টোগোমেরী জেলার রাভী উপত্যকার কাঠিয়াগণ পুনওয়ার রাজপুতবংশীয়। মুসলমান হইলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিবাহের সময় তাহারা হিন্দু পুরোহিতের দ্বারা কাজ করাইত। কোন কোন অঞ্চলে আবানদিগের মধ্যেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাওয়ালপিণ্ডি ও হাজারা জেলার গাক্কুল বা গাক্কুন জাতি রাজপুত গোষ্ঠীয়।

পশ্চিম পাঞ্জাবের মুলতান ও রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় ভারত বিভাগের পূর্বে

মুসলমানের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮০ হইতে ৯০। পশ্চিম পাঞ্জাবের এই বিস্তৃত ভূভাগ ও কাশ্মীরের মধ্যে জম্মু অঞ্চলের ভাট্টি গোষ্ঠীয় ডোগরা রাজপুতগণ যে কারণেই হউক ধর্ম পরিবর্তন করে নাই। স্যর ডেনজিল ইবেটসন প্রাচীন কিংবদন্তী উল্লেখ করিয়া বলেন যে খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে বহু যদুবংশীয় রাজপুত গুজরাট অঞ্চল হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও আরও উত্তরে উপনিবেশ স্থাপন করে। কাবুল ও কান্দাহারের পার্বত্য অঞ্চলে ইহাদের বংশধরদিগকে পরবর্তীকালে দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাবের অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য আছে কি না এ প্রশ্নের খানিকটা উত্তর উপরের বিবরণ হইতে পাওয়া যাইবে। রাজপুত, জাঠ, গুজর, খোকব, আবান প্রভৃতি উভয় পাঞ্জাবের প্রাচীন অধিবাসী। ধর্ম পরিবর্তনের ফলে জাতিগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় না।

উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানের অধিবাসী

উত্তর প্রদেশ

রিজ্‌লের মতে পূর্ব পাঞ্জাবের শিরহিন্দ হইতে পাঞ্জাবের লম্বামুণ্ড টাইপের সামান্য ব্যতিক্রম আরম্ভ হইয়াছে। যমুনা পার হইয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে এই পার্থক্য ক্রমে পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং দেখা যায় যে, একটি মিশ্র টাইপের এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। রিজ্‌লে এই মিশ্র টাইপের নাম দিয়াছেন আরিও-দ্রাবিড়ী বা হিন্দুস্থানী টাইপ। যমুনা ও গঙ্গার উপত্যকা, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে ও দক্ষিণে মধ্যভারতের মালভূমির উত্তরাংশে এই মিশ্র টাইপ দেখা যায়। এই এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে উচ্চ বর্ণগুলি ইন্দো-আরিয়ান টাইপের নিকটবর্তী এবং নিম্ন বর্ণগুলি দ্রাবিড়ী টাইপের নিকটবর্তী, রিজ্‌লে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

রিজ্‌লের এই ব্যাখ্যার সহজ অর্থ এই যে, তাঁহার মতে এই অঞ্চলের আদি অধিবাসী ছিল দ্রাবিড়, তাহাদের সহিত আগন্তুক আর্য জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইন্দো-আরিয়ান ও ড্রাবিডিয়ান, এই দুইটি টাইপ লম্বামুণ্ড; কিন্তু রিজ্‌লে বলিতেছেন, এই মিশ্র টাইপের মস্তক কতকটা মধ্যমাকৃতির ("with a tendency to the medium")। সুতরাং এই মিশ্র টাইপের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন, তাহা ছাড়াও বলিবার কিছু আছে। গোলমুণ্ড টাইপের সহিত সংমিশ্রণ না ঘটিলে এই পরিবর্তন সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে রিজ্‌লে কিছু বলেন নাই।

এই এলাকার দ্রাবিড় অধিবাসীদের সহিত আর্যগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ইতিহাস সম্বন্ধে দুইটি থিওরী পাওয়া যায়। একটি থিওরী মতে আর্য জাতির প্রথম অভিযানে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা পাঞ্জাব পর্যন্ত দখল করিয়া আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহার পরে আর্য ভাষা-ভাষী জাতির অভিযান চিত্রল ও গিলগিট হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া গঙ্গা ও যমুনার উপত্যকায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই থিওরী ডাঃ হর্ণেলীর। দ্বিতীয় থিওরী মতে পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট আর্যগণ সংখ্যাবৃদ্ধিহেতু যমুনা অতিক্রম করিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। এই অঞ্চলে দ্রাবিড়

জাতির সহিত তাহাদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এই থিওরী রিজলের। তাঁহার মতে যমুনা হইতে গণ্ডকী ও গণ্ডকী পার হইয়া পূর্ববিহার পর্যন্ত এই মিশ্র টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। এই এলাকার মধ্যে আগ্রা, অযোধ্যা, রাজস্থানের অংশ ও বিহার পড়ে। রিজ্‌লে ইহার সহিত সিংহলও যোগ করিয়াছেন, কিন্তু কি যুক্তিতে তাহার উল্লেখ নাই।

ডাঃ গুহের মতে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর প্রাচ্য টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ও বিহারে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই দুইটি টাইপের সঙ্গে কিছু পরিমাণে প্রোটো-নর্ডিক টাইপের সংমিশ্রণ আছে।

উত্তর প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে গোলমুণ্ড টাইপের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের অভিমতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। উত্তর প্রদেশে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রিজ্‌লে মধ্যমাকৃতি ও গোলমুণ্ডের যে শতকরা সংখ্যা দিয়াছেন তাহা নগণ্য নহে। এখান হইতে পূর্বদিকে যত অগ্রসর হওয়া যায়, এই সংখ্যা তত বেশী হইতেছে দেখা যায়।

রিজ্‌লে ও গুহ উত্তর প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন টাইপের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ও এই টাইপগুলির যে সকল নামকরণ করিয়াছেন তাহার বৈচিত্র্য বাদ দিলে প্রকৃত অবস্থা এই দাঁড়ায়, যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায়, যমুনা পার হইলে তাহার সহিত অন্য একটি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই সংমিশ্রণের পরিমাণ। বিহার অভিমুখে যত অগ্রসর হওয়া যায়, তত পরিস্ফুট হইয়াছে। মধ্যমাকৃতি ও গোলমুণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, এই সংমিশ্রণ গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সহিত হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাঞ্জাবের অধিবাসীদের মধ্যেও রিজ্‌লের হিসাবমতে মধ্যমাকৃতি ও গোলমুণ্ডের সংখ্যা উপেক্ষার যোগ্য নহে।

উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুর, মথুরা, বিজনোর, ভরতপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জাঠ অধিবাসী, বুলন্দসর অঞ্চলে গুজর, বিভিন্ন অঞ্চলে রাজপুত ও আলোয়ার, বুলন্দসর অঞ্চলে মিওদের দেখা যায়। মিওরা মুসলমান। জাঠ, গুজর, রাজপুতের প্রায় সকলেই হিন্দু। বিন্ধ্য-কাইমুর পর্বত শ্রেণীতে আদিবাসীদের দেখা যায়।

রাজস্থান

পাঞ্জাবের দক্ষিণে ও উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজপুতানা ও মধ্যভারতের এলাকা। পশ্চিমে থর মরুভূমি, তারপর আরাবল্লী পর্বতমালা, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী ও তাহার উত্তরে মালবের মালভূমি, পূর্বে কাইমুর পর্বতশ্রেণী। মরুভূমি ও পর্বতসঙ্কুল ভূভাগের মধ্যে রাজপুত জাতির প্রধান কেন্দ্র।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ সর্বসম্মতিক্রমে সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজপুতানার অধিবাসীদিগকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়াছেন।

রাজপুতানার অধিবাসীদের মধ্যে রাজপুত, জাঠ ও গুজর প্রধান। সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচীস্তান এবং কাশ্মীরের রাজপুত, জাঠ ও গুজরের অধিকাংশ মুসলমান হইয়াছে। হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করিবার তরঙ্গ পাঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে প্রবাহিত হইয়া অগ্রসর হইবার মুখে মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে ব্যাহত হইয়া যায়, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া রাজপুতানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নহে।

রাজপুত, জাঠ গুজর প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী অথবা ঐতিহাসিক যুগে শক, য়িয়ুচী, হূণ প্রভৃতির দলে এদেশে আসিয়াছিল, ইহা লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। জাঠ ও গুজরদের সম্বন্ধে পরে বলা হইবে, এখানে রাজপুতদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পণ্ডিতগণের যে সকল থিওরীর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা হইবে সেই সকল থিওরীর সঙ্গে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের তথ্য ও সিদ্ধান্তের বিশেষ সম্পর্ক নাই।

রাজপুত জাতি সম্বন্ধে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, তাহারা প্রাচীন ভারতবাসী নহে, তাহারা সিথিয়ান জাতি। ভারতবর্ষের সঙ্গে নাড়ীর যোগ নাই বলিয়া ঐসলামিক প্লাবনের মুখে তাহারা দেশকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে নাই, আপনাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি লইয়া তাহারা ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ইহা ইতিহাসের কথা নহে, ব্যক্তিগত মতের কথা। এ কথা যাউক। রাজপুতদিগের পরিচয় সম্বন্ধে কি জানা যায় দেখা প্রয়োজন।

রাজপুতদিগের সহিত কুশান বা য়িয়ুচী, পারস্যের সাসানীয় বংশ ও হুণদিগের সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে। কেহ কেহ আদিবাসীদের ও গুজরদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন।

এইরূপ একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, মেবারের গোহিল বা শিশোদিয়াগণ কাথিয়াবাডের বলভী হইতে আসিয়াছে। বলভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কণক সেনকে কুশান সম্রাট কণিষ্কের বংশীয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। রবিনসনের মতে বলভীব এক রাজার সঙ্গে পারস্যের শেষ সাসানীয় সম্রাটের কন্যা মহাবানুর বিবাহ হয়। আরব বাহিনী পারস্য দখল করিলে মহাবানু ভারতবর্ষে পলায়ন কবেন। শিশোদিয়া বাজবংশ এই বলভী রাজের এক অধস্তন পুরুষ হইতে উদ্ভূত। কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গুজরাট ও রাজপুতনাব বলগোষ্ঠী ব্যকট্রিযা হইতে আগত য়িয়ুচীদিগের বংশধর। কাথিয়াবাডেব ও বাজপুতনাব জেতবা ও সালা গোষ্ঠী কেহ কেহ হুণদিগেব সম্পর্কিত বলিয়াছেন। ইবেটসনের মত কতকগুলি রাজপুত বংশ, বিশেষতঃ চান্দোল গোষ্ঠী আদিবাসীদিগেব সম্পর্কিত। তাঁহার মতে যে কোন গোষ্ঠী বা জাতি প্রাচীনকালে রাজ্য ও ক্ষমতার অধিকাবী হইত, তাহাকেই রাজপুত বলা হইত। ঝালা, চাবদা চান্দোল প্রভৃতি গোষ্ঠীর গুজর সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে। কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অগ্নিকুলভুক্ত বাজপুত গোষ্ঠীগুলি, যথা চৌহান, প্রমার, পরিহর ও সোলাঙ্কি বা চালুক্য প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক, অগ্নিশুদ্ধির দ্বারা তাহারা হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছে। এই বৈদেশিকগণ হুণ জাতি।

রাজপুতানা ও কচ্ছের কতগুলি রাজপুত গোষ্ঠী পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গুজরাটের উপদ্বীপ বা কাথিয়াবাড হইতে তাহাদের বর্তমান বাসভূমিতে আসিয়াছে। চাবদা, সোলাঙ্কি, বাঘেলা ও গোহিল গোষ্ঠী গুজরাট হইতে আসিয়াছে, কচ্ছের যাদোজা ও সাম্মা, ঝালা, জেতবা সিন্ধু হইতে কচ্ছে প্রবেশ করে এবং কচ্ছ হইতে দক্ষিণ গুজরাটে চলিয়া যায়। কাঠি গোষ্ঠী (তাহাদের নাম হইতে কাথিয়াবাড় নাম আসিয়াছে) পাঞ্জাব হইতে আসিয়াছে। কচ্ছের যাদোজা গোষ্ঠীকে কেহ কেহ প্রাচীন যৌধেয় গোষ্ঠী বলিয়া মনে করেন।

পাঞ্জাবের রাজপুত গোষ্ঠী বহু বিস্তৃত ছিল। দিল্লী ও যমুনার উপত্যকা চৌহান ও তুনওয়ারদিগের দখলে ছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চল বহু

বংশীয় পুনওয়ার বা প্রমার ও ভাট্টিগণের দখলে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চল ও সল্টরেঞ্জ জনুজ রাজপুতদিগের দখলে ও কাংড়া কড়োচ রাজপুতদিগের দখলে ছিল।

পশ্চিম পাঞ্জাব ভাট্টিদিগের প্রথম রাজধানী (অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ) ছিল গজনীপুরে। কানিংহামের মতে গজনীপুর রাওয়ালপিণ্ডির কাছে ছিল। খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে ইন্দো-সিথিয়ান বা শকদিগের আক্রমণে তাহারা ঝিলাম নদী পার হইয়া দক্ষিণ-পূর্বে সরিয়া আসে। একটি কিংবদন্তী মতে তাহারা প্রথমে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর হইতে, পরে সল্টরেঞ্জ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হয়। ইহার পরে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র হয় শিয়ালকোট। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে গজনীর মাহমুদের ভারত আক্রমণের সময়ে ঝিলামের পশ্চিম তীরে ভেরা নামে একটি শক্তিশালী ভাট্টিরাজ্য ছিল। সে যাহা হউক, ইহার পরে তাহাদের কেন্দ্র হয় পাঞ্জাবের ভাটিয়ানা। বিকানীর ও যয়শল্মীরের রাজবংশ ভাট্টি রাজপুত। লাহোর ও মূলতানে বহু মুসলমান ভাট্টি রাজপুত দেখা যায়। যদু বংশীয় জনুজ রাজপুতদিগের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের মত এই যে, "They are probably the Aryan inhabitants of the Punjab proper who have retained their original territory for the longest period except the Rajputs on the Kangra hillsi."

পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজপুত গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য জাতির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুসলমান ওয়াত্তু, জোয়াট, শিয়াল, ঘেব, তিওয়ানা, চিব, গাক্কার, খোকর, খররাল, কাঠিয়া প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে সিন্ধু নদের পশ্চিমে সীমান্ত অঞ্চল হইতে সমগ্র পাঞ্জাবে, সিন্ধু, কচ্ছ ও দক্ষিণ গুজরাটে রাজপুত গোষ্ঠী ছড়াইয়া ছিল। ইহার মধ্যে পাঞ্জাবকে তাহাদের প্রাচীনতম কেন্দ্ররূপে দেখা যায়। পাঞ্জাবের প্রাচীনতম কিংবদন্তী মতে এই কেন্দ্রের অস্তিত্ব খ্রীঃ পূঃ ৬০০ বৎসরে বিদ্যমান ছিল। পর পর বৈদেশিক আক্রমণের চাপে সিন্ধুর পশ্চিম তীর হইতে ক্রমে দক্ষিণ দিকে তাহাদিগকে সরিয়া আসিতে ও ছড়াইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু গজনীর মাহমুদের আক্রমণের সময় পর্যন্ত সল্টরেঞ্জে তাহাদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল এবং ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত থাইবার

গিরিপথের কর্তৃত্ব তাহাদের হাতে ছিল ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীর তাহাদের অধিকারে ছিল, তারপর আবার ইসলামে দীক্ষিত রাজপুত চাক জাতির হাতে আসে। আকবর কাশ্মীর দখল করেন চাকদিগের হাত হইতে। উপজাতীয় এলাকার ওয়াজির জাতি যে রাজপুত গোষ্ঠীর তাহা আগে বলা হইয়াছে। ইবেটসনের একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে: "Many Yaduvansi Rajputs migrated from Gujerat long before Christ and were afterwards found in the hills of Kabul and Kandahar."

অনেকের মতে রাজপুত জাতি সিথিয়ান। উপরে একথার উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা যাহাদিগকে সিথিয়ান বা ইন্দো-সিথিয়ান বলেন তাহাদের মধ্যে শক, য়িয়ুচী বা কুশান, কিদারা বা ছোট য়িয়ুচীর নাম উল্লেখ করা যায়। কেহ কেহ জাঠ, আভীর ও মেড়দিগকেও সিথিয়ান নাম দিয়াছেন। শক ও য়িয়ুচীদের কথা পরে বলা হইবে। এখানে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে শক আক্রমণ খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর ঘটনা। পশ্চিম ভারতে যে দুইটি শক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের কাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। য়িয়ুচী বা কুশান শক্তি উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে। শক আক্রমণের উল্লেখ করিয়া একজন ঐতিহাসিক বলিতেছেন: "Sakas in their march into India met with a barrier in Vikramaditya of Ujjein; on the east of Sind, the great desert beyond which were the Rajput races, was a barrier."

পাঞ্জাবে রাজপুত জাতির ইতিহাসের সহিত শক ও য়িয়ুচীদিগের ভারতবর্ষে আগমনের সময় ও সম্প্রসারণের ইতিহাস মিলাইলে রাজপুতগণের শক বা সিথিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহা ছাড়া, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের সাধারণ ধারণা এই যে, সিথিয়ানরা গোলমুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত। গোলমুণ্ড সিথিয়ান জাতি হইতে লম্বামুণ্ড জাতির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে।

রাজপুতানার জাঠ ও গুজরদিগকে সীমান্ত প্রদেশ, উপজাতীয় এলাকা, পাঞ্জাব ও বেলুচীস্তানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় জাঠের পেশা কৃষিকার্য ও গো-পালন। পাঞ্জাবে তাহারা ভূম্যধিকারীও বটে। কেহ কেহ বলেন জাঠ শব্দের অর্থ কৃষক এবং জাঠকী অর্থ কৃষিকার্য। জাঠদের মধ্যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে তাহারা শিবের জটা হইতে উদ্ভূত। রাজপুত সামাজিক মর্যাদায় জাঠ অপেক্ষা উচ্চ কিন্তু পাঞ্জাবে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে রাজপুত মর্যাদা হারাইয়া জাঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, আবার জাঠ রাজপুতের মর্যাদায় উঠিয়াছে। সীমান্তের পাঠানপ্রধান অঞ্চলে পুনওয়ার, তুলওয়ার, ভাট্টি প্রভৃতি গোষ্ঠীর রাজপুত মর্যাদা হারাইয়া জাঠ নামে পরিচিত হইয়াছে।

কেহ কেহ জাঠ ও রাজপুতকে পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন। কানিং-হামের মতে জাঠ ইন্দো-সিথিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। তিনি ষ্ট্রাবোর উল্লিখিত জান্থি (Zanthi) ও প্লিনির উল্লিখিত 'জাইতি' (Jatii) ও জাঠ অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে অক্সাস উপত্যকা হইতে জাঠ খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। কর্ণেল টডের মতে জাঠ ও রাজপুত এক গোষ্ঠীভুক্ত। তিনি এবং আরও কেহ কেহ গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণের Getae ও জাঠ অভিন্ন মনে করেন। জেটিদিগকে ইঁহারা সিথিয়ান মনে করিতেন। একজন লেখক সিথিয়ানদের সম্পর্কে বলিতেছেন : "No one any longer doubts that the Scythians of Europe and Asia were merely the outer, uncivilised belt of the Iranian family." (J.R.A.S. 1906 p. 198)

কেহ কেহ সিষ্টানের অধিবাসীদের মধ্যে জাঠ গোষ্ঠী আছে বলিয়াছেন। কেহ আবার খ্রীষ্টীয় ৩য় হইতে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে আর্মেনিয়ায় জাঠ উপনিবেশের অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। (J. A. S. B. Vol. v. P. 331, 1836) ইবেটসনের মতে রাজপুত ও জাঠ এক গোষ্ঠীভুক্ত। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। আদিবাসীদের সঙ্গেও সংমিশ্রণ হইয়াছে। ইবেটসনের মতে রাজপুত ও জাঠ আরিও-সিথিয়ান গোষ্ঠীর জাতি, কিন্তু সিথিয়ান আর্য গোষ্ঠীয় হইলেও হইতে পারে, তাঁহার মনে এই সন্দেহ আছে। কেহ কেহ বলেন, জাঠ ও মেড় এই দুই সিথিয়ান জাতি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে শক আক্রমণের সময় সিন্ধু ও পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিল।

উপরের বিবরণ হইতে এই পর্যন্ত পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, রাজপুত ও জাঠ এক গোষ্ঠীভুক্ত, ইহাই মোটামুটি মত। এই মত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং জাঠ সিথিয়ান হইলে রাজপুতও সিথিয়ান। কিন্তু ইহারা উভয়েই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর। এই প্রসঙ্গে স্যর হারবার্ট রিজ্‌লের অভিমত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, যে সকল শক, য়িয়ুচী প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের কি হইল এই প্রশ্নের উত্তরে অনুমান করা হইয়াছে যে রাজপুত ও জাঠ জাতি তাহাদের বংশধর। হেরোডোটাসের Getae ও জাঠ অভিন্ন, এই ধারণা এই অনুমানের উপর ভিত্তি। কিন্তু রোমানগণ Getae ও গথ এক বলিয়া মনে করিত। তারপর তিনি বলিতেছেন: "The Scythian invaders came from a region occupied exclusively by broad-headed races and must themselves have belonged to that type. So they can not be identified with the Jats and Rajputs."

সে যাহা হউক, রাজপুত ও জাঠের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পূর্ব পাঞ্জাবের ফুলকীয়ান শিখ রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠাতার ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। যয়শল্মীরের ভাটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিদ্রোহের ফলে দেশ ত্যাগ করিয়া হিসারে বাস করিতে আসেন। ইঁহার পুত্র দিল্লীর সুলতান আলতামসের আমলে সিরসা ও ভাতিন্দার শাসক নিযুক্ত হন। ইঁহার এক বংশধর এক জাঠ নারীকে বিবাহ করিয়া রাজপুত বংশগৌরব নষ্ট করেন। ইঁহার এক অধস্তন পুরুষ ফুলের দুই পুত্রের দ্বারা ঝিন্দ, নাভা ও পাতিয়ালার শিখ রাজবংশ স্থাপিত হইয়াছে।

জাঠ জাতি সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে, রাজপুতানায়, মধ্যভারতে ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ছড়াইয়া আছে।

সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচীস্তান ও সিন্ধুতে মুসলমান জাঠ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণ আফগানিস্তানের কোন কোন আফগান গোষ্ঠী জাঠ। সিষ্টানের বরোজ জাঠ নামে একটি জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ইরাণী ভাষা বলে। পারস্ত ও কালাতের সীমানায় পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী দস্তিয়ারী ও রাহু জেলায় জাঠদিগের উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। বেলুচীস্তানের ব্রাহুইদিগের "জাডগল" নামে পরিচিত উপজাতিগুলি

জাঠ। কাচ্ছি ও লাস বেলায় জাঠগণ সংখ্যায় প্রবল। সিন্ধু দেশের জাঠগণ বেলুচীস্তানের মাক্রাণ হইতে আসিয়াছে। সীমান্তের কোন কোন পাঠান উপজাতির মধ্যে জাঠ সংমিশ্রণের কথা আগে বলা হইয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের সবগুলি জেলাতে জাঠ আছে। ইহারা মুসলমান। পূর্বপাঞ্জাবের জাঠগণ অধিকাংশ হিন্দু ও শিখ। পাঞ্জাবে হিন্দু জাঠের সংখ্যা প্রায় ৬১ লক্ষ রাজপুতানায় প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ জাঠ বাস করে। আলোয়ার, ভরতপুর, বিকানীর, বুন্দী, জয়পুর, মারবাড় ও মেবারে ইহারা ছড়াইয়া আছে। কাশ্মীরের জাঠদের কথা বলা হইয়াছে।

ইহার পর গুজরদিগের কথায় আসা যাইতে পারে।

কানিংহামের মতে গুজর বা গুর্জর কুশান, য়িয়ুচী বা তোখারি জাতি। খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল হইতে গুজরদিগের এক অংশ দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে এই দল সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে যাহারা রহিয়া গিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দক্ষিণ মুখে যে দল চলিতে আরম্ভ করে তাহারা রাজপুতানা হইয়া গুজরাটে প্রবেশ করে। কেহ কেহ গুজর, জুবান-জুয়ান ও খাজার এক জাতি অর্থাৎ হুণ গোষ্ঠীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে মেড় ও গুজর উভয় জাতি এক গোষ্ঠীভুক্ত। এই মেড় জাতি ভারতের ইতিহাসে মৈত্রক বা মিহির নামে পরিচিত। একটি মতে গুজর সিথিয়ান বা তুর্ক গোষ্ঠীয়। অন্য একটি মতে গুজর জাতি জর্জিয়ার অধিবাসী। জর্জিয়া পারস্যের ইতিহাসে গুর্জিস্থান নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, সিষ্টানের গৌদার (Gaudar) ও গুজর অভিন্ন। হেলমণ্ড উপত্যকার পশ্চিমে জমিনদারে ও গিরিস্কের উত্তরে গুজরদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দলের মতে বেলুচীস্তান ও সিন্ধুর মুমরিয়া জাতিও গুজর। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ হুণদিগের পরাজয়ের পরে ইহারা বেলুচীস্তান ও সিন্ধু হইয়া পশ্চিম ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে গুজর জাতি সম্ভবতঃ হূণদিগের সহিত সম্পর্কিত।

কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম পাঞ্জাবে সল্টরেঞ্জ ও পাঞ্জাব হিমালয়ের পূর্ব অঞ্চলে গুজর জাতি অতি প্রাচীন অধিবাসী। পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজরাট জেলার নাম এই প্রাচীন অধিবাসীদের নাম হইতে আসিয়াছে। পাঞ্জাব

হইতে গুজরদিগের বিভিন্ন দল রাজপুতনায় প্রবেশ করে। খ্রীষ্টীয় ৫ম হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম রাজপুতানায় তাহারা একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ভিলমাল বা শ্রীমাল এই রাজ্যের রাজধানী। গুজর-প্রতিহার রাজ্যের ইতিহাস সুপরিচিত। ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে ভিলমাল ও পরে কণৌজের পরিহার রাজবংশ রাজপুত বলিয়া পরিচিত হইলেও এই বংশ গুজর বা গুর্জর গোষ্ঠীয়। গুজরাটের ভারোচে এই বংশের একটি শাখা রাজত্ব করিত। গুজরাট প্রদেশের নাম গুজরদিগের নাম হইতে আসিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে গুজর জাতি গুজরাটে প্রবেশ করে এইরূপ বলা হইয়াছে।

গুজর জাতি খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমনকারী কুশান, য়িয়ুচী বা তোখারিদিগের গোষ্ঠীভুক্ত অথবা খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর হুণ আক্রমণকারীদের গোষ্ঠীভুক্ত, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার উপায় নাই। এ সম্পর্কে প্রচলিত ঐতিহাসিক মত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে না। এই কথা রাজপুত, জাঠ, গুজর সকলের সম্বন্ধে খাটে। এই তিনটি জাতি লম্বামুণ্ড টাইপের, এই টাইপের সহিত অন্য টাইপের অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ হইয়াছে। ইহারা শুধু এক বা সমগোষ্ঠীয় নহে, ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাদের সম্প্রসারণের ব্যাপারেও দেখা যায় যে ইহারা পাশাপাশি রহিয়াছে।

বেলুচীস্তানের নাগ্রি ও গুরগানানিস নামক ব্রাহুই উপজাতি দুইটিকে গুজর গোষ্ঠীয় বলা হয়। সীমান্ত প্রদেশে ও উপজাতীয় এলাকায় গুজরদিগের উপস্থিতির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। পূব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে গুজরদিগের সংখ্যা লোকসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ। ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান। উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় পৌনে চার লক্ষ, মধ্যভারতে প্রায় সওয়া লক্ষ রাজপুতানায় সওয়া পাঁচ লক্ষ গুজর বাস করে। আলোয়ার, ভরতপুর, ঢোলপুর, জয়পুর, কোটা, মারবাড় ও মেবারে ইহারা ছড়াইয়া আছে। ইহাদের অধিকাংশ হিন্দু। গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের গুজরগণ হিন্দু। কাশ্মীরের প্রায় চার লক্ষের বেশী গুজরের অধিকাংশ মুসলমান।

গুজর জাতি প্রধানতঃ পশুপালন ও কৃষিকার্য করিয়া জীবিকা অর্জন করে। গুজর বাদে আর একটি গোষ্ঠী আছে যাহাদের প্রধান জীবিকা পশুপালন। ইহারা যাদব নামে পরিচিত। প্রায় দেড় কোটি যাদব গোষ্ঠীভুক্ত

উপজাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে আভীর বা আহিরগণের উল্লেখ করা আবশ্যক।

কানিংহামের মতে জাঠ, মেড় ও গুজরের মত আভীর জাতিও ইন্দো-সিথিয়ান এবং খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া হইতে আসিয়াছিল। তাঁহার মতে পাঞ্জাবের ও সিন্ধু দেশের আভিরীয়ায় আবর বা শূ জাতির বসতি ছিল। অভিসার নাম আলেকজান্দারের সমসাময়িক ও পরবর্তী গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এবং উত্তর সিন্ধুর আভিরীয়া, সাবেরীয়া বা ইবিরীয়া নাম টলেমী উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ পশ্চিম উপকূলের তাপ্তী হইতে দেবগড় পর্যন্ত অঞ্চলকে আভিরীয়া নাম দেন। একজন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে আভীর বা আহির জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে আভিরীয়া নাম যে জাতির নাম হইতে আসিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা ইহারা প্রাচীনতর জাতি। কেহ কেহ বলেন, সিষ্টানে যে হাবিল ও আভিল জাতিকে দেখা যায়, তাহারা বাস্তবিক পক্ষে ভারতের আভীর জাতি।

মধ্যভারতের একটি বিস্তৃত অঞ্চল আহিরবাদ নামে পরিচিত। অসিরগড়ের আহির রাজ্য আশু ও খান্দেশের গাবলী রাজবংশ ইতিহাসে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজারা সম্ভবতঃ জাতিতে আহির ছিলেন।

উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ইহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাংলা, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও অন্যত্র ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজপুতনার ভীল জাতির মধ্যে গুজর-সংমিশ্রণ ও মীনাদিগের সহিত মিও ও মেড়দিগের সম্পর্কের কথা কেহ কেহ বলিয়াছেন।

পূর্ব পশ্চিম ও মধ্যভারতের অধিবাসী

পূর্ব ভারত

পূর্ব ভারত বলিতে বিহার, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা এবং সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা লইয়া গঠিত আসাম প্রদেশ বুঝিতে হইবে।

সাধারণে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, বাঙ্গলা বয়সে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা আধুনিক, গঙ্গার পলি মাটি লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা একই সময়ে গঠিত। উত্তরে হিমালয় ও শিবালিক ও দক্ষিণে বিন্ধ্য, এই দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী উত্তর ভারতবর্ষের সমগ্র অঞ্চল গঠিত হইয়াছে একই প্রাকৃতিক কারণে ও একই যুগে। যে প্রচলিত বিশ্বাসের কথা বলা হইয়াছে তাহা কিছু পরিমাণে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহানার ব-দ্বীপ অঞ্চলের সম্বন্ধে খাটে। পাঞ্জাবের সমতল ভূমি, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার অপেক্ষা বাঙ্গলাকে আধুনিক মনে করিবার কারণ নাই।

বাঙ্গলার বয়স সম্বন্ধে এই প্রচলিত বিশ্বাস ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা যাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল সেই জাতির বঙ্গদেশে সম্প্রসারণ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থাৎ, বাঙ্গলা আর্যজাতির সম্প্রসারণের এলাকার বহির্ভূত অঞ্চল কতকটা এইরূপ ধারণা অনেকের মনে আছে।

এই ধারণার মূলে আছে য়ুরোপীয় আর্যবাদ কর্তৃক প্রচারিত বৈদেশিক আর্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের থিওরী এবং এই থিওরীর উপর গঠিত বঙ্গদেশের অধিবাসীদেব সম্বন্ধে স্যর এলবার্ট রিজ্‌লের বহুল প্রচারিত ভিত্তিশূন্য অভিমত। তাঁহার মতে বাঙ্গলায় ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে। সাধারণের একথা তেমন জানা না থাকিলেও প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ বহু পূর্বে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতে বাঙ্গলায় অমোঙ্গলীয় গোলমুণ্ড জাতির প্রাধান্য দেখা যায়। এই জাতিকে আলপাইন, পামীর, আল্পো-দিনারিক, দিনারিক

প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব ভারতের সমগ্র এলাকার মধ্যে বাঙ্গলাতে গোলমুণ্ড জাতির বিশেষ প্রাধান্য বর্তমান। সুতরাং বাঙ্গলাকে কেন্দ্র ধরিয়া পূর্ব ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণের প্রশ্নের আলোচনা করা যাইতে পারে। বাঙ্গলাকে কেন্দ্র ধরিয়া এই প্রশ্নের বিচার করিলে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক হিসাবে এলাকাগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যাইতে পারে ;

বঙ্গদেশ—বিহার—পূর্ব যুক্তপ্রদেশ।

বঙ্গদেশ—উড়িষ্যা—অন্ধ্র।

বঙ্গদেশ—সুরমা উপত্যকা—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা—ব্রহ্মদেশ।

বাঙ্গলা হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরিয়া পশ্চিমে অগ্রসর হইতে থাকিলে বাঙ্গলায় যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায় দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে উপস্থিত হইলে দেখা যায়, সেই প্রাধান্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। উত্তর বিহারে অগ্রসর হইলে দেখা যায়, সংমিশ্রণের পরিমাণ আরও কমিয়া লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য আরম্ভ হইতেছে। বিহার অতিক্রম করিয়া পূব যুক্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলে দেখা যায়, লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যদিও গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর উপস্থিতির পরিচয়ের অভাব নাই। ইহার পর বাঙ্গলা হইতে উপকূল ধরিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রথমে গোলমুণ্ড ও মিশ্র টাইপের জাতি, তারপর আরও দক্ষিণে মহানদী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে লম্বামুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার পর পূর্বদিকে বাঙ্গলা হইতে আসামের দিকে অগ্রসর হইলে প্রথমে গোলমুণ্ড জাতি, তাহার পর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বঙ্গদেশীয় গোলমুণ্ডের সহিত ইন্দো-বার্মিজ ও অন্যান্য টাইপের মিশ্র জাতি, তাহার পর ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অঞ্চল হইতে ইন্দো-বার্মিজ গোষ্ঠীর প্রাধান্য আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর বঙ্গ ও আসামের সংলগ্ন অঞ্চলে, পূর্ববঙ্গ ও আসামের সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় ও ইন্দো-বার্মিজ গোষ্ঠীর মিশ্র জাতি বাঙ্গলার সীমানার মধ্যে কিছু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের ও উত্তর বঙ্গের মুসলমান কৃষিজীবির মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত লোকের কথা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ বলিয়াছেন।

উপরের এই বিশ্লেষণ হইতে একটা প্রশ্ন উঠে। রিজ্‌লে সাহেবের মনেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত তিনি এই প্রশ্নের একটা উত্তর

দিয়াছেন। এই প্রশ্ন বাঙ্গলার গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে। রিজ্‌লে ইহার সহজ ব্যাখ্যা এই দিলেন যে, এই গোষ্ঠী পূর্ব অঞ্চল হইতে অগ্রসর হইয়া বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার গোলমুণ্ড জাতি মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত নহে। তাহা ছাড়া পশ্চিমে পূর্ব যুক্তপ্রদেশ পর্যন্ত এই জাতির উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর ইহা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। প্রশ্ন উঠে, এই অমোঙ্গলীয় গোলমুণ্ড জাতি কোথা হইতে আসিয়াছিল ?

যদি অনুমান করা যায় যে, সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরিয়া এই জাতি বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছিল তাহা হইলে এই কথা মনে না করিয়া উপায় নাই যে, পরবর্তীকালে আগন্তুক ভিন্ন গোষ্ঠীর জাতির সংখ্যাধিক্যের চাপে সিন্ধু গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর ভাগে এই জাতির অস্তিত্বের চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে। এই অনুমান সত্য হইতে পারে, কিন্তু নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ বাঙ্গলায় এই গোলমুণ্ড জাতির উপস্থিতির আর একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদিগের কথা বলিবার সময় এই ব্যাখ্যার কথা বলা হইবে।

বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের অভিমত সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক।

রিজ্‌লে সাহেবের অভিমতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে বাঙ্গালীরা দ্রাবিড় ও মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের মিশ্র টাইপের জাতি। এই টাইপকে তিনি বাঙ্গালী টাইপ নাম দিয়াছেন। তাঁহার মতে উত্তরে হিমালয়, পূর্বে আসাম পর্যন্ত এই টাইপকে দেখা যায় এবং উড়িষ্যার অধিবাসীদের অধিকাংশ এই টাইপের। পশ্চিমবঙ্গে দ্রাবিড় সংমিশ্রণ প্রবল, পূর্ববঙ্গে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ প্রবল। ডাঃ হাটনের মতে সিন্ধু উপত্যকার গোলমুণ্ড পামীরী জাতি বৈদিক আর্যজাতির চাপে গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া বাঙ্গলায় পৌছায়। তাহার পর তিনি বলিতেছেন যে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই বাঙ্গালী টাইপ আসাম ও উড়িষ্যার মধ্যে কীলকের আকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে আসাম ও উড়িষ্যার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতি বিভাগ, ধর্ম ও ভাষার সাদৃশ্য আছে, বাঙ্গলার অধিবাসীদের সঙ্গে নাই। এখানে বলা আবশ্যক বাঙ্গালী, উৎকলী ও আসামীদিগের মধ্যে জাতি ও কৃষ্টিগত পার্থক্য সম্বন্ধে ডাঃ হাটনের মত স্বকপোলকল্পিত, ইহার কোন ভিত্তি নাই। ডাঃ হেডনের মতে গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে ইন্দো-

আফগান টাইপের সঙ্গে আদিবাসীর সংমিশ্রণ ও পূর্ববঙ্গে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ দেখা যায়। পার্জিটর নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী নহেন ; তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গলার আর্যজাতির সঙ্গে সমুদ্রপার হইতে আগত কোন একটি জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। এই আগন্তুক জাতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে বাঙ্গলার গোলমুণ্ড জাতি তাকলা মাকান মরুঅঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব তুর্কীস্তান হইতে আগত অবৈদিক আর্যজাতি। ঘুরীর মতে (Ghurye) বাঙ্গালী টাইপ গোলমুণ্ড আলপাইন ও লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় বা ব্রাউন জাতির সংমিশ্রণের ফল। তিনি বলেন, এই টাইপ উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছে। তাঁহার মতে এই গোষ্ঠী সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। কোথা হইতে আসিয়াছে ও তাহাদের সম্পর্কিত জাতি কে তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ বাঙ্গলায় গোলমুণ্ড জাতির প্রাধান্য দেখা যায় স্বীকার করিয়া ইহার নাম দিয়াছেন আল্পো-দিনারিক বা দিনারিক (Alpo-Dinaric or Dinaric)। তাঁহার মতে বাঙ্গালার অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ জাতিগত সম্পর্ক দেখা যায় কানাড়ী গুজরাটি, মারাঠি ও উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে।

পণ্ডিতগণের এই সকল মতের সার নিষ্কর্ষণ করিলে এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গলায় গোলমুণ্ড ও গোলমুণ্ডের সহিত লম্বামুণ্ড টাইপের সংমিশ্রণ দেখা যায়। বাঙ্গলার এই গোলমুণ্ড টাইপের সম্পর্ক পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সঙ্গে এবং লম্বামুণ্ড টাইপের সম্পর্ক সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সঙ্গে।

পূর্ব ভারতে বিহার, বাঙ্গলা, উড়িষ্যা ও আসাম একটি গোষ্ঠী ও কৃষ্টিকেন্দ্রের এলাকাভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চল। এই কেন্দ্রের মধ্যে নেপালকেও অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে। ডাঃ গুহের মতে "A subsidiary drift of the Dinaric race probably took place from the north-western Himalayas into western Nepal."

বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতিগত সম্পর্ক কিরূপ ইতিপূর্বে তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন সাহিত্যের আমল হইতে পূর্ব ভারতের এই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে

মগধ ও বঙ্গের এক সঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদে অঙ্গ ও মগধের একত্র উল্লেখ আছে। পরবর্তী সাহিত্যে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, ওড্র, কলিঙ্গ, প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপের পুনঃপুনঃ একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ পরবর্তীকালে চম্পা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মগধ, চম্পা, মোদাগিরি (মুঙ্গের) ও কাঁকজোল (রাজমহল) খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে পৃথক রাজ্য ছিল। কাঁকজোলের সীমানা দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ ও মোদাগিরির সীমানা দামোদর ও বরাকর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চম্পার সীমানা বর্ধমানের মধ্যে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শিশুনাগ বংশের আমল হইতে মগধ পূর্ব ভারতের প্রধান রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। মৌর্য ও গুপ্ত আমলে ইহা সমগ্র ভারত-বর্ষের প্রাণকেন্দ্র ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরে বরেন্দ্রীর পাল বংশের আমলে মগধ পুনরায় পূর্ব ভারতের প্রধান কেন্দ্র হয়। মহাকাব্যের যুগে ওড্রদেশ পশ্চিম বঙ্গের অংশ ও মানভূম এবং সিংভূমের অংশ লইয়া গঠিত ছিল। কানিংহামের মতে ওড্রগণ কলিঙ্গদিগকে বিতাড়িত করিয়া পরবর্তীকালে সমগ্র উড়িষ্যা দেশ দখল করে। রঘুবংশের বর্ণনা মতে কলিঙ্গ বঙ্গের দক্ষিণে কপিশা নদী হইতে মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কপিশা মেদিনীপুরের কাঁসাই নদী। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের সীমানা পূর্বে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাঢ় বা সুহ্মের সীমানা পশ্চিমে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বঙ্গের সীমানা এক সময়ে উত্তরে খাশিয়া পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বঙ্গের আর একটি নাম ছিল হরিকেল। ৭ম শতাব্দীর কর্ণ সুবর্ণ রাজ্য মেদিনীপুর হইতে সিরগুজা ও উত্তরে দামোদর হইতে দক্ষিণে বৈতরণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৃষ্টির দিক দিয়া মিথিলা, বঙ্গ ও উৎকলের এবং বঙ্গ, কামরূপ ও নেপালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রসিদ্ধ।

পূর্ব ভারতের অধিবাসীদের কথা বলিবার সময় সাঁওতাল পরগণা ও রাজমহল, মেদিনীপুর হইতে সিংভূম, বাঁকুড়া ও বীরভূম, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহ ও ছোটনাগপুর, ছোটনাগপুর হইতে বিন্ধ্য-কাইমুর পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীর বিভিন্ন উপজাতির কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আগে দেওয়া হইয়াছে। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার আদিবাসীর সংখ্যা সমগ্র ভারতবর্ষের আদিবাসীর সংখ্যার মোট অর্ধেক হইবে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে যাহারা অস্পৃশ্য বা জল অনাচারণীয় জাতি তাহারা আদিবাসীদিগের স্তর হইতে আসিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত রক্ত-সংমিশ্রণ আছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের প্রভাবে আসিয়া আদিবাসী হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে, হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়াছে। আদমসুমারীতে ইহাদিগকে exterior castes বলা হইয়াছে। সমগ্র ভারতে ইহাদের সংখ্যা সওয়া পাঁচ কোটির উপর।

পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অর্থাৎ বিহার, উড়িষ্যা, আসামের অধিবাসী হইতে বাঙ্গলার অধিবাসীদিগের একটি বিষয়ে পার্থক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পার্থক্য বাঙ্গলায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীর প্রাধান্য।

পূর্ব ভারতের এই অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রথমে বিহার কুতুবুদ্দিন আইবকের খালজী সেনাপতি কর্তৃক বিজিত হয়। বিহার বিজয়ের অনুমান দুই বৎসর পরে পশ্চিম বঙ্গ বিজিত হয়। সম্ভবতঃ ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র বঙ্গদেশে বিজিত হয়। বাংলা তিন অংশে বিভক্ত হইয়া লক্ষণাবতী, সপ্তগ্রাম ও সোনারগাঁ হইতে তিনজন শাসনকর্তা দেশ শাসন করিতে থাকেন। সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমগ্র প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া এককর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়া। তাঁহার সময়ে গণ্ডকী নদী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর বিহার বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্ট বিজিত হয়।

দেখা যাইতেছে যে বিহার ও বাঙ্গলা প্রায় একই সময় হইতে ইসলামধর্মী রাজশক্তির করায়ত্ত হইয়াছিল।

বিহার ও বাঙ্গলার অধিকাংশ বিজয় করিয়া ইক্‌তিকারউদ্দীন খালজি কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারপর গিয়াসুদ্দীন তোগ্রল খাঁ ও হুসেন শাহ আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ব্যর্থমনোরথ হন। ইহার বহু পরে ঔরঙ্গজেবের আমলে মীরজুমলা কামরূপ আক্রমণ করিয়া আংশিকভাবে কৃতকার্য হন, কিন্তু সমগ্র আসামে মুসলমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই।

বঙ্গে মুসলমান প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে কয়েকজন রাজা পুনঃ পুনঃ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পর্যুদস্ত হইয়াছিলেন। আলাউদ্দীন তোঘান পরাজিত

হইয়া পলায়ন করিলে উড়িষ্যার সৈন্যবাহিনী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গৌড় অবরোধ ও বীরভূমের রাজধানী অধিকার করিয়াছিল। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশের করণানী স্থলতানরা উড়িষ্যায় আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করেন। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে জালালুদ্দীন আকবর আফগান-শক্তি পর্যুদস্ত করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এক শাসনকর্তৃত্বের অধীনে আনয়ন করেন।

কামরূপ ও উড়িষ্যায় ইসলামধর্মাবলম্বীর সংখ্যাল্পতার কতকটা কারণ সম্ভবতঃ এই দুই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু বিহার ও বঙ্গদেশের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি হইতে পারে? এই দুই দেশ এক সময় হইতে মুসলমান অধিকারে আসিয়াছিল এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এক রাজ্যভুক্ত ছিল। আরেকটি কথা। দুই দেশেই হিন্দু ভূস্বামিগণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। বাঙ্গলায় এই প্রতিপত্তি এতদূর বাড়িয়াছিল যে, ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহের বংশীয় স্থলতান দ্বিতীয় সামসুদ্দীনকে পরাজিত করিয়া পাণ্ডুয়া নগর অধিকার করিয়াছিলেন এবং সমগ্র দেশে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। বিহারে অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব। কিন্তু বাঙ্গলায় হিন্দু শক্তির এই অভ্যুত্থান স্থায়ী বা কার্যকরী হয় নাই। রাজা গণেশের পুত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাজ্যরক্ষার জন্য মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর সহায়তা ও সমর্থনলাভ করিবার আগ্রহ ছিল এই ধর্ম পরিবর্তনের কারণ।

বাঙ্গলায় ইসলামধর্মীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হয়।

কেহ কেহ বলেন, তুর্ক আক্রমণের সময়ে বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। মুসলমান শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজের নিম্ন স্তরের বৌদ্ধগণ ইসলামে দীক্ষিত হইয়া যায়। কিন্তু বিহার পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজার হাত হইতে বিজেতার দখলে গিয়াছিল। বাঙ্গলায় তখন সেন বংশীয় হিন্দু রাজার আধিপত্য, দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিহারে তখন বৌদ্ধধর্ম প্রবল। প্রদেশের বিহার নাম ইহার সাক্ষ্য দেয়। প্রাক্-মুসলমান আমলে এই নাম প্রচলিত ছিল না। বৌদ্ধ রাজার অধীন বিহারের অধিবাসীরা

মুসলমান বিজয়ের ফলে ইসলাম গ্রহণ করিল না, হিন্দু রাজার অধীন বাঙ্গলার অধিবাসীরা বহু সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করিল কেন তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন, রাজা গণেশের পুত্র যদুজয়মল্ল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দীন নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে বল প্রয়োগে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রজাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। ফেরিস্তার গ্রন্থে জালালুদ্দিনের শাসনের বিবরণ তাঁহার ইসলামে নিষ্ঠার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পূর্ণ। প্রজাদিগকে বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত করিবার কোন উল্লেখ এই বিবরণে নাই। কোন কোন মতে মুসলমান আমলে এবং বৃটিশ শাসনের প্রথম আমলে বাঙ্গলার হিন্দু জমিদারগণের, বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দু জমিদারগণের অত্যাচারে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল আত্মরক্ষার জন্য। অত্যাচারিত হিন্দু প্রজা ইসলাম গ্রহণ করিলে মুসলমান প্রজাদিগের সাহায্য লাভ করিত। মুসলমানগণের মধ্যে অধিক একতাবোধ থাকায় তাহারা জমিদারদিগের অত্যাচারে প্রতিরোধ করিতে সাহস করিত এবং অনেক সময় সমর্থ হইত। পূর্ব ও উত্তর বাঙ্গলায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের কারণ এইরূপ। কেহ কেহ বলেন, আফগান আমলে ও পরবর্তীকালে গাজি ও পীর উপাধিধারী ইসলাম প্রচারকদিগের জবরদস্তিতে পূর্ব ও উত্তর বাঙ্গলায় বহুসংখ্যক হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আদিবাসী ও মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত মিশ্র জাতির লোক ছিল।

এই প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। বাঙ্গলায় ইসলামের সাফল্যের আলোচনা করিতে গিয়া মুখবন্ধে তিনি বলিতেছেন, "The people of Bengal always exhibited a singular susceptibility to new forms of faith." তারপর বলিতেছেন, এই সাফল্যের কতকগুলি কারণ ছিল। (১) ইসলাম ছিল শাসক জাতির ধর্ম এবং ইসলামের প্রচারকগণ ছিলেন উদ্যমশীল, দুঃসাহসিক চরিত্রের লোক। (২) পুরোহিত সম্প্রদায় কর্তৃক শাসিত এবং জাতিভেদের পেষণে পিষ্ট জনসাধারণের কাছে এই প্রচারকগণ ঈশ্বর এক এবং সকল মানুষ সমান এই নূতন আশ্বাসের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

(৩) ইসলামে দীক্ষার ব্যবস্থা এমন ছিল যে, একবার দীক্ষিত হইলে স্বধর্মে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল। (৪) জোর করিয়া পাইকারী ধর্মান্তর-করণের ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসৃত হইত। (৫) সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে অপরাধের শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বা বিশেষ কোন সুবিধা লাভের আশায় কেহ কেহ ধর্ম পরিবর্তন করিত। (৬) দরিদ্র সাধারণ শ্রেণীর লোকের কাছে ইসলাম গ্রহণ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির সোপানস্বরূপ ছিল। "It offered to the teeming low castes of Bengal who had sat for ages despised and object, on the outermost pale of the Hindu community free entrance new social into a organisation." কারণ যাহাই হউক, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি বাদ দিলে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা একমাত্র অঞ্চল, যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পশ্চিম ভারত

উপরে বলা হইয়াছে, পূর্ব ভারতে বাংলা গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর প্রধান কেন্দ্র, এই কেন্দ্র হইতে উড়িষ্যা ও আসামে এই গোষ্ঠী সম্প্রসারিত হইয়াছে। পশ্চিমে বিহার ও বিহার হইতে পূর্ব যুক্তপ্রদেশ পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়।

পশ্চিম ভারতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠী দক্ষিণ বেলুচীস্তান হইতে উপকূল বাহিয়া দক্ষিণ মুখে সম্প্রসারিত হইয়াছে। রিজ্‌লে পশ্চিম ভারতের এই টাইপের নাম দিয়াছেন সিথো-দ্রাবিডিয়ান এবং তাহার মতে গুজরাট হইতে কুর্গ পর্যন্ত এই টাইপকে দেখা যায়।

এই টাইপকে সিথো-দ্রাবিডিয়ান নাম দিবার হেতু এই যে, রিজ্‌লের মতে এই অঞ্চলে দ্রাবিড় জাতির সহিত সিথিয়ান জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। সিথিয়ান বলিতে রিজ্‌লে চৈনিক ইতিহাসের Sse ও ভারতীয় ইতিহাসের শক বুঝেন। য়িয়ুচী-আক্রমণের ফলে শকস্তান (সিস্তান) পরিত্যাগ করিয়া ইহারা বেলুচীস্তানের মধ্যে দিয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সম্পর্কে রিজ্‌লে

বলিতেছেন: "A zone of broad-headed people may still be traced southwards from the region of the West Punjab in which we lose sight of the Scythians right through the Deccan till it attains its further extension among the Coorgis."

পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চল দক্ষিণমুখে চলিয়া দাক্ষিণাত্য অতিক্রম করিয়া কুর্গ পর্যন্ত শেষ হইয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবে এই গোষ্ঠীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার পর তিনি বলিতেছেন, "Is it conceivable that this may mark the track Scythians who first occupied the great grazing country of the West Punjab and finding their progress eastward blocked by the Indo-Aryans, turned to the south mingled with the Dravidian population and became the ancestors of the Maratha ?" অর্থাৎ তিনি অনুমান করিতেছেন যে, সিথিয়ানরা প্রথমে পশ্চিম পাঞ্জাবের বৃহৎ পশুচারণ ভূমিতে বাস করিতে আরম্ভ করে। তারপর সেখান হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া পূর্বদিকে ইন্দো-আরিয়ান জাতির লোক পথ অবরোধ করিয়া আছে দেখিয়া দক্ষিণ মুখে চলিতে থাকে। দক্ষিণে তাহাদের সঙ্গে স্থানীয় দ্রাবিড়িয়ান অধিবাসীদের সংমিশ্রণ হয়। এই সংমিশ্রণের ফলে মারাঠা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ইতিহাসের মতে শকগণ তক্ষশীলায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এজন্য রিজ্‌লে পশ্চিম পাঞ্জাবের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাবের কাছে ইন্দো-সিথিয়া নামে পরিচিত সিন্ধুর উল্লেখ করেন নাই এবং বেলুচিস্তানের কাচ্ছি বা মাক্রাণ হইয়া সিথিয়ান জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল এই মত প্রকাশ করিবার পরেও বেলুচীস্তানের গোলমুণ্ড টাইপের মধ্যে সিথিয়ান সংমিশ্রণের কথা না বলিয়া ইরাণী সংমিশ্রণের কথা বলিয়াছেন।

রিজ্‌লের অ্যানথ্রোপোমেট্রিক data ও সিদ্ধান্তে নানা ত্রুটি বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস ও 'রেস মুভমেন্ট' সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তাঁহার অসঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী সমাজে পরিত্যক্ত হইলেও সাধারণের মধ্যে এই সকল সিদ্ধান্তের

প্রভাব এখনও বর্তমান। পশ্চিম উপকূল ও দাক্ষিণাত্যের গোলমুণ্ড ও মিশ্র জাতিগুলির মধ্যে সিথিয়ান প্রভাবের থিওরী রমাপ্রসাদ চন্দ বিস্তারিত যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন এবং এই মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের গোলমুণ্ড জাতিগুলির মধ্যে সিথিয়ান ও মোঙ্গলীয় প্রভাব নাই, তাহারা আলপাইন ও পামীরী গোলমুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত। এই মত নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী সমাজে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইয়াছে।

বেলুচীস্তান ও সিন্ধুর অধিবাসীদের সম্বন্ধে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কথা বলিবাব সময় বিস্তারিত বলা হইযাছে। এই দুই অঞ্চলে যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সহিত লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীব সংমিশ্রণ দেখা যায়, পশ্চিম উপকূল ধরিয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া গুজরাটে উপস্থিত হইলে দেখা যায়, সেই গোলমুণ্ড গোষ্ঠী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উত্তব ও দক্ষিণ গুজরাট, মারাঠা দেশ, কন্নাদ ও কুর্গে এই গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায়।

পূর্ব ভারতে যেমন বাঙ্গলাকে গোলমুণ্ড গোষ্ঠির প্রধান কেন্দ্র ব'লয়া ধরা হইয়াছে, পশ্চিম ভারতে গুজরাট ও মারাঠা দেশকে সেইরূপ কেন্দ্র ধরিলে দেখা যায় উত্তরে কচ্ছ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে এই টাইপের সহিত লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে। পূর্বে মধ্য-ভারতের মধ্য দিয়া এই গোষ্ঠী অগ্রসর হইবার পর ইহাব অস্তিত্বের পবিচয় লুপ্ত হইয়াছে।

পশ্চিম ভারতে এই গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য পূর্ব ভারত অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতে পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের এই গোলমুণ্ড গোষ্ঠী এক ও অভিন্ন, উভয়ের উৎপত্তি এক মূল গোষ্ঠী হইতে। এই গোলমুণ্ড গোষ্ঠী শক বা সিথিয়ান নহে, মোঙ্গলীয় টাইপের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। সিথিয়ান জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে এই গোষ্ঠী ভারতবর্ষে রহিয়াছে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের মতে তাম্রযুগে সিন্ধু উপত্যকায় যে গোলমুণ্ড জাতির উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড জাতিগুলি তাহাদের বংশধর। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে আলপাইন, পামীরী বা দিনারিক জাতি। সিন্ধু উপত্যকা হইতে এই গোলমুণ্ড জাতির সম্প্রসারণ সম্বন্ধে দুই একটি মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ডাঃ গুহের মতে তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকায় যে গোলমুণ্ড জাতিকে দেখা যায় তাহারা

"drifted along the western littoral from southern Baluchistan through Sind, Kathiawar, Gujarat and Maharastra into Kannada and Tamilnad and thence into Ceylon." "An eastward movement seems to have gone early into the Gangetic delta, leaving a distinct trail in Central India, eastern U P. and Bihar." (*Racial Elements in the Population of India*).

অন্যত্র আইকষ্টেডের মতের সমালোচনা করিয়া তিনি বলিতেছেন যে, সিন্ধুযুগের যে সকল মনুষ্য-দেহাবশেষ সিন্ধুদেশে ও পাঞ্জাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এবং রিজ্‌লে, রমাপ্রসাদ চন্দ, থার্স্টন, হর্ণেলীর সংগৃহীত তথ্য হইতে প্রমাণ হয় যে "In the whole of Bengal and in the western littoral as far as Kannada and south western Tamilnad it (গোলমুণ্ড জাতি) forms the dominant element in the present population" (*Census Report 1931, Vol. I Part 3 pp, XXI*)

ডাঃ গুহের মতে চিত্রলে, গিলগিটে এবং নেপালেও এই জাতি প্রবেশ করিয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ডাঃ গুহ একটি পশ্চিম উপকূল ধরিয়া ও একটি পূর্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরিয়া এই জাতির দুইটি পৃথক প্রবাহ অগ্রসর হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যাহারা পশ্চিম উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই দাক্ষিণাত্য অতিক্রম করিয়া পূর্ব উপকূলে পৌছায় এবং অন্ধ্রের উত্তরাংশ ও উড়িষ্যা হইয়া বাঙ্গলায় উপস্থিত হয়।

রমাপ্রসাদ চন্দের মতে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ, অন্ধ্র, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার গোলমুণ্ড ও মধ্যমাকৃতি মস্তকের (মিডিয়াম হেডেড) জাতিসমূহ পামীর ও তাকলা মাকান অঞ্চল হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আগত গোলমুণ্ড জাতির বংশধর। ডাঃ হাটনের মতে খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রকে ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর দরদ বা পিশাচ শাখার ভাষাভাষী গোলমুণ্ড জাতি পামীর ও ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। "We may suppose them to have entered the Indus valley during or after the Mohenjo Daro period and to have extended down the east coast of India as far as Coorg".

তারপর বাঙ্গলা সম্বন্ধে ডাঃ হাটন বলিতেছেন : "A non-Armenoid Alpine population of a brachycephalic, leptorrhine type appearing in Bengal in the east but much more marked in the west of India from Baluchistan to Coorg". (*Census Report 1931* Vol. *I*, *Part 3 p. 450*)

তাঁহার মতে বঙ্গদেশে এই জাতির যে অংশ আসিয়াছিল, তাহা পশ্চিম উপকূল ধরিয়া যে অংশ অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের পরে সিন্ধু উপত্যকা হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের উপরে উদ্ধৃত মতগুলি মিলাইলে এই তথ্যগুলি পাওয়া যাইতেছে : (১) পূর্ব ভারতের গোলমুণ্ড জাতি ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড জাতি মোঙ্গলীয় বা সিথিয়ান নহে। (২) ইহারা উভয়েই এক গোষ্ঠীভুক্ত। (৩) এই গোষ্ঠী হিন্দুকুশের উত্তরে যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে বর্তমানকালে দেখা যায় তাহাদের সম্পর্কিত। (৪) এই গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষগণ সিন্ধুযুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই সময়ে পশ্চিম উপকূল ও পূর্ব ভারত মুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। (৫) এই গোষ্ঠীর পূর্ব শাখার মধ্যে পড়ে বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার গোলমুণ্ড ও মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের অধিবাসিগণ। পশ্চিম শাখার মধ্যে পড়ে দক্ষিণ বেলুচীস্তান, সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট, কাথিয়াবাড়, মহারাষ্ট্র, কন্নাদ, কুর্গ ও তামিলনাদের গোল ও মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের অধিবাসিগণ। পশ্চিম নেপাল, চিত্রল ও দরদিস্তানের গোল ও মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের অধিবাসীদিগকে এই গোষ্ঠীভুক্ত বলা যাইতে পারে। ডাঃ গুহ সিংহলের গোলমুণ্ড অধিবাসীদিগকেও এই গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর অধ্যুষিত বিস্তৃত অঞ্চলগুলির প্রান্ত এলাকায় অন্য গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণ প্রবল এবং কেন্দ্রীয় এলাকাগুলিতে এই সংমিশ্রণ অল্প। এই কেন্দ্রগুলি হইতে উত্তরে, পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে এই গোষ্ঠীর গমন পথের চিহ্ন মিশ্র গোষ্ঠীভুক্ত অধিবাসীদের মধ্যে পাওয়া যায়।

সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত অধিবাসীগণের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কন্নাদ ও তামিলনাদের গোলমুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত জাতি-

গুলির পৃথক, বিস্তারিত পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। উপরে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, পূব ভারতের বাঙ্গলা, পূর্ব বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এবং পশ্চিম ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কন্নাদের অধিবাসী জাতিগুলি এক গোলমুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত, যেমন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের পাঠান, রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি জাতিগুলি এক লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের মতে একদিকে বাঙ্গালী, পূর্ব বিহারী, উৎকলী, আসামী ও অন্যদিকে গুজরাটী, মারাঠী, কানাড়ীদিগের মধ্যে অন্য সকল পার্থক্য সত্ত্বেও জাতিগত (ethnic) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। ইহাদের মধ্যে ভিন্ন গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকিলেও মূল গোষ্ঠীর সাধারণ লক্ষণ (brachycephaly ও mesaticephaly) প্রবল।

মধ্যভারত

মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশের অধিবাসীদের কথা এক সঙ্গে বলা যাইতে পারে। এই দুইটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আলাদা কোন গোষ্ঠীর বা টাইপের প্রাধান্য নাই, চারিদিকের অঞ্চলগুলি হইতে জনপ্রবাহ বিচ্ছিন্নভাবে এই দুই প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। মধ্যভারতের মালভূমির পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে গুজরাট ও রাজপুতানা, উত্তরে যুক্তপ্রদেশ, পূর্বদিকে ইহা ছোটনাগপুরের মালভূমির সঙ্গে যুক্ত। গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর মারাঠা, রাজপুতানা ও পশ্চিম যুক্তপ্রদেশ হইতে আগত রাজপুত, জাঠ ও গুজরদিগকে এই এলাকায় দেখা যায়। অধিবাসীদিগের মধ্যে একদিকে রাজপুতানার বিশিষ্ট উপজাতি ভীল, ভীলালা, মীনাদিগকে দেখা যায়; আবার অন্যদিকে ছোটনাগপুর অঞ্চলে কোল, ভূমিয়া, খাসিয়া, মাঝি, কোরকু, করমাই এবং মধ্যপ্রদেশের বৈগাদিগকে দেখা যায়। কৃষিজীবী শ্রেণীর মধ্যে রাজপুতানার কোল, মারাঠী, কুনবী, পূর্ব অঞ্চলের কুর্মীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশ পূর্বদিকে ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলের সহিত যুক্ত। দেশীয় রাজ্যগুলি ছাড়া মধ্যভারতের চারটি বিভাগেও প্রায় চৌদ্দ লক্ষ আদিবাসী বাস করে। প্রায় ৬০ হাজার গুজর ও ৫ লক্ষ রাজপুত মধ্য প্রদেশের অধিবাসী। বেরারসহ মধ্যপ্রদেশের প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে

৫৬ লক্ষ মারাঠী ভাষাভাষী, ৪ লক্ষ উড়িয়া ভাষাভাষী এবং পূর্ব ও পশ্চিম শাখার হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৭১ লক্ষ।

মধ্যপ্রদেশ হইতে অগ্রসর হইয়া হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশের যে বিশেষত্ব দেখা গিয়াছে, এখানেও সেইরূপ বিশেষত্ব আছে। কিন্তু এই বিশেষত্ব অন্য প্রকারের। চারিদিকের অঞ্চল হইতে এই এলাকার মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনপ্রবাহ প্রবেশ করে নাই। এই রাজ্য পশ্চিমের মারাঠী, দক্ষিণের কানাড়ী ও দক্ষিণ-পূর্বের অন্ধ্র-ভাষীদিগের নিজ নিজ অঞ্চলের অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া গঠিত হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী

(ড্রাবিডিয়ান থিওরী)

প্রাচীনপন্থী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ প্রায় সকলেই জাতিবাচক অর্থে Dravidian কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের অনেকে জাতিবাচক অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহেন। ড্রাবিডিয়ান কথাটির পরিবর্তে তাঁহারা মেডিটারেনীয়ান কথাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু এই দলের কেহ কেহ মেডিটারেনীয়ান ও ড্রাবিডিয়ানের মধ্যে, অন্ততঃ ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন পার্থক্য আছে মনে করেন না; তাঁহাদের কথা কতকটা এইরূপ, ভারতবর্ষে যে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীকে দেখা যায়, তাহারা দ্রাবিড ভাষাভাষী সুতরাং তাহাদিগকে ড্রাবিডিয়ান জাতি বলা যায়।

যাঁহারা জাতিবাচক (রেশিয়াল টাইপ) অর্থে ড্রাবিডিয়ান কথাটি ব্যবহার করিতে চাহেন না, তাঁহারা বলিতে চাহেন, দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষা যে সকল জাতি ব্যবহার করে তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে ড্রাবিডিয়ান জাতি বলা যায়। এই নামকরণ ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানীর। দ্রাবিড় দেশের অধিবাসী বলিয়া ড্রাবিডিয়ান নাম দিতে হইলে শুধু তামিল জাতিকে এই নাম দিতে হয়। কানাড়ীভাষীর দেশ কর্ণাট, তেলেগুভাষীর দেশ অন্ধ্র ও মলয়ালীভাষীর দেশ কেরল। কর্ণাট, অন্ধ্র ও কেরল এই তিনটি দেশের অধিবাসীকে ড্রাবিডিয়ান জাতি বলিবার কোন কারণ নাই। তামিল ও এই তিনটি অঞ্চলের ভাষা

দ্রাবিড়ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত, এইজন্য এই চারিটি অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে ড্রাবিডিয়ান জাতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী এইভাবে গোষ্ঠী বা জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা স্বীকার কবিতে পারেন না। নৃতত্ত্ববিজ্ঞান মতে জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণ কবিবাব আলাদা সূত্র আছে।

আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ ড্রাবিডিয়ানের পরিবর্তে মেডিটারেনীয়ান নামটি ব্যবহার করিলেও সাধারণ লোকের মনে যে ধারণা একবার বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা দূর করা অতি কঠিন। সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা যে সকল জাতি ব্যবহার করে তাহারা ড্রাবিডিয়ান বা দ্রাবিড় জাতি। এই দ্রাবিড় জাতির কয়েকটি শাখা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও তাহার দক্ষিণে পেনিনসুলার ইণ্ডিয়া বা ভারতীয় উপদ্বীপ অঞ্চলে বাস করে। এই দ্রাবিড় জাতি উত্তর ভারতের জাতি সমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই প্রচলিত বিশ্বাসকে একটি দৃঢ়মূল বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে, এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা অনেক দূর প্রসারিত হইয়াছে। পণ্ডিত সমাজ বিভিন্ন ভাণ্ডার হইতে রস সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই সকল শাখা প্রশাখার সম্প্রসারণ ঘটাইযাছেন। শাখা প্রশাখা বলিতে কি বুঝায় তাহাব একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

আর্য জাতির বহু পূর্ব দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। আর্যজাতি যখন ভারত আক্রমণ করে, তখন সিন্ধু উপত্যকা সমেত সমগ্র উত্তর ভারতে তাহাবা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কঠিন ও দীর্ঘকালস্থায়ী সংগ্রামের দ্বারা ইহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া আর্যজাতি আপনাদিগকে পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত কারতে সমর্থ হইয়াছিল। আর্য জাতির চাপে দ্রাবিড় জাতিকে ক্রমে উত্তর ভারত ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। দ্রাবিড় জাতির নিজস্ব কৃষ্টি ও সভ্যতা ছিল। এই সভ্যতা অর্ধসভ্য যাযাবর আর্য জাতির সভ্যতা অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত ছিল। ঋগ্বেদে না হউক, উপনিষদগুলিতে যে উন্নত, দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এই পরাজিত, সভ্য দ্রাবিড় জাতির দান। হিন্দুধর্মে যে স্ত্রী-দেবতার উপাসনার বাহুল্য দেখা যায় তাহাও এই দ্রাবিড় জাতির দান। উত্তর ভারতে

হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত, তাহার অনেকগুলি দ্রাবিড় জাতির নিকট হইতে আসিয়াছে।

দ্রাবিড়িয়ান থিওরীতে বিশ্বাসী পণ্ডিতগণ বলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বেলুচীস্তানের মধ্য দিয়া দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। বেলুচীস্তানের ব্রাহুইদের (Brahui) ভাষা দ্রাবিড় ভাষার সম্পর্কিত। এই ব্রাহুই ভাষা প্রমাণ করে যে দ্রাবিড় জাতি বাহির হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। এই আদি বাসভূমি হইতে তাহারা স্ত্রী-দেবতার উপাসনা, মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক প্রথা (matriarchy), দেবদাসী প্রথা প্রভৃতি আনিয়াছিল। এই দ্রাবিড় জাতিই সিন্ধু উপত্যকার গৌরবময় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হল এবং আরও কেহ কেহ বলিয়াছেন, মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাসে যাহারা সুমেরীয়ান নামে পরিচিত তাহারা বাস্তবিক দ্রাবিড় জাতি। অতি প্রাচীন যুগে দ্রাবিড়গণ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় (সুমের) উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধ সুমেরীয় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে মেসোপটেমিয়া হইতে দ্রাবিড়ভাষী মেডিটারেনীয়ান জাতি সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়া তাম্রযুগের সিন্ধুসভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল।

দ্রাবিড়িয়ান থিওরীর মূল কত গভীর ও শাখা প্রশাখা কত বিস্তৃত, তাহা দেখাইবার জন্য পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইল। বলা বাহুল্য, সকল মতই অনুমান, অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য অনুমানমাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমানের পশ্চাতে অর্ধ-পরিস্ফুট অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য যে নাই, তাহা বলা যায় না।

এইবার দ্রাবিড়িয়ান থিওরী অর্থাৎ দ্রাবিড়িয়ান ভাষা হইতে জাতির সৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

দ্রাবিড়িয়ান থিওরী ও দ্রাবিড়িয়ান জাতির স্রষ্টা মাদ্রাজের বিশপ ক্যাল্ডওয়েল।

ক্যাল্ডওয়েল তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে (*Comparative Grammar of the Dravidian or South-India languages*) দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত

ভাষাগুলিকে দ্রাবিডিয়ান ভাষাগোষ্ঠী নাম দিয়া এক গোষ্ঠীভুক্ত করেন। তামিল ও অন্ধ্র দেশের বৈয়াকরণগণ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির এইরূপ কোন সাধারণ নাম দেন নাই। কোলব্রুক, ক্যারী প্রমুখ প্রাচীন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। ডাঃ পোপ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিকে সংস্কৃতের সম্পর্কিত মনে করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে (Hodgson, Stevenson) দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির যে অংশ সংস্কৃত নহে, তাহা ভারতবর্ষের নিষাদগোষ্ঠীর ভাষা।

বিশপ ক্যাল্ডওয়েল এই মতের বিরোধী। তাঁহার মতে এই ভাষাগুলি সংস্কৃতের সম্পর্কিত নহে। ইহাদের মূলভিত্তি প্রাক্-আর্য যুগের সিথিয়ান ভাষা। কিন্তু তাঁহার কল্পিত এই প্রাক্-আর্য যুগের সিথিয়ান হইতে উদ্ভূত দ্রাবিড ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থের অন্যত্র তিনি স্বীকার করিতেছেন : "There is no proof of Dravidian such as we have it now having originated much before Kumarila's time 700 A. D. and its earliest cultivators appear to have been Jainas." অর্থাৎ দ্রাবিড় ভাষাকে বর্তমানে যেরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, কুমারিলের পূর্বে তাহার বিশেষ অস্তিত্ব ছিল না। দ্রাবিড ভাষার অনুশীলন জৈনদের দ্বারা আরম্ভ হয় বলিয়া মনে হয়।

সে যাহা হউক, যে প্রাক্-আর্য যুগের সিথিয়ান ভাষার কথা ক্যাল্ডওয়েল বলিয়াছেন, দেখা যায় যে. তাঁহার মতে তাহা ইন্দো-য়ুরোপীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। দ্রাবিড় ভাষাকেও তিনি ইন্দো-য়ুরোপীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে উগ্রো-ফিনিস ভাষার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে। দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতের সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার পার্থক্য প্রমাণ করিবার জন্য অনেকখানি কালি খরচ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি দ্রাবিড় ভাষাকে সংস্কৃতের সহিত এক ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত বলিতেছেন।

ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পরে তিনি দ্রাবিডিয়ান জাতির কথায় আসিয়াছেন। তাঁহার মতে দ্রাবিডিয়ান জাতি সিথিয়ান। তিনি বলেন. দুই দল সিথিয়ান জাতি প্রাক্-আর্য যুগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। দ্রাবিডিয়ান জাতি প্রথম আক্রমণকারীদের দলভুক্ত। আর্য জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার কিছু পূর্বে দ্বিতীয় দল. সিথিয়ান জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ

করিয়াছিল। ইহারা প্রথম দলকে অর্থাৎ দ্রাবিড়িয়ানদিগকে উত্তর ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। আর্য জাতি দ্বিতীয় দলের সিথিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাদিগের সমাজের মধ্যে শূদ্ররূপে তাহাদিগকে গ্রহণ করে। দ্রাবিড়িয়ান জাতি আসিয়াছিল মধ্য এশিয়া হইতে। আর্য জাতির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বরাবর বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় দ্রাবিড়িয়ান জাতির সেই দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের মত এই যে, তাহাদের টাইপ ও আর্যজাতির টাইপ এক। "Physical type of the Dravidians same as that of the Aryans." (*Comparative Grammer.* ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ, পৃঃ ৫৫৮) তাহাদের টাইপ ককেশিয়ান বা আর্য টাইপ হইতে অভিন্ন। "Their physical type Caucasian or identical with Aryans."

—ঐ, পৃঃ ৫৬০

তাঁহার মতে দ্রাবিড়িয়ান মস্তকের আকৃতির সঙ্গে য়ুরোপীয়দের মস্তকের আকৃতির তুলনা করা যাইতে পারে। "The Dravidian type of head will even bear to be directly compared with the European."

—ঐ, পৃঃ ৫৬২

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, দ্রাবিড়িয়ান জাতির দৈহিক লক্ষণ যদি আর্য জাতির দৈহিক লক্ষণ হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মনে করিবার কারণ কি? বিশপ ক্যাল্ডওয়েল এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। তাঁহার বক্তব্যের মর্ম এই যে, দৈহিক লক্ষণ অভিন্ন হইলেও দ্রাবিড়িয়ান জাতি ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত। তিনি বলিতেছেন: "The high caste Dravidians claim to be regarded as the purest representatives of the race. Their institutions and manners have been Aryanised but *it is pure Dravidian blood which flows in their veins.*"

—ঐ, পৃঃ ৫৬২

অর্থাৎ উচ্চবর্ণের দ্রাবিড়িয়ানগণ দ্রাবিড়িয়ান জাতির বিশুদ্ধ প্রতিনিধি। তাহাদের সমাজ ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি আর্য জাতির দ্বারা প্রভাবিত হইলেও তাহাদের ধমনীতে বহিতেছে বিশুদ্ধ দ্রাবিড়িয়ান রক্ত।

যাহাদের ভাষা ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর এবং যাহাদের জাতি-লক্ষণ

বা টাইপ আর্যদিগের টাইপের অনুরূপ, তাহাদের ধমনীতে বিশুদ্ধ দ্রাবিডিযান রক্ত কোথা হইতে আসিল এবং তাহাদেব রক্ত আর্য না হইয়া দ্রাবিডিয়ান হইল কেন, বিশপ ক্যাল্ডওয়েল তাহা কিছু বলেন নাই।

কিন্তু বিশুদ্ধ দ্রাবিডিযান রক্ত লইয়া যে দ্রাবিডিয়ান জাতিব জন্ম এইভাবে বিশপ ক্যাল্ডওয়েলেব হাতে হইল, তাহা ক্রমে বাড়িতে ও শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল প্রথম যুগেব যুবোপীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অকৃপণ স্নেহ ও আদর পুষ্ট হইয়া।

স্যর হারবার্ট রিজ্‌লে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক জরীপ করিয়া এই মত প্রকাশ কবিলেন: "The Dravidian type extending from Ceylon to the valley of the Ganges, and pervading the whole of Madras, Hyderabad, the Central Provinces, the most of Central India and Chota Nagpur." সিংহল হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত এবং সমগ্র মাদ্রাজ, হাযদরাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল ও ছোটনাগপুবে দ্রাবিডিয়ান গোষ্ঠীকে দেখা যায়।

অন্যান্য অঞ্চলেও দ্রাবিডিয়ান জাতির সহিত আর্য, সিথিয়ান এবং মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দ্রাবিডিয়ান জাতি তাঁহার মতে লম্বামুণ্ড। রিজ্‌লে যে দ্রাবিডিয়ান জাতির প্রতিনিধিগণের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক জরীপ করিয়াছেন, সেই সকল প্রতিনিধির মধ্যে মাদ্রাজের কয়েকটি জেলা, ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার, নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চল, মহীশূর, কুর্গ, রাজপুতানার মেবার, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জাতির লোক আছে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের হিসাবে ইহাদের মধ্যে গোলমুণ্ড, লম্বামুণ্ড, মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের লোক রহিয়াছে। দৈহিক বা জাতি-লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে রিজ্‌লের দ্রাবিডিয়ান জাতির মধ্যে বিভিন্ন টাইপের লোক দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী হিসাবে রিজ্‌লে এই ব্যাপারটিকে তাঁহার মতবাদের পক্ষে বাধা বলিয়া মনে করেন নাই।

পরবর্তী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ রিজ্‌লের বর্ণিত দ্রাবিড় জাতিকে প্রাক-দ্রাবিডিয়ান ও দ্রাবিডিয়ান এই দুই গোষ্ঠীতে ভাগ করিলেন। এই দুই গোষ্ঠীই লম্বামুণ্ড, কিন্তু নাসিকা ও মুখের গঠনে এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য আছে। দ্রাবিডিয়ান জাতি তাঁহাদের মতে লম্বামুণ্ড হইলেও গোলমুণ্ড কানাড়ী, কুর্গী, কয়েকটি গোলমুণ্ড তামিল উপজাতি

ড্রাবিডিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া রহিল এই কারণে যে তাহারা বিশপ ক্যাল্ড-ওয়েলের উদ্ভাবিত ড্রাবিডিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা ব্যবহার করে। ঃ

ইঁহাদের পরবর্তী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ প্রাক-ড্রাবিডিয়ান গোষ্ঠীকে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড নাম দিলেন। ড্রাবিডিয়ান গোষ্ঠীর নাম পরিবর্তন করিয়া তাঁহারা মেডিটারেনীয়ান নাম দিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, তামিল বা দ্রাবিড ভাষার নাম অনুসারে তেলেগু কানাড়ী, মলয়ালী, কোদাগু-ভাষী জাতিগুলিকে ড্রাবিডিয়ান বা দ্রাবিড নাম দেওয়া ভ্রান্তিমূলক। এই মেডিটারেনীয়ান বা পূর্বের ড্রাবিডিয়ান গোষ্ঠীকে আবার প্যালী-মেডিটারেনীয়ান ও মেডিটারেনীয়ান বা য়ুরোপয়েড মেডিটারেনীয়ান নামে দুইটি টাইপে ভাগ করা হইয়াছে।

এই দলের নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, কানাড়ী ও তামিল-ভাষী অনেকগুলি উপজাতির মধ্যে লম্বামুণ্ড মেডিটারেনীয়ান টাইপের সঙ্গে পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড টাইপের প্রবল সংমিশ্রণ দেখা যায়। কোদাগু-ভাষী কুর্গী জাতি গোলমুণ্ড। মলয়ালী-ভাষী নায়ার জাতির মধ্যে গোলমুণ্ড টাইপের সংমিশ্রণ রহিয়াছে।

এ সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিলে এই দাঁড়ায় যে, রিজ্‌লে-বর্ণিত ড্রাবিডিয়ান গোষ্ঠীর লক্ষণ প্রধানতঃ প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বা নিষাদগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় এবং কয়েকটি প্যালী-মেডিটারেনীয়ান জাতির মধ্যে দেখা যায়। ইহাদের ভাষা মুণ্ডা। মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর জাতিগুলির মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায় না।

এই সকল সিদ্ধান্তের ফলে ড্রাবিডিয়ান বলিয়া কোন টাইপের বা জাতির অস্তিত্ব অনেকখানি সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

জার্মান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আইকষ্টেডের মতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে যাহারা দ্রাবিড় বলিয়া উল্লিখিত, সেই তামিল জাতি প্রাচীন নিগ্রো গোষ্ঠীর সহিত ইণ্ডিড জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশের তিনি ইণ্ডিড জাতির নাম দিয়াছেন। এই ইণ্ডিড জাতি তাঁহার মতে দক্ষিণ ইউরোপের জাতির একটি শাখা। অর্থাৎ ইহারা

অন্যান্য নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের বর্ণিত মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। নামকরণে চমকপ্রদ নূতনত্ব দেখাইলেও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী সম্বন্ধে আইকষ্টেডের মতে প্রকারান্তরে দ্রাবিড়িয়ান থিওরীতে বিশ্বাসী পণ্ডিতদিগের মত হইতে পৃথক নহে।

একজন পণ্ডিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দ্রাবিড় বা তামিল জাতি মালয় জাতির সহিত সম্পর্কিত এবং তাহারা সিংহল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। ইটালীয়ান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী জিউফ্রিদা রুগ্‌গেরীর (Giuffrida Ruggeri) মতে দ্রাবিড়িয়ান জাতি (গল্লা, সোমালী প্রভৃতি জাতি বাদে) ইথিওপিয়ান জাতির সহিত সম্পর্কিত।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী হেডেনের মত এইরূপ: "Dravidian is a general term for the main population of the Deccan. They are mixed with other races in certain places and many exhibit a marked Pre-Dravadian strain."

অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের প্রধান অধিবাসীদের সাধারণ নাম দ্রাবিড়িয়ান। কয়েকটি অঞ্চলে অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাহাদের সংমিশ্রণ হইয়াছে এবং তাহাদের অনেকের মধ্যে প্রাক্‌-দ্রাবিড়িয়ান গোষ্ঠীর লক্ষণ দেখা যায়। তারপর এই জাতির লক্ষণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতেছেন: "Hair plentiful, brownish black skin, dolichocephalic. typically mesorrhine." অর্থাৎ ইহাদের চুলের প্রাচুর্য, শ্যাম ও কালো গাত্রবর্ণ লম্বামুণ্ড ও বিশেষভাবে স্থূল নাসিকা দেখা যায়। ইহার পর অন্যান্য দ্রাবিড়িয়ান টাইপের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন: "As a rule there is a little or no hair on the face and limbs". (Races of Man). অর্থাৎ তাহাদের মুখে বা গায়ে সাধারণতঃ চুল দেখা যায় না।

জাতি-লক্ষণের প্রশ্ন ছাড়িয়া ডাঃ হেডন ইহার পর দ্রাবিড়িয়ানদিগের ভারতবর্ষে আগমনের সময় ও দ্রাবিড়িয়ান কৃষ্টি সম্বন্ধে একটু গবেষণা করিয়াছেন। ইহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এখানে এ সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না। অবশেষে তিনি মন্তব্য করিতেছেন: "Speaking generally, certain groups in, and the higher castes of South India exhibit what are taken to be original Dravidian characteristics the lowest

caste and the outcastes are predominantly Pre-Dravidian and the intermediate castes show various degrees of admixture." অর্থাৎ সাধারণভাবে বলা যায় যে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের কতকগুলি উপজাতি ও উচ্চবর্ণের জাতিদের মধ্যে যাহাকে মৌলিক দ্রাবিডিয়ান বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করা হয় তাহা দেখা যায়। নিম্নতম শ্রেণী এবং অন্ত্যজদিগের মধ্যে প্রাক্-দ্রাবিডিয়ান লক্ষণের প্রাধান্য দেখা যায়। মধ্য শ্রেণীগুলির মধ্যে কম বেশী সংমিশ্রণ দেখা যায়। কথার ভাবে বুঝা যায় যে, এই original Dravidian characteristics বা দ্রাবিডিয়ান জাতির মৌলিক লক্ষণগুলি কি, সে সম্বন্ধে ডাঃ হেডনের নিজের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। এইজন্য তাঁহার সমগ্র বক্তব্য অস্পষ্ট। তাহার বর্ণিত জাতি-লক্ষণগুলিও ঠিক নহে। মেডিটারেনীয়ান ও দ্রাবিডিয়ান এক গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত হওয়া সম্ভব এই ইঙ্গিতও তিনি করিয়াছেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, দ্রাবিডিয়ান বলিয়া পৃথক একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে ধরণের সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা প্রয়োজন ডাঃ হেডন রিজ্‌লের গ্রন্থ ও তাঁহার সংগৃহীত তথ্য হইতে সেরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ পান নাই। তাঁহার নিজেরও এ সম্বন্ধে কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু একটা পৃথক দ্রাবিডিয়ান জাতির অস্তিত্ব এত বহুল প্রচারিত হইয়াছে যে, তিনি এই অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করিতে সাহস পান নাই বা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। এইজন্য দ্রাবিডিয়ান কৃষ্টির কথা এবং "What are taken to be original Dravidian characteristics", এই যুক্তি ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এ যেন কতকটা বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের "pure Dravidian blood flows in their venis."-এর অনুরূপ যুক্তি।

বিশপ ক্যাল্ডওয়েল তামিজ জাতির প্রাচীন নাম হইতে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিডিয়ান জাতি সৃষ্টি করিবার পর হইতে য়ুরোপীয় পণ্ডিত সমাজ অশেষ স্নেহের সঙ্গে এই জাতিকে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। এজন্য দেখা যায় যে, প্রমাণ হইতে সিদ্ধান্তে আসিবার সাধারণ নিয়মের অনুসরণ না করিয়া এক্ষেত্রে তাঁহারা সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রমাণ আবিষ্কারের চেষ্টায় আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী তামিল, কানাড়ী, তেলেগু ভাষাভাষী জাতি-

গুলির মধ্যে গোলমুণ্ড টাইপের লোক আছে। উত্তর আর্কট হইতে তিনেভেলী পর্যন্ত অঞ্চলে কতকগুলি গোলমুণ্ড জাতির একটি বেষ্টনী দেখা যায়। অন্যত্র দেখান হইয়াছে যে, উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী ও দক্ষিণ ভারতের গোষ্ঠীর মধ্যে জাতিলক্ষণের দিক দিয়া সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। উত্তর ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠী বলেন। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যে গোলমুণ্ড টাইপের সংমিশ্রণ দেখা যায়, পণ্ডিতগণের মতে তাহা পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্টির পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে। এই কৃষ্টির পার্থক্য কেহ কেহ ড্রাবিডিয়ান জাতির অস্তিত্ব ও পার্থক্য প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এখানে নাই। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্টির মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই, যাহাকে local peculiarities বলা যায় তাহার উপর অনাবশ্যক জোর দেওয়া হইয়াছে উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে।

দ্রাবিড় কথাটি বিশপ ক্যাল্ডওয়েল যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। পঞ্চ দ্রাবিড়ের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে আছে যেমন পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু পঞ্চ দ্রাবিড়ের তালিকা হইতে ক্যাল্ডওয়েল দ্রাবিড় কথাটি যেভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। তামিল, অন্ধ্র, কানাড়ী, মারাঠি ও গুজরাটি, এই পাঁচটি লইয়া পঞ্চ দ্রাবিড়। পঞ্চ দ্রাবিড় কথাটি কি অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা জানা যায় না। ভাষা ও জাতি কোন হিসাবে এই পাঁচটিকে এক দলভুক্ত করা যায় না। মলায়ালী ভাষা অধ্যুষিত সমগ্র কেরল এই তালিকা হইতে বাদ পড়িতেছে। আবার ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত মারাঠা দেশ ও গুজরাট তালিকার মধ্যে পড়িতেছে।

ড্রাবিডিয়ান জাতির দৈহিক লক্ষণ আর্য জাতির দৈহিক লক্ষণের অনুরূপ, কৃষ্টি আর্যপ্রভাবান্বিত (Aryanised) এবং ভাষা ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত, কুমারিল ভট্টের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে বর্তমানে যে দ্রাবিড় ভাষা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তি সম্ভবতঃ জৈন শাস্ত্রকারদের হাতে হইয়াছে, বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের এই সকল মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে ড্রাবিডিয়ান সভ্যতার প্রাচীনতম বিকাশ দেখা যায় প্রাচীন পাণ্ড্য রাজ্যে। কিন্তু, "This civilisation seems to have been indebted for

its rapid development to the influence of a succession of small colonies of Aryans chiefly Brahman, from upper India." (পৃঃ ১১৯) অর্থাৎ এই সভ্যতার দ্রুত বিকাশ ঘটিয়াছিল উত্তর ভারত হইতে আগত আর্য ঔপনিবেশিক, প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে। তাহা হইলে ক্যাল্ড-ওয়েলের মতে দ্রাবিড়িয়ান সভ্যতার প্রাচীনতম বিকাশ যাহাকে বলা যায় তাহার মূলে ছিল আর্য-প্রভাব। প্রাক্-আর্যযুগের দ্রাবিড়িয়ান সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, দ্রাবিড়িয়ানদিগের দর্শন ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। 'They had not acquired much more than the elements of civilisation"

দ্রাবিড়িয়ান জাতি সম্বন্ধে বিশপ ক্যাল্ডওয়েল যতগুলি মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একত্র করিয়া কিসের ভিত্তিতে বা কোন্ প্রমাণের বলে তিনি এই জাতিকে আর্যগোষ্ঠী হইতে ভিন্ন মনে করেন তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত ভাষায় নাই দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে এইরূপ কয়েকটি শব্দের অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন প্রমাণ তিনি উপস্থিত করিতে পারেন নাই।

বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে Folk Songs of Southern India নামক গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা মিঃ গোভার নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক দ্রাবিড়িয়ান জাতি সম্পর্কিত, ক্যাল্ডওয়েলের এই মতের সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার মধ্যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের কোন কথা নাই। গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণের বিশপ এই সমালোচনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন: "He (Mr Gover) considers it of great moral and political importance to prove that the Dravidians are an Aryan and not a Scythian race. The Scythian theory, he says, 'shuts up the door of sympathy and fellow-feeling between the Dravidian peoples and their English conquerors." (পৃঃ ৫৩৪) অর্থাৎ মিঃ গোভারের আপত্তির কারণ রাজনৈতিক। দ্রাবিড়িয়ান জাতি আর্যগোষ্ঠীর বিশপ ক্যাল্ডওয়েল এই মত প্রচার করিলে রাজনৈতিক সুবিধা হইত। বিজয়ী ইংরাজ জাতি যখন আর্য তখন দ্রাবিড়িয়ান জাতি আর্য প্রমাণ হইলে পরাধীনতার বন্ধন মিষ্ট আত্মীয়তার বন্ধন হইয়া দাঁড়াইত। এখানে বলা

আবশ্যক যে, বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবারপূর্বে জার্মান, ফরাসী ও ইংরাজ Comparative Philologist গণ ভাষার প্রমাণে য়ুরোপের জাতিগুলি ইরাণী ও সংস্কৃতগোষ্ঠীর ভাষাভাষী উত্তর ভারতের অধিবাসীকে আর্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

দ্রাবিড়িয়ান জাতিকে এখন আর কেহ সিথিয়ান বলেন না। কিন্তু তাহাতে ক্যাল্ডওয়েলের সৃষ্ট দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়িয়ান জাতির উত্তর ভারতের আর্য জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবার পক্ষে কোন বাধা হয় নাই। বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে।

বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের মতে দ্রাবিড়িয়ান ভাষা ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। ডাঃ পোপ ও আরও কয়েকজন পণ্ডিতের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। ডাঃ পোপের মতে দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলি ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত ও সংস্কৃতের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দ্রাবিড়িয়ান টাইপ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের প্রমাণের অবস্থা কিরূপ উপরে দেখা গিয়াছে। এখানে স্যর জর্জ ক্যাম্পবেলের মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে: "I draw no wide ethnological line between the Northern and Southern countries of India, not recognising the separate Dravidian classification as property ethnological I have no doubt that the Southern Hindus may be classed as Aryans and that the Southern society in its structure, its manners and its laws and institutions is an Aryan Society" (Ethnology of India p. 15).

এইবার ব্রাহুই ভাষার প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে। যাঁহারা বলেন যে দ্রাবিড়িয়ান জাতি বাহির হইতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়াছিল, বেলুচীস্তানের ব্রাহুই ভাষাকে তাঁহারা এই মতের স্বপক্ষে বড় একটা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। ডাঃ হাটন মনে করেন যে বেলুচীস্তানে ব্রাহুই ভাষার অস্তিত্ব হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টারা ছিল দ্রাবিড়িয়ান। বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের মতে ব্রাহুই ভাষা দ্রাবিড়িয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূত। গ্রীয়ারসন ক্যাল্ডওয়েলের মতের অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে ব্রাহুই দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষা নয়, "But it contained a Dravidian element which was

probably derived from the remnant of some ancient Dravidian race incorported with the Brahui."

এই কৈফিয়তের মধ্যে প্রধান কথা এই যে ব্রাহুই দ্রাবিড়িয়ান গোষ্ঠীর ভাষা নহে ; বাকীটুকু অনুমান।

ব্রাহুই নামে কোন ভাষা নাই, ব্রাহুই নামে কোন জাতিও নাই। ব্রাহুই কালাতের পার্বত্য অঞ্চলের কতকগুলির উপজাতির রাজনৈতিক সংঘের (Confederacy) নাম। ব্রাহুই কথাটির কোন জাতিবাচক (Ethnological) সংজ্ঞা নাই। ব্রাহুই নামে পরিচিত সংঘের উপজাতিদের ভাষার নাম কুর্দগলি। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এই উপজাতিদের বর্তমানে যে অঞ্চলে দেখা যায়, বেলুচীদিগের অনেক পরে তাহারা সেই অঞ্চলে আসিয়াছে। তাহাদের নিজেদের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তাহারা সিস্তান হইতে বেলুচীস্তানে আসিয়াছে। জাঠ, আফগান, ইরাণের তাজিক, হুর, কুর্দ ও বেলুচ লইয়া ব্রাহুই উপজাতিগুলি গঠিত হইয়াছে। ঝালাওয়ান ও কেজ মাক্রানে জাঠ সংমিশ্রণ প্রবল।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের মতে ব্রাহুই সহ বেলুচীস্তানের অধিবাসীরা ইন্দো-ইরাণী টাইপের। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে লম্বামুণ্ড ইন্দো-আফগান ও গোল মুণ্ড ইরাণী টাইপের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

প্রাচীন সাহিত্যে তামিল জাতিকে দ্রাবিড় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে দ্রাবিড়িয়ান করিয়া অন্ধ্র, কানাড়ী কেরলী ও কুর্গীদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এই গোষ্ঠীকে ভাষাবাচক ও পরে জাতিবাচক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের ও ইতিহাসের সাক্ষ্য, উত্তর ভারতের সহিত ধর্ম ও কৃষ্টিগত ঐক্যের সাক্ষ্য এবং নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া এইভাবে সৃষ্ট দ্রাবিড়িয়ান জাতিকে কায়েম করা হইয়াছে। এই প্রচারণা এত দূর সফল হইয়াছে যে, এদেশের শিক্ষিত সমাজের মনে দৃঢ় বিশ্বাস প্রচলিত যে, দ্রাবিড়িয়ান জাতি বলিয়া একটি জাতি বাস্তবিক আছে। উত্তর ভারতের শিক্ষিত সমাজের অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, এই দ্রাবিড়িয়ান জাতি আর্য জাতির পূর্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং তাহারা ছিল আর্যজাতির প্রতিপক্ষ ও শত্রু। এই ধরণের বিশ্বাস ব্যাপক হইয়া দ্রাবিড়িয়ান থিওরীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রস্তুত

হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের শিক্ষিত সমাজের কতক অংশের মধ্যেও যে এই বিশ্বাস সংক্রামিত হইয়া কোন কোন পণ্ডিতকে ভারতবর্ষের প্রাচীন কৃষ্টির কোন্ কোন্ অংশ দ্রাবিড়িয়ান জাতির দান, তাহা নির্ণয় করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কারণ নাই।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞান মতে দ্রাবিড়িয়ান থিওরী মূল্যহীন। ক্যাল্ডওয়েল-গ্রীয়ারসনের অনুসৃত পন্থা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা নির্ণয় করা আবশ্যক তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মলয়ালী, কোদাগু, তুলু প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার পরস্পরের সহিত ও সংস্কৃতের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ কিরূপ।

বাঙালী জাতি

আগেকার যুগে বাঙলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা মতবাদ প্রচারিত ছিল। এই মতবাদকে বাঙলার বৈশিষ্ট্যবাদ নাম দেওয়া যায়। এই মতবাদের একজন মুখপাত্রের রচনা হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হইতেছে; "বাঙালী অন্য প্রদেশের জাতি হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। বাঙলার স্বাতন্ত্র্য বাঙলার বৈশিষ্ট্যের মূল উপাদান।...বাঙালী আর্যাবর্তের আর্যগণ হইতে একটি পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাঙলায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্য সমাজ বর্তমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ..।" (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়)

এই মতবাদের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। স্যর হারবার্ট রিজ্‌লের নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের গবেষণার ফল প্রচারিত হইলে এই মতবাদ প্রবল হইয়াছিল। এখন এই মতবাদের জন্মরহস্যের অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। বাঙালী জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে ভুল ধারণা প্রচার করিতে এই মতবাদ যে সহায়তা করিয়াছিল সে কথার উল্লেখ করা যায়।

তিনটি যুক্তির উপরে এই বৈশিষ্ট্যবাদ দাঁড় করানো হইয়াছে, ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক যুক্তি, নৃতাত্ত্বিক যুক্তি এবং কৃষ্টিমূলক যুক্তি।

ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক যুক্তিটি এইরূপ: বাঙলাদেশ সিন্ধু ও উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা অপেক্ষা অনেক কম বয়স্ক। উত্তর ভারতে মনুষ্য বসতি

হইবার অনেক পরেও ইহা সমুদ্রগর্ভে ছিল। বাঙলা পলিমাটির দেশ। উত্তর ভারতের অন্য অঞ্চলের মাটি হইতে ইহা একেবারে আলাদা ইত্যাদি।

বাঙলার ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্বন্ধে অজ্ঞতা এই যুক্তির মূলে রহিয়াছে। বাঙলা সদ্য উৎক্ষিপ্ত পললের দেশ নহে। বাঙলার একটি অংশ মাত্র বালি ও নরম কাদার অঞ্চল। বাঙলার সমতলভূমি গঠিত হইয়াছে যে সময়ে সিন্ধু, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের সমতল ভূমি গঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ হিমালয় ও দক্ষিণের মালভূমির মধ্যে প্রবাহিত ইন্দো ব্রাম (আসাম হইতে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ৩০০ হইতে ১৫০ মাইল প্রশস্ত) নদী ভূমিকম্পের ফলে তিন ভাগে ভাঙ্গিয়া সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমের সুলেমান পর্বত হইতে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের এই অববাহিকা দৈর্ঘ্যে ২০০০ মাইল, প্রস্থে ৩০০ হইতে ১৫০ মাইল এবং আয়তনে দুই লক্ষ বর্গমাইল।

আসাম হিমালয়ের বাহু (outer crops) কয়েকটি স্থানে পূর্বের সীমারেখা ভেদ করিয়া বাঙলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার সংলগ্ন হিমালয় অপেক্ষা প্রাচীন পর্বতশ্রেণী পশ্চিম সীমা ভেদ করি া কয়েকটি স্থানে বাঙলার মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। এই অংশকে ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীরা বেঙ্গল নেইস (Bengal gneiss) নাম দিয়াছেন। ইহাকে নিম্ন গণ্ডোয়ানাও বলা হয়। কয়লা ও বিবিধ মূল্যবান খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ দামোদর ও বরাকর উপত্যকা এই অঞ্চলে। লাল মাটি বা old alluvium (গলিত শিলা ও আয়রণ অক্সাইড মিলিয়া যাহার সৃষ্টি) বাঙলার অনেক অঞ্চলে দেখা যায়। সুতরাং বাঙলাদেশ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অপেক্ষা বয়সে নবীন নহে।

ভৌগোলিক ও ভূ-বিজ্ঞানের তথ্য বাঙলার বৈশিষ্ট্য মতবাদপ্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে না।

এবার নৃতাত্ত্বিক যুক্তির কথা বলা হইতেছে।

এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর অংশের অধিবাসীরা আর্যগোষ্ঠীভুক্ত আর নিম্ন অংশের অধিবাসীরা দ্রাবিড় ও মোঙ্গল গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন মিশ্র জাতি। গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর অংশের অধিবাসীরা যে আর্য গোষ্ঠীভুক্ত এই মত সকলে মানিয়া লইয়াছেন। নিম্ন অংশের অধিবাসী

বাঙালী জাতি দ্রাবিড় মোঙ্গল সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি এবং উত্তর অংশের আর্যজাতির সঙ্গে তাহাদের রক্তের সম্বন্ধ নাই, এই মত অনেকে মানিয়া লইয়াছেন, কারণ, ইহা আগের যুগের য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত, অতএব সত্য ; কেহ কেহ ইহা মানিয়া লইতে পারেন নাই, কারণ তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন না বা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যাঁহারা এই মত মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের দলেরই কেহ কেহ বাঙলার বৈশিষ্ট্যবাদ বা স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচার করিবার জন্য ইহাকে কাজে লাগাইয়াছেন।

বাঙালী দ্রাবিড়-মোঙ্গল সংমিশ্রণে উৎপন্ন মিশ্র জাতি, সুতরাং উত্তর ভারতের আর্যজাতি হইতে বাঙালী সম্পূর্ণ পৃথক, এই মত যাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের অথরিটি স্যর হারবার্ট রিজ্‌লে। সুতরাং রিজ্‌লের মতবাদের আলোচনা করিতে হইবে।

স্যর হারবার্ট রিজ্‌লে ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কৃতী ও খ্যাত চাকুরীয়া। উচ্চপদের রাজকর্মচারীর বহু কর্তব্যের গুরুভার বহন করিয়াও লেখাপড়ার কাজ করিতেন। সেকালের ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে এবং কয়েকজন ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মধ্যে এইরূপ শক্তি ও উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়। স্যর হারবার্ট রিজ্‌লে যে বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর এনড্রু ফ্রেজারের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন এবং সেকালের সংবাদপত্রের মতে যে জবরদস্ত বা ডিক্টেটোরিয়াল মেজাজের লোক ছিলেন, এ কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, মনে রাখিয়াছে তাঁহার দুইখানি গ্রন্থের কথা, সেন্সাস কমিশনার হিসাবে সংগৃহীত তথ্য সঙ্কলন করিয়া যাহা তিনি লিখিয়াছিলেন। রিজ্‌লে ছিলেন পরিশ্রমী, উদ্যমশীল, পণ্ডিত লোক। সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের একটা নক্সা খাড়া করিবার মত অতি বৃহৎ এবং নূতন ব্যাপারের কল্পনা করিবার সাহস তাঁহার ছিল এবং এই নক্সা তিনি খাড়া করিয়াছেন।

কিন্তু এত বড় কাজের দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করিবার সময় তাঁহার ছিল না ; নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। বহু ত্রুটিদুষ্ট তথ্য নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার হাতে দিয়াছেন। সেইগুলি লইয়া বিশদ

ক্যাম্ভওয়েলের দ্রাবিড় মতবাদ ও প্রচলিত য়ুরোপীয় আর্যমতবাদের সঙ্গে মিশাইয়া নিজের একটা নক্সা তিনি দাঁড় করিয়াছেন। রিজ্‌লের পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। কাজেই রিজ্‌লের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের নক্সা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনায় উৎসাহী লোক আদর করিয়া লইলেন। উহার দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটন করা নূতন একটা নক্সা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। এখন একথা বলিলে আপত্তির কারণ নাই যে, রিজ্‌লের 'পিপ্‌ল অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের নক্সা অপেক্ষা এই গ্রন্থেও 'কাস্ট্‌স্ এ্যাণ্ড ট্রাইবস অফ বেঙ্গল' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবাদ, বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সামাজিক আচার, প্রথা, লৌকিক ধর্মের সম্বন্ধে বিবরণ অনেক মূল্যবান জিনিস।

নানা ত্রুটিপূর্ণ তথ্য ও পূর্বপোষিত মতবাদের উপর রিজ্‌লে তাঁহার ভারতবর্ষের অধিবাসীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের বিরাট নক্সা দাঁড় করিয়াছেন। প্রায় দুই পুরুষ ধরিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত দেশীয় ও য়ুরোপীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের ও শিক্ষিত লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের পরিচয় ও সংমিশ্রণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া রিজ্‌লে যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

তাঁহার মতে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে দুইটি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী ও দুইটি গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর মধ্যে সংমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া যায়। কাঠামোটি তিনি এইভাবে প্রথম হইতে সহজ করিয়া লইয়াছেন। তিনি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী দুইটির নাম দিয়াছেন ইন্দো-আরিয় ও দ্রাবিড়। গোলমুণ্ড গোষ্ঠী দুইটির নাম দিয়াছেন সিথিয়ান ও মোঙ্গলীয়ান।

ইন্দো-আরিয় টাইপের অধ্যুষিত অঞ্চল পাঞ্জাব রাজপুতানা ও কাশ্মীর উপত্যকা। এই টাইপের সঙ্গে যমুনা নদীর পূর্বতীর হইতে বিহারের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে দেশের প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে ইহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই দুইটি পৃথক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে যে টাইপের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার নাম আরিয়-দ্রাবিড় টাইপ। ইহার আরেকটি নাম হিন্দুস্থানী টাইপ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, একটি লম্বামুণ্ড টাইপের সঙ্গে আরেকটি লম্বামুণ্ড টাইপের সংমিশ্রণে এই আরিয়-দ্রাবিড় টাইপের উৎপত্তি

হইয়াছে। গুজরাট হইতে কুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে (ইহার মধ্যে মারাঠি এলাকা পড়িয়াছে) প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে গোলমুণ্ড সিথিয়ান জাতির সংমিশ্রণে সিথো-দ্রাবিড টাইপের উৎপত্তি হইয়াছে। বিহারের পূর্ব সীমানা হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় দেশের প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে গোলমুণ্ড মোঙ্গল গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে মোঙ্গলো-দ্রাবিড় টাইপের উৎপত্তি হইয়াছে।

উল্লিখিত অঞ্চলগুলি বাদে মধ্য ভারতের দক্ষিণ হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল দ্রাবিড গোষ্ঠীর খাস এলাকা। উত্তর-পশ্চিম বেলুচীস্তানে যে গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়, রিজ্‌লের মতে তুর্ক ও ইরাণী জাতির সংমিশ্রণে উহার উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি উহার নাম দিয়াছেন তুর্ক-ইরাণী টাইপ। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তুর্ক ও ইরাণী গোষ্ঠী উভয়েই গোলমুণ্ড।

রিজ্‌লের অঙ্কিত ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের এই মানচিত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কাশ্মীর, রাজপুতানা ও পাঞ্জাব বাদে সর্বত্র লম্বামুণ্ড দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রাধান্য। এই গোষ্ঠী তাঁহার মতে ভারতবর্ষের আদিবাসী। পশ্চিমে ও পূর্বে ভারতবর্ষের বাহিরের দুইটি গোলমুণ্ড গোষ্ঠী দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে মিশিয়া দুইটি মিশ্র টাইপের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সকল সংমিশ্রণ কবে ঘটিয়াছিল রিজ্‌লে পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। পূর্ব-ভারতের উত্তর ও পূর্ব সীমানায় মোঙ্গল গোষ্ঠীর জাতি এখনও বর্তমান। পশ্চিম ভারতে দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সিথিয়ান জাতির সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে, সেই সিথিয়ান জাতিকে পৃথিবীর কোন অঞ্চলেই এখন আর দেখা যায় না। পূর্ব পাঞ্জাবের সীমানা হইতে বিহার পর্যন্ত অঞ্চল, বাংলা দেশের মত দ্রাবিড় অধ্যুষিত এলাকা ছিল। উত্তর-পশ্চিম হইতে শতদ্রু ও যমুনা পার হইয়া ইন্দো-আরিয় জাতির লোক এই অঞ্চলে প্রবেশ করে।

ইন্দো-আরিয় জাতির মধ্যদেশে প্রবেশ সম্পর্কে রিজ্‌লে ডাঃ হর্ণেলীর মত খণ্ডন করিয়াছেন। ডাঃ হর্ণেলীর মতে একদল ইন্দো-আরিয় অভিযাত্রী পাঞ্জাব আগে দখল করিয়াছিল। দ্বিতীয় অভিযাত্রী দল মধ্য এশিয়া হইতে চিত্রল ও গিলগিট হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যমুনা ও গঙ্গা

তারে উপনিবিষ্ট হয়। এই উপনিবেশ মধ্যদেশ নামে প্রাচীন সাহিত্যে খ্যাত। রিজ্‌লে বলেন, এইরূপ দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলের কল্পনা করা অনাবশ্যক। তাঁহার মতে বংশবৃদ্ধির জন্ত স্থানাভাব ঘটায় দলে দলে ইন্দো-আরিয়গণ শতদ্রু পার হইয়া পূর্বদিকে দ্রাবিড় এলাকায় প্রবেশ করিতে থাকে। তাহাদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে নূতন আরিয়-দ্রাবিড় টাইপের সৃষ্টি হইয়াছে। ডাঃ হর্ণেলীর বর্ণিত এই প্রথম ও দ্বিতীয় দল ইন্দো-আরিয় অভিযাত্রীর কথা মনে রাখিতে হইবে। রমাপ্রসাদ চন্দ ইহাদিগকে দুইটি পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়াছেন। ইন্দো-আরিয় গোষ্ঠী কোথা হইতে আসিল হর্ণেলী এ প্রশ্নের উত্তর দিলেও রিজ্‌লে উত্তর দিবার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তির গুরুত্ব অনেকের চোখ এড়াইয়া গিয়াছে। রিজ্‌লের অঙ্কিত মানচিত্র ত্রুটিপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ কল্পনার ও জ্ঞানের পরিচায়ক হইলেও ইন্দো-আরিয় টাইপের দ্বিতীয় দল অভিযাত্রীর কল্পনা করা অনাবশ্যক। এই উক্তির জন্ত তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে হয়।

রিজ্‌লের পরবর্তী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের দৃষ্টিতে তাঁহার এই মানচিত্রের যে সকল ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে, সাধারণভাবে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রথমত, রিজ্‌লে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের ফরমুলা মতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক লোকের মাথা, নাক মুখ, দেহের দৈর্ঘ্য ইত্যাদির মাপ লইবার জন্ত যে যন্ত্রপাতি, প্রণালী ও কর্মীর সাহায্য লইয়াছিলেন, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ সে সকলের ত্রুটি বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা রিজ্‌লের নিজের এ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাবের কথা বলিয়াছেন। তারপর সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া যে প্রণালীতে সেই বিশ্লেষণ হইতে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন সেই প্রণালীর ও সেই সিদ্ধান্তের বহু ত্রুটি বাহির করিয়াছেন।

সমালোচকগণ বলেন, রিজ্‌লের বর্ণিত দ্রাবিড় গোষ্ঠী একটি গোষ্ঠী নহে। যাহাদের মধ্যে রিজ্‌লের নিজের বর্ণিত দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লক্ষণ দেখা যায় না তাহারাও দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত হইয়াছে রিজ্‌লের নক্সায়। তাঁহাদের মতে নেগ্রিটো, প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড ও দ্রাবিড় এই তিনটি পৃথক গোষ্ঠীকে রিজ্‌লে দ্রাবিড় গোষ্ঠীতে ফেলিয়াছেন। আধুনিক সমালোচকগণ দ্রাবিড় নামটিও ত্যাগ করিয়াছেন এই জন্ত যে উহা একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম। তাঁহাদের ব্যবহৃত

নূতন নাম মেডিটারেনীয়ান। ভারতবর্ষের মধ্যে মেডিটারেনীয়ান নাম শুধু যাহারা দ্রাবিড় ভাষা বা দক্ষিণ ভারতের তেলেগু, কানাড়ী, মলয়ালী, কোদাগু ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, ইহার প্রয়োগ আরও ব্যাপক। রিজ্‌লে যাহাদিগকে ইন্দো-আরিয় বলিয়াছেন, তাহাদের নূতন নামকরণ হইয়াছে ইন্দো-আফগান। এই দলের মধ্যেও মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর লোক আছে। রিজ্‌লের বর্ণিত আরিয়-দ্রাবিড় টাইপ বলিয়া কোন টাইপের অস্তিত্ব এখন স্বীকার করা হয় না।

সিথিয়ানরা গোলমুণ্ড জাতি এবং প্রাচীনকালে পশ্চিম ভারতে কিছুদিনের জন্য সিথিয়ান বলিয়া বর্ণিত শক্, হূণ প্রভৃতি জাতির রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই হেতু রিজ্‌লে পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সিথিয়ান সংমিশ্রণের কথা বলিয়াছেন। সমালোচকরা বলেন, সিথিয়ান জাতির আধিপত্য উত্তর ভারতের কোন কোন অংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে সিথিয়ান সংমিশ্রণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন? সিথিযান বলিয়া বর্ণিত জাতিগুলি বাস্তবিক কোন্ টাইপের ছিল সে সম্বন্ধে রিজ্‌লের নিশ্চিত কোন ধারণা ছিল না এবং যে সকল যুক্তি তিনি গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, এ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল না। তাঁহার যুক্তি সংক্ষেপে এই যে সিথিয়ানরা গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর অধ্যুষিত পূর্ব তুর্কীস্তান হইতে আসিয়াছিল এবং পশ্চিম ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যে গোলমুণ্ডত্ব দেখা যায়—তাহারাই উহার জন্ম দায়ী।

এইবার পূর্ব ভারতের মোঙ্গলো-দ্রাবিড় টাইপের কথায় আসা যাউক।

রিজ্‌লের মানচিত্র মতে দ্রাবিড় গোষ্ঠী ভারতবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চল, অর্থাৎ সমগ্র উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকার মত নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা ও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দোয়াবেরও আদিবাসী। সুতরাং এ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে নূতন কিছু বলা হইতেছে না। কিন্তু সিন্ধুদেশ হইতে কুর্গ পর্যন্ত অঞ্চলের মত ভারতবর্ষের এই পূর্বাঞ্চলেও গোলমুণ্ড টাইপের লোক পাওয়া যাইতেছে। কাজেই প্রশ্ন উঠে, পূর্ব ভারতের এই গোলমুণ্ড টাইপ কোথা হইতে আসিল? অন্ত কোন পণ্ডিত হয়ত পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ভাষা,

কৃষ্টি, সমাজ ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়া এই গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার পূর্বে বিশেষ চিন্তা ও অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করিতেন। কিন্তু রিজ্‌লে তাহা করেন নাই, প্রশ্নের উত্তর তাঁহার তৈয়ারী ছিল। রাঙ্গামাটির চাকমা, আরাকানের মগ, আসামের মেচ ও বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ যাঁহার সংগৃহীত তথ্য হইতে একগোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য তাঁহার বিলম্ব হইবার কথা নহে।

রিজ্‌লে দেখিলেন যে, সিথিয়ানরা বাঙলাদেশে আসিয়াছিল ইতিহাসে এমন কথার উল্লেখ নাই। এদিকে দেখা যাইতেছে যে বাঙলাদেশের উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত নানা জাতি বাস করে। কোন কোন জায়গায় সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। হাতের কাছে এই প্রমাণ থাকিতে হাঁটকাইয়া বেড়াইবার কোন মানে হয় না। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন বাঙলাদেশে আদি অধিবাসী দ্রাবিড়ের সঙ্গে মোঙ্গল গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইয়াছে। সুতরাং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙালী মোঙ্গল-দ্রাবিড় সংমিশ্রণে উৎপন্ন মিশ্র জাতি হইয়া গিয়াছে।

রিজ্‌লের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খানিকটা আন্দোলন ও প্রতিবাদ হইল। শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া তখনকার প্রতিবাদকারীরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে বাঙালী রীতিমত আর্যগোষ্ঠীর জাতি।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রিজ্‌লের এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে, বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা আক্রমণ করা হইল। রিজ্‌লের সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক সমালোচক বলিলেন, মোঙ্গলীয় লক্ষণ বলিতে কি শুধু গোলমুণ্ড বুঝায়? যে সকল লক্ষণ ধরিয়া কোন জাতির মধ্যে মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ আছে কিনা বিচার করিতে হয় তাহার মধ্যে মুখ ও নাকের ইনডেক্স আছে, চুলের বৈশিষ্ট্য আছে, দেহের দৈর্ঘ্য আছে, ত্বকের বর্ণ আছে এবং বিশেষ করিয়া চক্ষুর গঠনের বৈশিষ্ট্য আছে। ভাষা, কৃষ্টি, সমাজব্যবস্থার কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু নৃ-বিজ্ঞানের ফরমুলা মতে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তে আসিতে আর সব দৈহিক লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র মস্তকের আকৃতির প্রমাণের ভিত্তিতে কেন সিদ্ধান্ত করা হইতেছে? গোলমুণ্ড হইলেই কি মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ বুঝিতে হইবে? নেগ্রিটো, নেগ্রিলো জাতি গোলমুণ্ড;

হিন্দুকুশ ও পামীরের উপজাতিরা গোলমুণ্ড; ইউরোপীয় আল্লাইন জাতিগুলি গোলমুণ্ড; পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরাও গোলমুণ্ড। আর মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত সব জাতি কি গোলমুণ্ড? আসাম ও নেপালের মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত জাতিগুলির মধ্যে লম্বামুণ্ড টাইপ পাওয়া যায় কেন? ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক সমালোচক আরও প্রশ্ন উঠাইলেন। পশ্চিম ভারতের সিথিয়ান জাতির লোক বহু সংখ্যায় প্রবেশ করিয়াছিল, শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিল, অনেকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে। সুতরাং সেখানে সিথিয়ানদের সঙ্গে দেশের অধিবাসীদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, একথা বলিবার অন্ততঃ একটা উপলক্ষ্য আছে। মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর জাতি বহু সংখ্যায় বাঙলা দেশের অভ্যন্তরে ভাগে প্রবেশ করিয়াছিল, দেশের সর্বত্র ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল ইহার ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ আছে কি? এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে ও ইতিহাসে মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে দেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলির অধিবাসীরূপে উল্লেখ দেখা যায়। তাহারা এখনও সেই অঞ্চলগুলিতে বাস করিতেছে।

সমালোচকগণ বলিলেন, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর যে সকল লক্ষণ তুমি বর্ণনা করিয়াছ এবং মোঙ্গলয়েড টাইপের যে সকল লক্ষণ নৃ-বিজ্ঞানীরা দিয়াছেন, এই দুই টাইপের দুই সেট দৈহিক লক্ষণের কতগুলি বাঙলা দেশের অধিবাসীর মধ্যে পাইতেছ তাহার হিসাব কোথায়? এই দুই টাইপের কোনটিতে যে ফেসিয়াল ইন্‌ডেক্স, নেজাল ইন্‌ডেক্স পাওয়া যায় না সেই ইন্‌ডেক্সের ব্যাখ্যা কোথায়?

সমালোচকগণের মতে রিজ্‌লের তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল অতিশয় অসন্তোষজনক। তাহা ছাড়া কোন অঞ্চলেই নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকের মাপজোখ করিবার ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। বাঙলা ও তাহার প্রতিবেশী অঞ্চল অর্থাৎ বিহার, উড়িষ্যা ও নিম্ন আসামের অধিবাসীদের মধ্যে এইভাবে অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিলে এবং সেই তথ্য হইতে এই অঞ্চলগুলির প্রধান টাইপ কি দাঁড়ায় তাহা লক্ষ্য করিলে রিজ্‌লের সিদ্ধান্ত অনুরূপ হইত। কিন্তু এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অবসর তাঁহার ছিল না। গুজরাট হইতে কুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্য তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহার যাহা হউক একটা ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। কিন্তু কন্নাড়

হইতে এই টাইপ অতঃপর যে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে সে পথ তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সমালোচক বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থিত করিয়া রিজ্‌লের অঙ্কিত ভারতবর্ষের অধিবাসীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের মানচিত্রের ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিতে অগ্রসর হইলেন তাঁহার নাম রমাপ্রসাদ চন্দ।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটী কর্তৃক উহার অবৈতনিক সম্পাদক রমাপ্রসাদ চন্দের '*The Indo-Aryan Races*' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে মাত্র প্রথম দুইটিতে ও পঞ্চম অধ্যায়ে নৃ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম দুইটি অধ্যায় ১৯০৫ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের একখানি ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে গ্রন্থ মধ্যে স্থান পায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রিজ্‌লের সিথো-দ্রাবিড় ও মোঙ্গলো-দ্রাবিড় টাইপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানিতে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের জাতিতত্ত্ব, বৈদিক যুগের সমাজ-ব্যবস্থা, ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদের অভ্যুদয় ও তাৎপর্য, জাতিভেদ, মধ্যদেশ ও তাহার বহির্ভূত অঞ্চলের সমাজব্যবস্থা, ইন্দো-আরিয় ও ইরাণী জাতির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে নানা আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনা প্রসঙ্গে এমন বহু মত ব্যক্ত করা হইয়াছে, বর্তমানকালে যাহার বিশেষ মূল্য নাই। রমাপ্রসাদবাবু স্বয়ং এই গ্রন্থে ব্যক্ত কোন কোন মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তী রচনাগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল রচনা, বিশেষতঃ আর্কিওলজিকাল সার্ভে বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার মূল্যবান 'মেমোয়ার' গুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

এই গ্রন্থে তাঁহার বক্তব্য প্রাচীন ইন্দো-আরিয় জাতির দুই অংশের সম্বন্ধ নির্ণয় করা। দুই অংশের সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, ভাষা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা করিয়া এই সম্পর্ক নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহার মতে ইন্দো-আরিয় জাতির দুই অংশের মধ্যে প্রাচীনতম ও প্রধান অংশ প্রাচীন মধ্যদেশের অধিবাসী। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ মধ্যদেশের প্রতিবেশী অঞ্চলের আর্য ভাষাভাষী জাতিগুলি। প্রাচীন সাহিত্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই দুই অংশের মধ্যে একটা

বিরোধের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই বিরোধ, যাহা ভিন্ন কৃষ্টি, পৃথক আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে খানিকটা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মূল কারণ এই যে, দুইটি অংশের উৎপত্তি হইয়াছে দুইটি পৃথক গোষ্ঠী হইতে।

ইহার পরে তাঁহার প্রধান বক্তব্য আসিয়াছে। মধ্যদেশের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির জাতিগুলি সমাজব্যবস্থায় কৃষ্টিতে ভাষায় এক, প্রাচীন সাহিত্যের প্রমাণের সাহায্যে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন এবং নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কে তাহারা যে এক গোষ্ঠীভুক্ত তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

প্রথম বক্তব্য বলিতে গিয়া তিনি প্রচলিত য়ুরোপীয় আর্যবাদ মানিয়া লইয়াছেন, যদিও কিছু নূতন কথা এসম্বন্ধে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় বক্তব্য বলিতে গিয়া তিনি রিজ্‌লের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়া মধ্যদেশের প্রতিবেশী অঞ্চলের জাতিগুলির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখা প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতে এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না এই ব্যাখ্যা তাঁহার খ্যাতির প্রধান কারণ। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চন্দ মহাশয় নৃ-বিজ্ঞান মতে নূতন তথ্য সংগ্রহ ও তাহা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার নূতন মত প্রচার করেন নাই, অপরের সংগৃহীত তথ্যের আলোকে নূতন পথ দেখিতে পাইয়া তিনি সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই পথে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, তিনি ততদূর অগ্রসর হন নাই। হইলে যে গভীর পাণ্ডিত্য ও সার্চলাইটের মত কল্পনাশক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন, বিস্মৃত ইতিহাসের অনেক অন্ধকার অধ্যায়ের উপর আলোকরেখা ফেলিয়াছেন, সেই পাণ্ডিত্য ও আলোক-বিকিরণী কল্পনাশক্তির সহায়তায় অপব্যাখ্যার কুজ্ঝটিকা জালের মধ্য দিয়া দূর, অতীত ইতিহাসের আলোক-উজ্জ্বল চিত্র দেশের লোকের নিকট উদ্ঘাটিত করিতে পারিতেন।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জানিবার জন্ত তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে রিজ্‌লে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত বেশী কিছু তথ্য সঙ্কলন করিবার সুযোগ রমাপ্রসাদ চন্দ পান নাই। স্বাধীনভাবে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতবর্ষের কয়েকটি অংশের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে যে নূতন প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, তিনি সে প্রশ্নের

উত্তরের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন দুইটি বিভিন্ন বিভাগের গবেষকদিগের সংগৃহীত তথ্য হইতে। একটি ইঙ্গিত পান হিন্দুকুশ, পামীর ও পূর্ব তুর্কীস্তানের অধিবাসীদের পরিচয় জানিবার জন্য যে সকল প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের লেখা হইতে। দ্বিতীয় ইঙ্গিত পান ভারতীয় ভাষাগুলির সম্বন্ধে বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী গ্রীয়ারসনের গবেষণা ও সিদ্ধান্ত হইতে।

হিন্দুকুশ, পামীর ও পূর্ব তুর্কীস্তানের অধিবাসীদের লইয়া যে সকল পণ্ডিত কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পর্যটক ও পুরাতত্ত্ববিদ স্যর অরেল ষ্টাইন কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের যে বিস্তারিত সমালোচনা লণ্ডনের রয়েল এন্থ্রোপোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাহার উপরই তিনি বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন। এই আলোচনা করিয়াছিলেন মিঃ টি. এ. জয়েস। হিন্দুকুশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে মিঃ জয়েস প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী উজফালভীর তথ্য ও সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার আলোচনার মধ্যে।

গ্রীয়ারসনের ইন্দো-আরিয় ভাষাগুলির শ্রেণীবিভাগ হইতে রমাপ্রসাদ চন্দ এই প্রশ্নের উত্তরের যে ইঙ্গিত পান এই আলোচনা সেই ইঙ্গিতকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে সাহায্য করে।

রিজ্‌লে বাঙালী জাতিকে মোঙ্গল-দ্রাবিড় সংমিশ্রণে উদ্ভূত মিশ্র জাতি বলিয়া ঘোষণা করিলে তাহার প্রতিবাদ হইয়াছিল একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবাদকারীরা বলিতে পারেন নাই বাঙালীর গোলমুণ্ডত্ব আসিল কোথা হইতে। রিজ্‌লে যখন বাঙলার দরজার কাছে মোঙ্গলীয় লক্ষণবিশিষ্ট জাতিগুলির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া এই গোলমুণ্ডত্ব কোথা হইতে আসিয়াছে বলিলেন, তখন তাঁহাদিগকে নিরুত্তর থাকিতে হইয়াছিল। কারণ বাঙালীদের মধ্যে আর্যভাষা, আর্যকৃষ্টি, আর্য সমাজব্যবস্থার দোহাই দিয়া নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীকে নিরুত্তর করা সম্ভব ছিল না।

কি ধরণের উত্তর দিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ রিজ্‌লের যুক্তি খণ্ডন করিলেন তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিনি বলিলেন বাঙালীর মধ্যে যে গোলমুণ্ডত্ব দেখা যায়, তাহা মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণের ফল হইতে পারে না। মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ ঘটিলে শুধু গোলমুণ্ডত্বটুকু আসিবে আর কোন মোঙ্গলীয় লক্ষণ আসিবে না, ইহা অসম্ভব কথা। বাঙলা

হইতে পূর্ব উপকূল ঘেঁষিয়া কর্ণাটের মধ্যে দিয়া সিন্ধুদেশ পর্যন্ত যে গোলমুণ্ড টাইপ প্রধান অঞ্চল দেখা যায়, সেদিকে তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও সিন্ধুদেশে যে গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়, পূর্ব ভারতের গোলমুণ্ড টাইপ হইতে তাহা অভিন্ন। এই টাইপ মোঙ্গলীয় নহে, সিথিয়ানও নহে। তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়াইল বাঙলাদেশে গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তি নয়, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের দুই প্রান্ত ছুঁইয়া অর্ধবৃত্তাকারে গোলমুণ্ড জাতির চলার যে পথ পাওয়া যাইতেছে সেই জাতি কোথা হইতে আসিল? সিন্ধু উপত্যকার কাছে কোথায় গোলমুণ্ড জাতির বাসভূমি পাওয়া যাইতেছে? স্যর অরেল ষ্টাইনের তথ্য লইয়া মিঃ জয়েস দেখাইলেন যে, প্রাচীনকালে সমগ্র পূর্ব তুর্কীস্তানে একটি অমোঙ্গলীয় গোলমুণ্ড জাতি বাস করিত। তাকলামাকান ও লব মরুভূমির বালুকাস্তরের নীচে প্রোথিত শহরগুলির ধ্বংসস্তূপ হইতে এই জাতির অস্তিত্বের বহু নিদর্শন মিলিয়াছে। পূর্ব তুর্কীস্তানের শহরগুলির বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে তুর্ক গোষ্ঠীর সঙ্গে এই জাতির সংমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব তুর্কীস্তান ছাড়িয়া চীনের হোনান পর্যন্ত এই জাতির অগ্রসর হইবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই জাতিকে প্রায় অমিশ্র অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে পামীর উপত্যকার বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে। পামীর ছাড়িয়া পশ্চিমে বোখারা বা তাজিকীস্তানের অধিবাসী ও পূর্ব ইরাণের অধিবাসীদের মধ্যে এই জাতির সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে হিন্দুকুশের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে।

রমাপ্রসাদ চন্দ বলিলেন, পূর্ব তুর্কীস্তানের আদিম অধিবাসী এই গোলমুণ্ড পামীর ও হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়াছিল। সিন্ধু উপত্যকা হইতে দক্ষিণে নামিয়া পশ্চিম উপকূল ধরিয়া তাহারা অগ্রসর হইয়াছিল। অর্ধবৃত্তাকার যে পথের কথা বলা হইয়াছে, সেই পথ ধরিয়া তাহারা বাঙলাদেশে উপস্থিত হয়।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, সিন্ধু উপত্যকা হইতে পূর্ব পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া শতদ্রু ও যমুনা পার হইয়া গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরিয়া অগ্রসর না হইয়া যে রকম অর্ধবৃত্তাকার পথের কথা বলা হইয়াছে, সেই পথে ইহারা অগ্রসর হইল কেন? তিনি ইহার উত্তর দিয়াছেন। সিরহিন্দ হইতে যমুনা ও গাঙ্গেয় উপত্যকার

উত্তরাংশ তখন বৈদিক আর্যদিগের অধিকারে। বৈদিক আর্যদিগের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে না পারিয়া তাহারা সিন্ধু উপত্যকা হইতে দক্ষিণে, উপকূল অঞ্চল ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল।

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে গোলমুণ্ডত্বের উৎপত্তির এই ব্যাখ্যা রমাপ্রসাদ চন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে।

তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে কয়েকটি কথা পাওয়া যাইতেছে। আর্য জাতি (বা বৈদিক আর্যজাতি) মধ্যদেশ অধিকার করিয়াছিল গোলমুণ্ড জাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার আগে। পূর্ব তুর্কীস্তান হইতে পামীর ও হিন্দুকুশ হইয়া যে গোলমুণ্ড জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহাদের ভাষা ছিল আর্য গোষ্ঠীর ভাষা। এইজন্য তিনি তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন, অবৈদিক আর্য জাতি আর মধ্যদেশের আর্য জাতির নাম দিয়াছেন বৈদিক আর্য জাতি। এ সকল কথা পরে হইবে, তাঁহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে।

গ্রীয়ারসনের আর্য ভাষাগুলির শ্রেণী বিভাগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে গ্রীয়াবসনের নিকট রমাপ্রসাদ চন্দের ঋণ কতটা ছিল বুঝা যাইবে।

মধ্যপ্রদেশের ভৌগোলিক সীমানা নির্দেশ করিয়া গ্রীয়ারসন বলিতেছেন,

"Round it, on three sides,—west, south and east, lay a country inhabited, even in Vedic times by other Indo-Aryan tribes. This tract included the modern Punjab, Sind, Gujerat, Rajputana, and the country to the east, Oudh and Bihar."

এই সকল অঞ্চলের অধিবাসী জাতিগুলির প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা ছিল এবং এই ভাষাগুলির পরস্পরের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহাদের কোনটির মধ্যদেশের ভাষার সঙ্গে সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। "In fact, at an early period of the linguistic history of India there must have been two sets of Indo-Aryan dialects, one the language of

the Midland, and the other the group of dialects from the Outer Band." মধ্যদেশের অধিবাসী জাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "The latest arrivals probably entered the country like a wedge, into the heart of the country already occupied by the first immigrants, forcing the latter outwards in the three directions, to the east, to the south and to the west." তারপর তিনি বলিতেছেন যে, মধ্যদেশের অধিবাসীদের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের ফলে পূর্ব পাঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট ও অযোধ্যায় মধ্যদেশীয় ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরে গ্রীয়ারসনের মতে, "The inhabitants of the Outer Band also expanded to the south and east, In this way we find Marathi in the C. P., Berar and Bombay, and to the east Oriya, Bengali and Assamese."

গ্রীয়ারসনের এই ভাষাতাত্ত্বিক মানচিত্রের সঙ্গে রিজ্‌লের নৃতাত্ত্বিক মানচিত্রের তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে শুধু গ্রীয়ারসনের নিকট চন্দের ঋণের কথা বলা হইতেছে।

আউটার ব্যাণ্ডের জাতিগুলি যে একটি ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে, সেই ভাষা যে আর্যগোষ্ঠীর ভাষা এবং সেই ভাষাভাষীরা যে মধ্যদেশকে অর্ধবৃত্তাকারে (south, west, east) বেষ্টন করিয়া বাস করে ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়ের এই ইঙ্গিত হইতে চন্দ এই সকল জাতির নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক নির্ণয় করিবার প্রেরণা লাভ করিয়া থাকিতে পারেন।

মধ্যদেশের অধিবাসী জাতি, চন্দের ভাষায় বৈদিক আর্যজাতি, যে আউটার ব্যাণ্ডের জাতিগুলির পরে আসিয়াছিল হর্ণেলী ও গ্রীয়ারসনের এই মত চন্দ গ্রহণ করেন নাই।

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের যে সকল জাতির মধ্যে গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যায় তাহাদের মধ্যে যে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণ নাই, তাহারা যে এক গোষ্ঠীভুক্ত (ethnic stock) ইন্দো-আরিয় জাতি ও এই জাতি যে পামীর ও পূর্ব তুর্কীস্তানের গোলমুণ্ড জাতির এলাকা হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল

চন্দের প্রচারিত এই মত পরবর্তী প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের অনেকেই মানিয়া লইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ইটালীয়ান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী জিউক্রিদা রুগ্‌গেরী বাঙালীর মধ্যে রিজ্‌লের বর্ণিত মোঙ্গল সংমিশ্রণের কথায় বলিতেছেন : "It is high time to do away with the prejudice that a Mongolian invasion and an invasion by brachycephals are one and the same thing," পশ্চিম ভারতে সিথিয়ান সংমিশ্রণের কথায় তিনি বলিতেছেন, রিজ্‌লের ব্যাখ্যা অসঙ্গতিপূর্ণ। রমাপ্রসাদ চন্দের যুক্তি মানিয়া লইয়া তিনি বলিতেছেন, ভারতবর্ষের এক বৃহৎ অংশে অমোঙ্গলীয় গোলমুণ্ড জাতির প্রাধান্য দেখা যায় : "Evidently the introduction of the brachycephals must go back to pre-historic age."

তাঁহার মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই গোলমুণ্ড জাতি পামীর ও তাকলামাকান মরুভূমি অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল।

গুজরাট, মারাঠি, কানাড়ী ও কুর্গীদের উল্লেখ করিয়া ডাঃ হেডন বলিতেছেন : "In this group of people, it is evident, that there has been a mixture with a strong brachycephalic stock which must have belonged to the Eurasiatic stock, since there is no trace of 'Mongolian' characters." ডাঃ হেডন ইঁহাদের মধ্যে সিথিয়ান সংমিশ্রণের মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ডাঃ হেডনের বর্ণিত Eurasiatic stock-এর অধ্যুষিত অঞ্চল পামীর হইতে পশ্চিম আনাতোলিয়া পর্যন্ত।

ডাঃ হাটন ও ডাঃ গুহ রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ হাটনের মতে "The theory of invasion of Alpines from the Pamirs as the explanation of West Indian brachycephaly may be unreservedly accepted." তারপর তিনি বলিতেছেন যে, বাঙলা পর্যন্ত এই জাতি অগ্রসর হইয়াছে। বাঙলায় ইহারা কোন্ পথে আসিল সে সম্বন্ধে তাঁহার মত চন্দ ও ডাঃ গুহের মত হইতে অন্যরূপ। তিনি বলেন এই জাতি বৈদিক

আর্য জাতির চাপে উত্তর ভারত হইতে গঙ্গার উপত্যকা ধরিয়া বাঙলায় পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার কথায় আসাম ও উড়িষ্যার মধ্যে "The Bengali element is definitely intrusive."

রমাপ্রসাদ চন্দের যে ব্যাখ্যা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ গ্রহণ করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যা মতে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় যে জাতিগুলির মধ্যে গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যায় তাহারা পামীর ও তাকলামাকান হইতে আগত গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর বংশধর। এই গোষ্ঠীর নানা রকম নামকরণ করা হইয়াছে। ইহারা গ্রীয়ারসনের মতে ইন্দো-আরিয় ভাষাভাষী। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ এই গোষ্ঠীর মধ্যে কন্নাদের অধিবাসী ও তামিল অঞ্চলের অধিবাসীদের এক অংশকে ফেলিতেছেন। ইহারা ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে দ্রাবিড় ভাষাভাষী। রমাপ্রসাদ চন্দ মধ্য দেশের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির অধিবাসীদিগকে অবৈদিক আর্য নাম দিয়াছেন। এই নাম সম্ভবতঃ ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথা মানিয়া লইলে যে মধ্যদেশের অধিবাসীদিগকে চন্দ বৈদিক আর্য নাম দিয়াছেন তাহাদের আর্য নামের ভিত্তি কি, সে প্রশ্ন উঠে। কারণ, দেখা যায় যে, গ্রীয়ারসন দুই দলকেই ইন্দো-আরিয় নাম দিয়াছেন ভাষার দিক হইতে; আর চন্দ দুই দল পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত বলিবার পরে দুই দলকে ইন্দো-আরিয় নাম দিয়াছেন। চন্দ, জিউফ্রিদা রুগ্‌গেরী, ডাঃ হেডন যখন তাঁহাদের মত প্রচার করেন তখন মোহেঞ্জোদারোর প্রাচীন নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই আবিষ্কারের ফলে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতের পরিবর্তন করা আবশ্যক হইয়াছে। ডাঃ হাটন ও গুহের রচনায় এই পরিবর্তিত মত পাওয়া যায়।

এ সকল আলোচনা স্থগিত রাখিয়া পুনরায় রিজ্‌লের ব্যাখ্যায় ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক।

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে মোঙ্গলো-দ্রাবিড় ও সিথো-দ্রাবিড় সংমিশ্রণের মধ্যে মোঙ্গলীয় ও দ্রাবিড় সংমিশ্রণের ব্যাপার পরবর্তী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ এক বাক্যে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এখন থাকিতেছে দ্রাবিড় সংমিশ্রণের কথা।

রিজ্‌লের দ্রাবিড় টাইপের সংজ্ঞা পরবর্তী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব পৃষ্ঠায় কিছু বলা হইয়াছে। রিজ্‌লের দ্রাবিড় বলিয়া বর্ণিত টাইপকে তিনটি পৃথক টাইপে ভাগ করা হইয়াছে। একটি প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড, একটি প্যালীমেডিটাবেনীয়ান ও একটি মেডিটাবেনীয়ান। ডাঃ গুহ আরেকটি মেডিটারেনীয়ান টাইপের কথা বলিয়াছেন, Oriental Race। রিজ্‌লের বর্ণিত ইন্দো-আরিয় টাইপের এলাকা পাঞ্জাব ও আরিয়-দ্রাবিড এলাকা যুক্তপ্রদেশে এই টাইপ দেখা যায়।

চন্দ প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীব নাম দিযাছেন নিষাদ এবং ডাঃ গুহ এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষেব আদিবাসীদিগকে সাধারণভাবে এই গোষ্ঠিভূক্ত বলা হইয়াছে। এই টাইপ বাদ দিলে মেডিটাবেনীয়ান ও ইন্দো-আরিয় এই দুইটি টাইপ বলিয়া কোন টাইপ নাই। রিজ্‌লের ইন্দো-আরিয় টাইপের মধ্যে মেডিটাবেনীযান, প্রোটো-নর্ডিক (নামটি ডাঃ হেডনের উদ্ভাবিত) প্রভৃতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ আছে।

স্যর জন মার্শালের গ্রন্থ, ডাঃ হাটন ও ডাঃ গুহের রচনা প্রকাশিত হইবার পরে রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যাখ্যার প্রামাণিকতা সুদৃঢ় হইয়াছে, কিন্তু ব্যাখ্যার কতক অংশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইয়াছে।

উত্তর ভারত এবং পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসী পৃথক গোষ্ঠীভূক্ত, চন্দ এই মত তাঁহার গ্রন্থে প্রাচীন সাহিত্য হইতে সংগৃহীত বহু তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তর ভারতের অধিবাসীদেব নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে চন্দ রিজ্‌লের সিদ্ধান্তের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। রিজ্‌লে তাঁহার সিদ্ধান্ত ধার করিয়াছিলেন প্রচলিত য়ুরোপীয় আর্যবাদ হইতে। য়ুরোপীয় আর্যবাদের সমর্থকরূপে চন্দকে এই গ্রন্থে দেখা যায়। পরবর্তী রচনাগুলিতে তাঁহার মতের বহু পরিবর্তন হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য এবং তাঁহার নিজের প্রাচীন সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য মিলাইয়া পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের নূতন ব্যাখ্যা প্রচার করিবার যে সুযোগ তাঁহার জীবনকালে পাইয়াছিলেন, নানা কারণে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হইয়া উঠে নাই।

বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে রিজ্‌লের থিওরী, রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যাখ্যা প্রচারিত ও গৃহীত হইবার পরেও, অনেক আশ্চর্য ফল প্রসব করিয়াছে।

কেহ বাঙালীর পেলবতার অনুশীলন ও রোমান্সপ্রিয়তার সূত্র পাইয়াছেন তাহার মোঙ্গলোদ্রাবিড় উৎপত্তির মধ্যে। কেহ বলিয়াছেন বাঙালী জাতি সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগত এক অজ্ঞাত-পরিচয় জাতি। কেহ বলেন বাঙালী জাতি সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়া পূর্ব উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং বাঙালী ও তামিল এক গোষ্ঠীভুক্ত জাতি। কেহ বলেন বাঙালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে মুণ্ডাগোষ্ঠী হইতে এবং তামিল জাতির উৎপত্তি নিগ্রো গোষ্ঠী হইতে। কেহ আবার বাঙালীর মধ্যে মালয়, ইন্দোনেশিয়ান, পলিনেশিয়ান, মেলানেশিয়ান প্রভৃতি সংমিশ্রণের কথা বলিয়াছেন। এ সকল কথার আলোচনা অনাবশ্যক। ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, সমাজগঠন, কৃষ্টি প্রভৃতি উড়াইয়া দিয়া নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের গবেষণা, গবেষণা নহে, উহা কল্পনাবিলাস।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

॥ ৫ ॥

বিদেশে ভারতবাসী

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আয়তন অনেক বার পরিবর্তিত হইয়াছে। মৌর্য আমলে ভারতবর্ষ উত্তরে হিন্দুকুশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল অর্থাৎ ব্যাকট্রিয়া বা আফগান তুর্কিস্তান বাদে পশ্চিমে হিরাট পর্যন্ত সমগ্র আফগানিস্তান মৌর্য ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত ছিল। পণ্ডিতগণের মতে হিমালয় নহে, হিন্দুকুশ ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক উত্তর সীমানা। ("The first Indian Emperor (Chandragupta), more than two thousand years ago, entered into possession of that scientific frontier sighed for in vain by his English successors and never held in its entirety by the Mughal monarchs of the 16th and 17th centuries"—V. Smith). খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত কাবুল সহ সমগ্র পূর্ব আফগানিস্তান ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত ছিল। দিল্লীতে তুর্ক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে আফগানিস্তান ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মুঘল আমলে আবার আফগানিস্তান ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নাদির শাহ আফগানিস্তান দখল করিবার পর হইতে উহা স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং বলা যায় যে, শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্বে, যাহা দেশের ভৌগোলিক আয়তনকে খণ্ডিত করে এমন কোনরূপ রাজনৈতিক আয়তন পরিবর্তনের ব্যবস্থা বা সীমানা নির্ধারণ স্থায়ী হইতে পারে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা বলিতে বিদেশীরা যে সাব-কন্টিনেন্টের কথা বলেন আমরা সেই সাব-কন্টিনেন্টাল বা ভৌগোলিক ভারতবর্ষের কথা বলিতেছি।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে ব্যক্তি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ, সেও বলিতে পারিবে যে, সভ্যতা ও শক্তিতে এই ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ কোন সময়ে উন্নত হইয়া উঠিলে, অপরকে দান করিবার মত সম্পদ নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইলে তাহাদের

সম্প্রসারণের ক্ষেত্র প্রথমে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে, পরে দক্ষিণ-পূর্বে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইবে। উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ অবিচ্ছিন্ন স্থলপথে সহজ পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণে সমুদ্র অতিক্রম করা আবশ্যক।

উত্তরে আফগানিস্তান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানা (বর্তমান নাম তাজিকীস্তান), উত্তর-পশ্চিমে ইরাণ ও উত্তর-পূর্বে চীনা তুর্কিস্তান বা সিংকিয়াং, মোঙ্গলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কৃষ্টিগত সম্পর্কের ইতিহাস অনেকটা পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগের ইতিহাস ফরাসী ও ডাচ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় খানিকটা উদ্ধার হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য আমাদিগকে অভিভূত করে। এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রপথে ভারতবাসীর অভিযান কাহিনী।

এই অভিযানকে দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিবার কারণ আছে। সে কারণ কি, বলা হইতেছে: দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতবাসী খ্রীঃ পূঃ চার হইতে তিন হাজার বৎসর পূর্বে সুমেরিয়া ও বেবিলোনের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। এক জন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিম ভারতের সহিত মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগ খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের প্রাচীন, ইহা খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারে। খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ৪০০০ বৎসর পূর্বে এই দুই দেশের মধ্যে সেগুন কাঠ ও মসলিনের ব্যবসায় চলিত (J. R. A. S. xx. 336, 337, xxi. 204)। হিন্দুদিগের মধ্যে চান্দ্রমাস গণনার রীতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। অনুমান করা হয়, চান্দ্রমাস গণনার রীতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়া থাকিলে উহা খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের পূর্বে আসিয়াছিল; কারণ সারগণের সময়ে (নিউ-বেবিলোনীয়ান মতে সারগণের কাল খ্রীঃ পূঃ ৩৮০০ বৎসর) উহা প্রাচীন রীতি বলিয়া পরিগণিত হইত।

খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে মিশরের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিশরে

খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ বৎসরের কবরে ভারতীয় মসলীন ও নীল (indigo) পাওয়া গিয়াছে (J. R. A. S. xx. 206)। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের (খ্রীঃ পূঃ ১৭ শ হইতে ১৬শ শতাব্দী) চতুর্থ এমেনোফিস চক্র প্রতীকে পূজিত 'এটেন' নামে পরিচিত সূর্য দেবতার উপাসনার প্রচলন করেন। মিশরীয় পুরাতত্ত্ব-বিজ্ঞানী কোন কোন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিশরে এই উপাসনা ছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা এমন অনুমানও করিয়াছেন যে, চতুর্থ এমেনোফিসের পিতা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয় ছিলেন। মিশরীয় ইতিহাসের মতে চতুর্থ এমেনোফিসের মাতা রাণী তাই-এর স্বামী ছিলেন মিশরে বৈদেশিক আগন্তুক।

খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে কার্থেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতবর্ষের সহিত ধর্ম ও কৃষ্টিগত সম্পর্কের প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে মেক্সিকোর মায়া জাতির মধ্যে। এই সম্পর্ক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। মায়া জাতির নিকট হইতে অনেক ভারতবর্ষীয় জিনিষ পরে আজটেক জাতি গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপ দুই চারিটা বিচ্ছিন্ন তথ্যের টুকরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অধ্যায়ের কথা অস্পষ্ট আলোকের রেখার মত চোখের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতে চাহে সে অধ্যায়ের বিস্তারিত পরিচয় কবে পাওয়া যাইবে ?

এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির কথায় আসা যাউক।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুইটি দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের পরিচয় তাহাদের নাম বহন করিতেছে—ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ার অপর নাম "Insulindia" বা দ্বীপময় ভারত। এই দুইটি দেশ ছাড়া ব্রহ্ম, মালয়, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত। ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও অষ্ট্রেলিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত।

সমুদ্রপথে যাতায়াত সহজ ও সাধারণ ব্যবস্থা হইলেও ব্রহ্ম-শ্যাম-মালয়-ইন্দোচীনের সঙ্গে ভারত স্থলপথে সংযুক্ত। এই স্থলপথেই আজাদ-হিন্দ বাহিনী শ্যাম হইতে ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া ইম্ফল ও কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ব্রহ্মের ইতিহাসের সঙ্গে শ্যামের ইতিহাস, শ্যামের ইতিহাসের সঙ্গে মালয়ের ইতিহাসের সংযোগ আছে। ইন্দোচীনের সঙ্গে শ্যামের ও চীনের ইতিহাসের

সংযোগ আছে। সুমাত্রা হইতে নিউগিনি পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপমালা লইয়া গঠিত ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস আলাদা। ফিলিপাইন ও অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সীমান্তবর্তী দুইটি অঞ্চল, তাহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদা ও প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের সহিত এই ইতিহাসের সম্পর্ক নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সকল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্পর্ক আছে, সেই অঞ্চলগুলির কথা বলিতে গিয়া প্রথমে যে জিনিষটি চোখে পড়ে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ভারতবর্ষের সঙ্গে স্থলপথে যে সকল অংশ সংযুক্ত তাহার মধ্যে একমাত্র শ্যামের দক্ষিণে প্রলম্বিত মালয় উপদ্বীপ ছাড়া আর কোথাও ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এ সকল অঞ্চলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বর্তমানে শুধু ইন্দোচীনের একটি ধ্বংসপ্রায় উপজাতির মধ্যে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু প্রচলিত থাকিলেও ব্রহ্ম হইতে দক্ষিণ-চীন সাগরের উপকূলবর্তী আনাম ও তাহার উত্তরে টংকিং পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে। ইন্দোনেশিয়াতে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র ক্ষুদ্র বালী দ্বীপে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু প্রচলন থাকিলেও সমগ্র ইন্দোনেশিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলের স্থাপত্য-শিল্পের বিস্ময়কর উন্নতির সাক্ষ্য বহন করিয়া বহু মন্দির চারি দিকে ছড়াইয়া আছে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম কেন এই ভাবে বিপর্যস্ত হইল, কেন ইসলামধর্ম বাধা পাইল না, তাহা এ পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই বা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

দ্বিতীয় যে জিনিষটি চোখে পড়ে তাহার কথা বলা হইতেছে। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতবর্ষীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দলে দলে ভারতবাসী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা পুষ্ট করিয়াছিলেন; আপনাদের ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র, ভাষা, সাহিত্য, আচার-অনুষ্ঠান এই সকল উপনিবেশে প্রচার করিয়াছিলেন; বিস্তীর্ণ শক্তিশালী রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সকল সাম্রাজ্য অনেক দিন লুপ্ত হইলেও ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের প্রচারিত ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, আচার-অনুষ্ঠানের অজস্র পরিচয় ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় এখনও

রহিয়াছে, নাই শুধু ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান অধিবাসীদের চেহারায় ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের কোন ছাপ। কোন এক সময়ে, অনুমান করা যায় হিন্দু আমলের শেষের দিকে, ভারতবর্ষ হইতে নূতন জনপ্রবাহ গিয়া ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা বন্ধ হইয়াছিল। স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন ভারতীয়গণ আপনাদের রক্তের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, অন্য রক্তের মিশ্রণে ভারতীয় রক্তের চিহ্ন প্রায় মুছিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় যে জিনিষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে সাদৃশ্য।

এই রাজনৈতিক ইতিহাস নাটকের মত রোমাঞ্চকর। নাটক আরম্ভ হইল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রাচ্য বাণিজ্যের দখল লইয়া।

প্রাচীন যুগে যেমন কার্থেজ, মধ্যযুগে সেইরূপ ভেনিস ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল, প্রাচ্যের, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের শিল্পসম্ভার পশ্চিম জগতে বণ্টন করিবার অধিকার হস্তগত করিয়া। কার্থেজের যে সমৃদ্ধি রোমের ঈর্ষা জাগাইয়া পিউনিক যুদ্ধের সূত্রপাত করে তাহার মূলে ছিল প্রাচ্য বাণিজ্য। ক্ষুদ্র শহর যে ভেনিসের খ্যাতি এখন রূপকথার মত শুনায় তাহার উন্নতির মূলে ছিল এই প্রাচ্য বাণিজ্য।

য়ুরোপ ও মিশরে তুর্ক জাতির অভ্যুদয় হইলে ভেনিসের বাণিজ্যপোত-বাহিনীর প্রাচ্য সমুদ্রে আসিবার পথ রুদ্ধ হইল। রূপকথার ঐশ্বর্যের খনি প্রাচ্য বাণিজ্য ভেনিসের হস্তচ্যুত হইল। ভেনিসের সমৃদ্ধির মূলে শেষ আঘাত হানিল পর্তুগীজ জাতি উত্তমাশা অন্তরীপের পথ আবিষ্কার করিয়া।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট দুইখানি পর্তুগীজ জাহাজ আসিয়া কালিকটের কাছে ক্যানানোরে নোঙর ফেলিল। এই জাহাজ দুইখানার নায়ক ছিলেন ভাস্কো-ডা-গামা। প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য পর্তুগালের রাজা ডন ম্যানোয়েল এই জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য তখন আরব ব্যবসায়ীদের হাতে। আরব ব্যবসায়ীদের প্রাণপণ বিরোধিতা ও কালিকটের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বীর জামোরিণের আজীবন শত্রুতা সত্ত্বেও পর্তুগীজরা যে ভাবে পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে, সিংহলে, বঙ্গোপসাগরের দ্বীপগুলিতে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়া চলিল সে এক বিস্ময়কর কাহিনী।

ক্ষুদ্র দেশ পর্তুগালের লোকসংখ্যা তখন দশ লক্ষ মাত্র। এই ক্ষুদ্র দেশ ও ক্ষুদ্র জাতি নৌশক্তি ও ঐশ্বর্যে ১৬শ শতাব্দীতে য়ুরোপের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল প্রাচ্য বাণিজ্যের দৌলতে। ভাস্কো-ডা-গামা দেশে ফিরিলে সমগ্র য়ুরোপের প্রাচ্য বাণিজ্য-নীতির আমূল পরিবর্তন হইল। ক্ষুদ্র পর্তুগালের ক্ষুদ্র রাজার নূতন উপাধি হইল "Lord of the Conquest, Navigation and Commerce of Ethiopia Arabia, Persia and China."

তারপর স্পেন ও পর্তুগালের সম্মিলিত রাজ্যের রাজা হইলেন ২য় ফিলিপস। য়ুরোপে ফিলিপসের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ, ইংরাজ ও ডাচ জাতি তাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত। শক্তিশালী ডাচ রাষ্ট্র দীর্ঘকাল ফিলিপসের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া এই তথ্য আবিষ্কার করিল যে, ফিলিপসের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার পর্তুগালের প্রাচ্য বাণিজ্যে আঘাত না করিলে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। প্রাচ্য, বিশেষ করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য হইতে পর্তুগাল যে সম্পদ আহরণ করিত তাহার সবটুকু খরচ হইত ইংরাজ ও ডাচের সঙ্গে যুদ্ধে। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে কর্ণেলিস হুটম্যানের নায়কত্বে চারখানা ডাচ জাহাজ প্রাচ্য সমুদ্রে রওনা হইল।

একশত বৎসর প্রাচ্য বাণিজ্যে একাধিপত্য ভোগ করিবার পরে পর্তুগীজের হাত হইতে প্রাচ্য বাণিজ্য ছিনিয়া লইল ডাচ জাতি। ১৭শ শতাব্দীতে ডাচ নৌশক্তি পৃথিবীতে অজেয় হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের অধিকৃত রাজ্য ও বন্দর প্রায় সবগুলি তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা করমোসা, মলাক্কা, সিংহলের জাফানিপত্তন অধিকার করিল, উত্তমাশা অন্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করিল ও সমগ্র ইন্দোনেশিয়া কবলিত করিয়া বাটাভিয়া শহর প্রতিষ্ঠা করিল। তখন হইতে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ আধিপত্য আরম্ভ হইল।

ডাচ জাতির সফলতায় প্রলুব্ধ হইয়া ইহার পর ইংরাজ প্রাচ্য সমুদ্র পাড়ি দিল। বাণ্টাম, মোলাক্কাস, সুমাত্রা, শ্যাম, মাদ্রাজ ও মসুলিপত্তনে তাহারা এজেন্সী খুলিল। কয়েক বৎসর পরে সুরাটে এজেন্সী স্থাপিত হইল। তখনকার দিনে ইংরাজ ডাচ জাতির অনুগ্রহে ব্যবসায় চালাইত, তাহাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল ইন্দোনেশিয়ায়। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ায়

আম্বোয়ানায় কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড ঘটিল। ডাচরা যেখানে যে ইংরাজকে পাইল নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, মালয়, জাপান হইতে ব্যবসায় গুটাইয়া ইংরাজ ভারত অভিমুখে রওনা হইল। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচের হাতে মার খাইয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়া ইংরাজের বরাত খুলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ফরাসীরা প্রাচ্য সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়াছিল।

১৫শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পর্তুগীজ, ডাচ ইংরাজ ও ফরাসীর কামড়াকামড়ি চলিয়াছিল প্রাচ্যে বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারের জন্য। ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে ব্রহ্ম শ্যাম মালয়, সুমাত্রা, বোর্ণিও, জাভা, ইন্দোচীন, চীন, ফিলিপাইনস ও জাপান পর্যন্ত পূর্বে ও পশ্চিমে পারস্য, আরব, আফ্রিকা পর্যন্ত এই জাতিগুলির কলহ ও দস্যুবৃত্তির ক্ষেত্র হইয়াছিল। কলহ থামিলে দেখা গেল ভারতবর্ষে ইংরাজ, ইন্দোচীনে ফরাসী ও ইন্দোনেশিয়ায় ডাচরা সাম্রাজ্য ফাঁদিয়া বসিয়াছে।

ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া য়ুরোপের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যলোভী জাতিদিগের কবলিত হইবার পরে ব্রহ্ম তাহার স্বাধীনতা হারাইল, একমাত্র শ্যাম তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই নাটকের যেমন প্রথম অঙ্কে তেমনি শেষ অঙ্কেও বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। নির্বাপিত প্রতাপ ইংরাজ ও ডাচ জাতি একই সময়ে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, ইন্দোচীন ছাড়িতে হইয়াছে ফরাসী জাতিকে।

ব্রহ্ম

প্রথমে ব্রহ্মদেশের কথা বলা হইতেছে। দেশের ব্রহ্ম নাম ভারতবর্ষের প্রদত্ত। দেশের বর্মী নামা মিয়ানামা (উচ্চারণ বামা)। শান জাতি ব্রহ্মকে মন জাতির দেশ বলে। বর্মীজদিগের মণিপুরী নাম মায়ান।

কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ব্রহ্মের অধিবাসীদিগকে "দক্ষিণ মোঙ্গলয়েড" (Southern Mongoloid) গোষ্ঠীভুক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের জাতি-সংমিশ্রণের পরিচয় দিবার কার্যে যে সকল বিদেশী পণ্ডিত প্রথম দিকে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক অভিনব পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। জাতিলক্ষণসমূহের ভিত্তির পরিবর্তে ভাষার ভিত্তিতে তাঁহারা এ দেশের

অধিবাসিগণকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যেরূপ করা হইয়াছে ব্রহ্মদেশে সেইরূপ ভাষার ভিত্তিতে অধিবাসীদিগের নৃতাত্ত্বিক শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। ফলে সঠিক জাতিসংমিশ্রণ নির্ণয়ের ব্যাপারে এখানেও অস্পষ্টতা দেখা দিয়াছে। সে যাহা হউক, ব্রহ্মের অধিবাসীদিগের মন খ্মের, শান বা তাই, ইন্দো-চাইনীজ ও তিব্বত-বর্মী ইত্যাদি গোষ্ঠীভুক্ত বলা হইয়াছে। এই কয়েকটি গোষ্ঠীভুক্ত জাতির অল্পাধিক অংশ ব্রহ্মের সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের (আসাম) মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইন্দো-চাইনীজ গোষ্ঠীভুক্ত কোন কোন উপজাতি ব্রহ্ম ও মালয়ের মধ্য দিয়া ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। আসামে এই গোষ্ঠীর যে সকল উপজাতি প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে মিরি, বোদো, নাগা প্রভৃতির নাম করা যায়। এই গোষ্ঠীর একটি শাখাকে লুশাই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে ও পশ্চিমে, আরাকানে ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়।

ব্রহ্মের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতিদিগের বিস্তারিত পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই এবং তাহার স্থানও এখানে নাই। ব্রহ্মের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ যাহা বলিতে চাহেন তাহা মোটামুটি বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয় না। ব্রহ্মে জনপ্রবাহের চাপ আসিয়াছে থাইল্যাণ্ড হইতে, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ও তিব্বতের সংলগ্ন অঞ্চল হইতে। পণ্ডিতগণের মতে মালয় ও ইন্দোনেশিয়া হইতে অল্পাধিক অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে আরাকান ইয়োমা অঞ্চলে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ব্রহ্ম হইতে এই মিশ্র জনপ্রবাহের চাপ ভারতবর্ষের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, কিন্তু স্থলপথে সংযোগ থাকিলেও ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মাভিমুখী পাল্টা জনপ্রবাহের চাপের কথা বলা হয় নাই। অথচ এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে, ইন্দোচীন বা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আদান প্রদান ঘটিবার পূর্বে নিকটতম প্রতিবেশী ব্রহ্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তিব্বতের প্রাচীন কিম্বদন্তী মতে কোশলের এক রাজপুত্র তিব্বতের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রহ্মের প্রাচীন কিম্বদন্তী মতে কাশীর এক রাজপুত্র ব্রহ্মের প্রথম রাজা। নিম্ন-ব্রহ্মে (প্রোম) ও আরাকানে ভারতীয় রাজবংশ বহু কাল ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং একটি অনুমান করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, প্রাচীন

কালে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মে গিয়া যাঁহারা ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা স্থানীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে মিশিয়া গিযাছেন।

ব্রহ্মে আগত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মন ক্ষ্মেব বা মন-আনাম গোষ্ঠী প্রথমে আসিয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই কথা বলেন। শান রাজ্যগুলির পালৌং রিয়েং, ওয়া প্রভৃতি উপজাতি এবং পেগু অঞ্চলের মন বা তলৈং উপজাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। পেগুর এই মন জাতি একদা সমগ্র ব্রহ্মে আপনাদিগের শাসন (পাগান সাম্রাজ্য) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বর্মীজ জাতিব সহিত বহুদিন সংগ্রামেব পরে অবশেষে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মন জাতির আধিপত্য নষ্ট হইয়াছিল। এই মন বা মন ক্ষ্মেব জাতি ও তাহাদিগের ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ অনেক কথা বলিয়াছেন, এখানে সে সকলের উল্লেখ করিবার স্থান নাই। আসামের খাশীদিগেব ভাষার সহিত মন ক্ষ্মের ভাষার সম্পর্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর, অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিবাসী-দিগের এক বৃহৎ অংশের ভাষার সঙ্গে মন ক্ষ্মের ভাষার সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন।

নিম্ন-ব্রহ্মের এই মন ক্ষ্মের বা তলৈং বা পেগুজাতির সম্বন্ধে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মন জাতির তলৈং নাম দিয়াছিলেন পরবর্তী কালের বর্মীজ জাতির বিজেতারা। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন, এই তলৈং নাম তেলিঙ্গ বা তেলেগু নামের রূপান্তর এবং মন জাতির মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের তেলেগু বা অন্ধ্র জাতির ঔপনিবেশিকগণের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল বলিয়া জাতির তলৈং নাম দেওয়া হইয়াছিল।

ইহার পরের গোষ্ঠীর শ্যাম-চাইনীজ, শান বা তাই গোষ্ঠী নাম দেওয়া হইয়াছে। স্যালউইন ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের পূর্বাংশে এবং ব্রহ্মের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতিগুলি বাস করে। শান জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের (সেচুয়ান) পার্বত্য অঞ্চল হইতে অনুমান খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে শানতাই জাতির প্রবাহ দক্ষিণ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। উত্তর-পূর্ব ব্রহ্মের শানজাতি, শ্যামের থাই জাতি, নিম্ন ব্রহ্মের পূর্ব দিকের লাও অঞ্চলের লাও জাতি, কেণ্টনের হুম (HKum) ও লু জাতি, টংকিংয়ের মং জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। আসাম বিজেতা আহোম জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। ব্রহ্মের কারেন জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত।

মধ্য ইরাবতী অঞ্চলের বর্মীজ, আরাকানী, লিসঅ, পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের চিন জাতি, উত্তর অঞ্চলের কাচিন প্রভৃতি উপজাতি তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠীভুক্ত। বর্মীজরা সমস্ত দেশের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে একটি উপজাতি মাত্র। রাজনৈতিক প্রাধান্ত লাভের ফলে সমগ্র দেশের নাম তাহাদের নামানুসারে হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক আমলে এই উপজাতি সেচুয়ান অঞ্চল হইতে ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল।

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের অধিবাসীদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যাহাদিগের মধ্যে দক্ষিণী মোঙ্গলয়েড লক্ষণ দেখা যায় না ও যাহাদিগের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়।

মেকং নদী হইতে আনামের উপকূল পর্যন্ত এবং য়ুনান হইতে কোচীন-চীনের বারিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যে সকল উপজাতির বাস, তাহারা (মায়া, পিউমং, খা, নং প্রভৃতি) মোঙ্গলয়েড লক্ষণ বর্জিত। চীনের সেচুয়ান ও য়ুনানের লোলো, মন-সে (Man-tse), মো-সো প্রভৃতি উপজাতিও এই লক্ষণ বর্জিত।

থাইল্যাণ্ডের বর্তমান অধিবাসীরা কতকটা মিশ্রজাতি, কিন্তু শান থাই সংমিশ্রণ প্রবল। দেশের শ্যাম নাম প্রাচীন শ্যামামী "সিয়েম" (চীনা, সিয়েন-লো) হইতে আসিয়াছে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হইতে থাই জাতির দক্ষিণ অঞ্চলে অবতরণের পূর্বে ইন্দোচীন উপদ্বীপের সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল কাম্বোডিয়া বা কাম্বোজের হিন্দু-রাজবংশের অধীন ছিল। পার্বত্য অঞ্চল হইতে আগত "বর্বর" শান থাই জাতির আক্রমণের ফলে কাম্বোডিয়ার হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায় খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই হিন্দু সাম্রাজ্য ৪০০ বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম চালাইয়াছিল। বর্তমান থাই জাতির মধ্যে পণ্ডিতগণের মতে কাম্বোডিয়ার প্রাচীন খ্মের, কুই, "হিন্দু" এবং মালয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কাম্বোডিয়ার প্রাচীন খ্মের জাতি ব্রহ্মের প্রাচীনতম অধিবাসী মন খ্মের জাতির সম্পর্কিত। কুই জাতির বাস দক্ষিণ-পূর্ব থাইল্যাণ্ড ও উত্তর-পূর্ব কাম্বোডিয়ায়। মালয় সংমিশ্রণ আসিয়াছে থাইল্যাণ্ডের অধীন মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশের মালয়ী অধিবাসী হইতে।

থাইদিগের মধ্যে যে "হিন্দু" সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কাম্বোজের ও আনামী উপকূলের চম্পা রাজ্যের হিন্দু ঔপনিবেশিকদের কথা মনে রাখিয়া বলা হইয়াছে। এখানে "হিন্দু" কথার অর্থ ভারতবর্ষীয়। সিংকিয়াংয়ের সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি ও মোঙ্গল, তুর্ক প্রভৃতি গোষ্ঠীর অধিকৃত অঞ্চল অতিক্রম করিয়া মহাচীনে প্রবেশ করিবার দ্বারপ্রান্তে টেন-হুয়াংয়ের বৌদ্ধ-মন্দিরে ভারতীয় মুখাকৃতিবিশিষ্ট চৈনিক ভিক্ষুকে দেখিয়া স্যর অরেল ষ্টাইন বিস্মিত হইয়াছিলেন। থাইল্যাণ্ডে হঠাৎ-দৃষ্ট দুই-একটি ভারতীয় মুখাকৃতি হয়ত অনুসন্ধিৎসু বিদেশী পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরও অনুসন্ধান করিয়া তিনি হয়ত জানিতে পারেন, থাইল্যাণ্ডের রাজগোষ্ঠী ও অভিজাত গোষ্ঠীয়দিগের নাম, ধর্মীয় ও সামাজিক বহু আচার-অনুষ্ঠান, দেবার্চনার মন্ত্র ও ভাষা ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগের স্মৃতি বহন করিতেছে। থাইল্যাণ্ডে এই ভারতীয় প্রভাব আসিয়াছে প্রধানতঃ কাম্বোডিয়া হইতে।

ইন্দোচীনের লাওস (লুয়াং প্রবাং), আনাম, কাম্বোডিয়া, টংকিং ও কোচীন-চীন এই কয়েকটি রাজ্য বা অঞ্চলের মধ্যে টংকিং, আনামের উপকূল অঞ্চল ও কোচীন-চীনে আনামী জাতির বাস। আনামীদিগের মধ্যে চীন ও তিব্বতী গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ প্রবল। দক্ষিণ-আনাম, কোচীন-চীনের বারিয়া ও কাম্বোডিয়ায় চিয়াম জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়; ডাঃ হেডনের মতে ইহাদিগের নাসিকা প্রায় তীক্ষ্ণ, চোখের পাতার উপরে চামড়ায় ভাঁজ নাই, চুল কুঞ্চিত বা ঢেউ খেলানো ও গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই চিয়াম জাতি চম্পার হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের বংশধর। বর্তমানে অবহেলা ও আনামীদিগের অত্যাচারের ফলে ইহারা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ও ইহাদিগের সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। চিয়াম ছাড়া এই অঞ্চলে মালয়গোষ্ঠীর জাতিকেও দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, খ্মের জাতি কাম্বোজে প্রবেশ করিবার আগে হইতে চিয়াম জাতি সেখানে বাস করিত, অর্থাৎ তাহারা কাম্বোজের আদিবাসী। কাম্বোজের অধিবাসিগণের মধ্যে খ্মের ও মালয় ছাড়া কুই ও "হিন্দু" প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। মোঙ্গলয়েড লক্ষণ বর্জিত মানুষ এ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

লাওস বা লুয়াং প্রবাংয়ের অধিবাসীরা শান থাই গোষ্ঠীভুক্ত। প্রাচীন কালে এই শান থাই জাতির সম্প্রদায়ের শক্তি ও বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র (ইন্দোচীন

হইতে আসাম) দৃষ্টে এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"The Thai race came very near being the dominant power in the Further East." (থাই জাতি ইন্দোচীন হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল)।

মালয়

মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশের অধিবাসিগণের মধ্যে সংমিশ্রণ প্রবল। মধ্য মালয়ের অরণ্যময় অঞ্চলে মালয়ের আদিবাসী নেগ্রিটো গোষ্ঠীভুক্ত সেমাংদিগের বাস। নেগ্রিটো গোষ্ঠীর সেমাং ছাড়া ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত শকাই ও জাকুনদিগকেও এই অঞ্চলে দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতে শকাইদিগের সঙ্গে ভারত-বর্ষের আদিবাসীদিগের সাদৃশ্য বর্তমান। তাঁহারা উভয়কে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীভুক্ত বলেন। এই গোষ্ঠীর প্রি-ড্রাবিডিয়ান, পালী-মেডিটারেনীয়ান (Pre-Dravidian, Palao-Mediterranean) প্রভৃতি নামকরণ করা হইয়াছে। যাহাদিগকে প্রকৃত মালয় গোষ্ঠীভুক্ত (Orang Malayan) বলা হয়, তাহাদিগের উৎপত্তি সুমাত্রার মেনাং কাবু অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র উপজাতি হইতে হইয়াছে অনুমান করা হয়, দক্ষিণী মোঙ্গলয়েড ও আদিবাসীর সংমিশ্রণে এবং অন্য কোন মোঙ্গলয়েড লক্ষণ বর্জিত গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে মালয় গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছিল। এই শেষোক্ত গোষ্ঠীটি যে ভারতবর্ষীয়, কেহ কেহ এ কথা বলিয়াছেন। দ্বাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে এই উপজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠে ও চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ইহারা সামান্য পরিমাণে মোঙ্গলয়েড লক্ষণাক্রান্ত, গাত্রবর্ণ বাদামী বা উজ্জ্বল শ্যাম। মালয়ের প্রসিদ্ধ সিঙ্গাপুর বন্দর মেনাং কাবুর মালয়ী ঔপনিবেশিকগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইন্দোনেশিয়া

সুমাত্রা, বোর্ণিও, টিমোর, সেলিবিস প্রভৃতি অঞ্চলে নেগ্রিটো, মেলানি-শিয়ান ও পলিনেশিয়ান বা অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে সকল উপজাতি বাস করে, তাহাদিগকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণের প্রথম স্তর নেসিয়ট (Nesiot) গোষ্ঠী।

এই গোষ্ঠী লম্বামুণ্ড, সামান্য পরিমাণে মোঙ্গলয়েড লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু ডাঃ হেডনের মতে, "It is difficult to isolate this type as it has almost everywhere been mixed with a brachycephalic xanthodermic stock." অর্থাৎ যেখানে এই গোষ্ঠীর উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় সেখানেই দেখা যায় যে, একটি গোলমুণ্ড পীত গোষ্ঠীর সঙ্গে ইহার গভীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই brachycephalic xanthodermic stock বা গোলমুণ্ড পীত গোষ্ঠীকেই সাউদার্ণ বা দক্ষিণী মোঙ্গলয়েড নাম দেওয়া হইয়াছে। এই গোষ্ঠীকে Oceanic Mongols বা প্রোটো-মালয় নাম দিয়াছেন কেহ কেহ। সুমাত্রার ওরাং মালয় খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে ইন্দো-নেশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। এই মালয় গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণের একটি প্রধান স্তর। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে চীন জাতি ইন্দোনেশিয়ায় অনুপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ সুমাত্রা ও জাভায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজনৈতিক প্রভাব ও ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

দলে দলে ভারতবর্ষ হইতে ঔপনিবেশিকগণ পূর্ব-সমুদ্রে যে "দ্বীপময় ভারত" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেখানে যে সকল পরাক্রান্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি প্রচারের যে সকল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন, তাহাদের খ্যাতি সমগ্র প্রাচ্যজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় পনের শত বৎসর পরে ভারতীয় কীর্তির এই বিস্ময়কর সৌধ জরাজীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। যবদ্বীপের একদা পরাক্রান্ত মাজাপাহিত (Madjapahit) সাম্রাজ্যের পতন দ্বীপময় ভারতে ভারতীয়গণের রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান ঘোষণা করিল।

ভারতীয়গণের রাজনৈতিক প্রভাব অবসানের উপলক্ষ্য ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের অভিযান। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই অভিযান আরম্ভ হয়। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে আরব ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে এই অঞ্চলে যাতায়াত করিত, পরবর্তী কালে এই ব্যবসায়ীরা ধর্মপ্রচারকরূপে দেখা দিল। পণ্ডিতগণের মতে ইসলামধর্ম প্রচারের ফলে ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে নূতন কোন জাতি সংমিশ্রণ ঘটে নাই। এখানে স্মরণ

করা যাইতে পারে যে, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয়গণের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সংগঠন ভাঙ্গিয়া পড়িবার আগে ভারতবর্ষে ইসলামধর্মী তুর্ক-আফগান-দিগের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী ?

ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্নের উল্লেখ করা আবশ্যক।

ইন্দোচীনের কাম্বোজ ও চম্পায় এবং ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় (পালেম বাং) ও যবদ্বীপে যাঁহারা পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যাঁহারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, যাঁহারা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী দেশে ভারতীয় প্রতিভার বর্তিকা সহস্রাধিক বৎসর পর্যন্ত জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী ? মাতৃভূমিকে স্মরণ করিয়া আপনাদিগের উপনিবেশগুলিকে যাঁহারা কাম্বোজ, তক্ষশিলা, গান্ধার, অযোধ্যা, হস্তিনানগর, মাদুরা, শ্রীবিজয় প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন তাঁহারা বাস্তবিক ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের লোক ? এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ নানা প্রকার থিওরীর অবতারণা করিয়াছেন। এই সকল থিওরীর আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই, সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলা হইতেছে।

যবদ্বীপের প্রাচীন কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে গুজরাত ও সিন্ধু দেশের নৌবাহিনী-সমূহ ঔপনিবেশিকগণকে বহন করিয়া যবদ্বীপ ও কাম্বোজে লইয়া গিয়াছিল। মালয়ের শক ক্ষত্রপদিগের প্রেরণা ও উদ্যোগের কথাও এই প্রসঙ্গে উঠিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, যবদ্বীপের হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ যে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী, গাঙ্গেয় উপত্যকার লোক নহেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুমাত্রার হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূল অঞ্চলের লোক, এইরূপ মত অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বাংলা, ওড়িষ্যা ও মাদ্রাজের উপকূলের অধিবাসীরা অ-

সুমাত্রা নহে, যবদ্বীপ ও কম্বুজেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ডের মতে যবদ্বীপের হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে বহুসংখ্যক কলিঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। কেহ বলিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে হিন্দু ঔপনিবেশিকদল কম্বুজ বা কাম্বোডিয়ায় যাত্রা করেন, তাঁহারা বাংলার তমলুক বন্দর হইতে যাত্রা করেন। খ্রীষ্টীয় ৫ম হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে সিন্ধু দেশ ও গুজরাতের উপকূল হইতে এবং ওড়িষ্যা ও মসুলিপত্তন হইতে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দল যাত্রা করেন। নানা প্রকার প্রমাণের উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সকল হিন্দু ঔপনিবেশিক দলের মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার ও কাবুল উপত্যকার অধিবাসী ছিলেন। এক দল পাণ্ডতের মতে ঔপনিবেশিক-গণের মধ্যে, বিশেষতঃ কাম্বোডিয়ার হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে, বহুসংখ্যক শক, শ্বেত হুণ ও কিদারাইট (য়িয়ুচী) ছিল।

উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিস্তার

ইংরাজ আমলে এক দল শিক্ষিত লোক সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন এবং আপনাদের বিশ্বাসমত প্রচার করিতেন যে, তিন দিকে সাগর ও উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত ভারতবর্ষ বহির্জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ-বর্জিত থাকিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। অর্থাৎ, সমুদ্র ও পর্বতের পরিখা ও প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গের মত দেশ ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্জগতের বিশেষ কোন আদান প্রদান ছিল না, ইহাই তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য। ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিবার পরে এক দল শিক্ষিত ভারতবাসী প্রচার করিতেছেন, স্বভাবজ শান্তিপ্রিয়তা ব্যাহত করিয়া ভারতবাসীরা কখনও রাজ্যবিস্তার করিবার জন্য দেশের বাহিরে যান নাই, সুতরাং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এই শান্তিপ্রিয়তার অনুশীলনেই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য রক্ষা হইবে, তাহার মঙ্গল হইবে।

কিন্তু যে চিত্রের আবরণ এখানে উন্মোচন করা হইতেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের তাহা এক বিস্ময়কর চিত্র। বিস্ময়কর তাঁহাদের কাছে, যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যার ট্র্যাডিশনে মানুষ হইয়াছেন এবং এই ব্যাখ্যা বজায় রাখিতে চাহেন। এই চিত্র তাঁহাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে মোহমুক্ত ও স্বাভাবিক হইতে সাহায্য করিবে কি না বলিতে পারি না।

ভারতবাসীরা এক সময়ে উপনিবেশ বিস্তার করিতে মন দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেব কথা সেটা। তখন পশ্চিম-এশিয়ায় ইরাণের আরসিকিডান (পার্থিয়ান) বংশের সম্রাটগণের সঙ্গে রোমেব নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে। য়ুরোপের এশিয়া বিজয়ের অভিযানের প্রথম নায়ক গ্রীস, দ্বিতীয় নায়ক রোম। দীর্ঘ বারো শত বৎসর কাল য়ুরোপকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল এই ইরাণ। চীনে তখন চীনের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন হান বংশের পতনের পরে পূর্ব হান বংশ নাম লইয়া নূতন এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধধর্ম মহাচীনে প্রচাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে তখন তুষার বা তুখার শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোকের মগধ তখন দক্ষিণ হইতে আগত অন্ধ্র রাজবংশেব অধীন। উজ্জয়িনীতে তখন শক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্র ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ তখন অন্য একটি শক রাজবংশের অধিকারে। অন্ধ্র সম্রাট গোতমীপুত্র শ্রীশতকর্ণি এই শকরাজ্য ধ্বংস করিলেন। ঐতিহাসিকগণেব মতে অন্ধ্র সম্রাটের এই বিজয়-লাভের ফলে দেশে "হিন্দু রিভাইভ্যাল" ঘটিয়াছিল। পরবর্তী কালে মধ্য-ভারতেব শকরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তখন আবার একটা "হিন্দু রিভাইভ্যাল" ঘটিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেই অবস্থা রাজশক্তিব প্রেরণায় ও সাহায্যে সুসজ্জিত অর্ণবপোত বাহিনীর দেশ বিজয়ে যাত্রা করিবার অনুকূল ছিল মনে করা কঠিন। এইরূপ কল্পনা কার্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত সময় একবার আসিয়াছিল মৌর্য যুগে এবং কয়েক শতাব্দী পরে আবার আসিয়াছিল গুপ্ত যুগে। সুতরাং অনুমান করিতে হয় যে, অন্যান্য দেশে উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে যেমন ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ সাহসী, উদ্যমশীল ও নেতৃত্ব শক্তির অধিকারী সাধারণ নাগরিকগণ এই কার্যের ভার লইয়াছিলেন, ভারতবর্ষেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও যে এই শ্রেণীর নাগরিকেরা রাজশক্তির সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন নাই তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় অন্ধ্র সম্রাট গোতমীপুত্র যজ্ঞশ্রীর কতকগুলি মুদ্রা হইতে। এই সকল মুদ্রা অর্ণবপোতের চিত্র বহন করিতেছে।

যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবাসীদের উপনিবেশ বিস্তারের সময় খ্রীষ্টীয়

প্রথম শতক বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, আমরা জানিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ ইন্দোচীনের কম্বুজে বা কাম্বোডিয়ায় পৌঁছিয়াছিলেন। মালাক্কা উপদ্বীপ ও সুমাত্রার হিন্দু উপনিবেশগুলি ঐ সময়ের পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল অনুমান করা যায়, কারণ, যবদ্বীপ ও ইন্দোচীনে যাইতে এই স্থানগুলি আগে পাওয়া যায়। মালাক্কার একটি অনুশাসনে বুদ্ধগুপ্ত নামে একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মহানাবিকের কথা জানিতে পারা যায়। তিনি "রক্তমৃত্তিকা"র অধিবাসী ছিলেন, অনুশাসনে উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই রক্তমৃত্তিকা বাংলার রাঙ্গামাটি। অনুশাসনের কাল খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক। মালাক্কার হিন্দুরাজ্যগুলির মধ্যে কতকগুলির নাম পাওয়া যায় চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের বিজিত রাজ্যের তালিকা হইতে। রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ী অর্ণবপোত বাহিনী ব্রহ্মের পেগু রাজ্য, মার্তাবান ও তক্কোলম বন্দর অধিকার করিয়া পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হইয়া মালাক্কা ও সুমাত্রার অনেকগুলি হিন্দুরাজ্য জয় করিয়াছিল। সিঙ্গাপুরে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর সংস্কৃত লেখন পাওয়া গিয়াছে।

কম্বুজ (কাম্বোডিয়া)ঃ—হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে মেকং নদী বাহিয়া কম্বুজে উপনীত হইয়াছিলেন। চৈনিক ইতিহাসের মত কৌণ্ডিন্য নামে একজন ব্রাহ্মণ ফু-নানে এই হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন কম্বুজ ফু-নান (উচ্চ স্থান) নামে পরিচিত ছিল। অনুমান খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, অর্থাৎ গুপ্তযুগে দ্বিতীয় দল হিন্দু ঔপনিবেশিক প্রকৃত কম্বুজ রাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্তী শতাব্দীতে কম্বুজের রাজা চিত্রসেন মহেন্দ্র বর্মণ ফু-নান রাজ্য জয় করেন। ইঁহার শাসনকালের (৬০৪ খ্রীঃ অঃ) সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই হিন্দু রাজবংশের জয়বর্মণ, যশোবর্মণ, সূর্যবর্মণ প্রভৃতি রাজার শাসন কালের বিবরণ পাওয়া যায়। যশোবর্মণের সময়ে (৮৮৯ খ্রীঃ অঃ) যশোধরপুরে নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। ইহার অন্য নাম এঙ্কোর-টোম। যশোধরপুরের নিকটে কাম্বোডিয়ার হিন্দু রাজত্বের সর্বপ্রধান কীর্তি এঙ্কোর-ভাট নির্মিত হইয়াছিল সূর্যবর্মণের সময়ে (১১১২-১১৫২ খ্রীঃ অঃ)। এঙ্কোর-ভাট বিষ্ণুমন্দির। মন্দিরের গাত্রে রামায়ণের, মহাভারতের ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী খোদিত আছে। এঙ্কোর-ভাট ছাড়া টা-প্রোম, প্র-খান ও বায়ন মন্দিরের বিরাট ধ্বংসাবশেষও উল্লেখযোগ্য। টা-প্রোমের

মন্দির সম্পর্কে রাজা জয়বর্মণের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, আঠারো জন প্রধান পুরোহিতের অধীনে ২৭৪০ জন সাধারণ পুরোহিত ও ২২৩২ জন সহকারী পুরোহিত মন্দিরের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং এক সময়ে যাট সত্তর হাজার লোক মন্দিরে পূজা দিতে আসিত। বায়ন মন্দিরের গাত্রে অপ্সরীদের নৃত্য, স্কন্দের অভিযান, সমুদ্র-মন্থন প্রভৃতি কাহিনী ক্ষোদিত হইয়াছে।

কাম্বোডিয়ার প্রথম হিন্দুরাজ্য ফু-নানের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের বিবরণ চৈনিক ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। ফু-নানের ভারতীয় সন্ন্যাসী নাগসেন ও মন্দ্রসেন সঙ্ঘভর চীনে গমন করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হিন্দুরাজ্যের রাজারা শৈব ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী হিন্দু হইলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কাম্বোডিয়ার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি প্রধানতঃ হিন্দুধর্মের পরিচয় বহন করে।

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত কাম্বোডিয়ার হিন্দু সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগ। থাই জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে এই বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। বিজেতারা হিন্দু শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করিবার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। হস্তী ব্যবহার করিয়া তাহারা রাজপুরী ও মন্দিরের প্রাকার ও স্তম্ভসমূহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কাম্বোডিয়ার প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একমাত্র এঙ্কোর-ভাট অক্ষত দেহে দাঁড়াইয়া আছে। প্রকৃত পক্ষে এই বিরাট, বিস্ময়কর মন্দিরে নির্মাণকার্য শেষ হইবার পূর্বেই কাম্বোডিয়ার হিন্দু সাম্রাজ্যের পতন হয়।

চম্পা ঃ—খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে ইন্দোচীনের আনাম উপকূলে হিন্দু উপনিবেশ চম্পা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্ভবতঃ প্রথম ঔপনিবেশিক দল যবদ্বীপ হইতে আসিয়া আনামের উপকূলে অবতরণ করিয়া-ছিলেন। ক্রমে এই উপনিবেশ সমগ্র আনাম ও কোচীন-চীন লইয়া শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। সাম্রাজ্য চারিটি বিষয় বা বিভাগে বিভক্ত ছিল ঃ অমরাবতী, বিজয়, কৌঠার ও পাণ্ডুরঙ্গ। অমরাবতীর রাজধানী ছিল ইন্দ্রপুরী। বিজয়ের প্রধান বন্দর ছিল শ্রীবিনয়; কৌঠারের রাজধানী ছিল বর্তমান না-ত্রাংয়ের (Nha-trang) নিকটে; পাণ্ডুরঙ্গ (বর্তমান ফান্-রাং) বহু দিন সমগ্র চম্পার রাজধানী ছিল।

চৈনিক ইতিহাসের মতে খ্রীষ্টীয় ১৯২ অব্দে চম্পা রাজ্যের (লি-ই) পত্তন হয়। চম্পার রাজা শ্রীমারের যে সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা এই সময়ের, কিন্তু অনুমান করা হয় ইহার এক শতাব্দী পূর্বে হিন্দুরা কৌঠারে প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও দেশীয় চ্যাম ভাষায় লিখিত অনুশাসনসমূহ ও চৈনিক ইতিহাস হইতে চম্পা সাম্রাজ্যের ১২০০ বৎসরের মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যায়।

হিন্দু ঔপনিবেশিকদের প্রদত্ত দেশের চম্পা নাম হইতে দেশবাসীরা চ্যাম নামে পরিচিত হইয়াছে। ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, আচার, অনুষ্ঠান তাহারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের শৈব মত চম্পার ঔপনিবেশিক ও দেশীয়গণের মধ্যে প্রচারিত ছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে চম্পা কাম্বোডিয়ার মত ঐশ্বর্যশালী হইতে পারে নাই, কিন্তু অমরাবতী ও বিজয়ের মন্দিরগুলি ছাড়া চম্পার মন্দির ও অন্যান্য শিল্প-নিদর্শনসমূহ কাম্বোডিয়ার মন্দির প্রভৃতির মত একেবারে ধ্বংস হয় নাই। মন্দিরগুলির অধিকাংশ শৈব মন্দির।

কৌঠারের অন্তর্গত পো-নগরের শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন রাজা বিচিত্রসাগর। রাজা সত্যবর্মণের সময়ে (খ্রীঃ অঃ ৭৭৪) মালয়ীরা সমুদ্রপথে এই মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল। পাণ্ডুরঙ্গের শ্রীলিঙ্গরাজ (পো-ক্লাংগ-রাই) মন্দিরে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বহু সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। রাজা হরিবর্মণের (খ্রীঃ অঃ ৮০৩—৮১৭) রাজত্বকালে অর্থপুরাণ শাস্ত্র নামে সংস্কৃতে রচিত ঐতিহাসিক আখ্যান গ্রন্থে চম্পায় প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহ আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। হরিবর্মণ পো-নগরে শৈব মন্দির ছাড়া ভগবতী কৌঠার দেবীর ও শ্রীবিনায়কের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। চম্পায় বৌদ্ধধর্মও প্রচারিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনার ইহা একটি বড় কেন্দ্র ছিল। রাজা শম্ভুবর্মণের সময়ে একজন চীন সেনাপতি চম্পা হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে লইয়া যান। চম্পার গঙ্গারাজ নামে এক জন রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া বাকী জীবন গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, একটি অনুশাসন হইতে জানিতে পারা যায়। খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকে গৌড়ের এক রাজকন্যা চম্পার রাজ্ঞী হইয়াছিলেন।

চম্পায় আনামীদের আক্রমণ আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী হইতে। অমরাবতী ও বিজয় হইতে সরিয়া আসিয়া চম্পার অধিপতিগণ পাণ্ডুরঙ্গ ও

কোঠারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে আনামীদের পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে প্রাচীন চম্পা রাজ্যের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। বর্তমানে চম্পার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে, চম্পার নাম হইয়াছে আনাম। চম্পার নাম লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু চম্পার হিন্দু-সংস্কৃতির মূল কত গভীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহার অতি করুণ পরিচয় বহন করিতেছে আনামের এখনকার ছত্রভঙ্গ, দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দু চ্যামগণ। এখনও তাহারা মুদ্রা সাধন করিয়া বিকৃত সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শঙ্খ, ঘণ্টা, তাম্রপাত্র ব্যবহার করিয়া প্রাচীন কালের জীর্ণ মন্দিরে শিবলিঙ্গের পূজা করে, এখনও তাহারা সূর্যকে বলে আদিৎ (আদিত্য), নগরকে বলে নোকর, মন্দিরকে বলে সোধির।

থাইল্যাণ্ড :—এক দিকে ইন্দোচীনের কম্বুজ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ও অন্য দিকে সুমাত্রার শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের বৃহৎ এক অংশ গ্রাস করিয়া খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকের মধ্যভাগে থাই রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। থাই জাতি উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হইতে দক্ষিণে অবতরণ করিবার পূর্বে সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইন্দোচীন কম্বুজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর সমগ্র উত্তর মালয় উপদ্বীপ ছিল শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

থাই জাতি কম্বুজের অধীন ছিল। প্রাচীন কিম্বদন্তী মতে থাই রাজা ফ্রা রুয়াং এই অধীনতা পাশ ছিন্ন করেন। ইহার পরে থাইরা কম্বুজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করে। কম্বুজের পতনের পরে প্রসিদ্ধ থাই রাজা ফ্রা উথোং (পরবর্তী কালে ইনি ফ্রা রাম থিবোডি নামে পরিচিত হন) কামফংপেট পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় (Ayuthia) রাজধানী স্থাপন করেন। ব্রহ্মের মৌলমীন, ট্যাভয়, টেনাসেরিম ও সমগ্র মালাক্কা উপদ্বীপে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্মী আক্রমণে অযোধ্যা ধ্বংস হইবার পরে ব্যাংককে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

থাইরা কম্বুজের হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, আনামীরা করিয়াছিল চম্পার হিন্দু সাম্রাজ্য ; কিন্তু এই দুই জাতিই ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি, সাহিত্য, ভাষার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হইয়াছিল। আনামীদের মধ্যে এই প্রভাবের পরিচয় পাইতে হইলে এখন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়, কিন্তু থাইদের মধ্যে এই প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ। প্রকৃত প্রস্তাবে কাম্বোডিয়ার ভারতীয় সভ্যতা থাইল্যাণ্ডে বাঁচিয়া আছে। ড্যাংরেক পর্বতশ্রেণী ও মৌন

নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলের বিস্তীর্ণ, বিরাট ভগ্নস্তূপসমূহ কম্বুজের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এক জন প্রাচীন ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ভারতীয় পর্যটক থাইল্যাণ্ডের মন্দিরগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের মন্দিরের সাদৃশ্য দেখিয়া, রামায়ণ থাইল্যাণ্ডের জাতীয় মহাকাব্য (রাককিয়েন) এই কথা জানিয়া এবং যে কোন পালি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের থাই ভাষা বুঝিতে অসুবিধা হয় না শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ব্যাংককের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইবার পরে তাঁহার মনে হইয়াছিল ভারতবর্ষের একটি অংশ যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া বাতাসে ভাসিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অংশে আসিয়া পড়িয়াছে।

থাইল্যাণ্ডের দ্বারাবতীর স্থাপত্যে ভারতের গুপ্ত আমলের প্রভাবের কথা ও পরবর্তী কালের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে পাল, সেন, চন্দ্র ও বর্মণ আমলের প্রভাবের কথা কেহ কেহ বলিয়াছেন। আসাম-মণিপুর-ব্রহ্ম হইয়া থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন পর্যন্ত স্থলপথ মধ্যযুগে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন মতে পালযুগের বৌদ্ধ শিল্প এই পথে উত্তর থাইদেশে পৌঁছিয়াছিল।

শ্রীবিজয় ও যবদ্বীপ :—ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু উপনিবেশের মধ্যে সুমাত্রার শ্রীবিজয় ও যবদ্বীপের নাম সমধিক পরিচিত। সুমাত্রা ও জাভার হিন্দু উপনিবেশ ইন্দোচীনের হিন্দু উপনিবেশের মত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বা তাহার কিছু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একখানি চীনাগ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে, খ্রীঃ অঃ ২৭ হইতে ৫৭ সনের মধ্যে চীনের হান সম্রাট কুং-উটির সময়ে উ-ইন-তু (ইণ্ডিয়া) হইতে ঔপনিবেশিকগণ যবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

সুমাত্রা ও জাভায় প্রথমে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মণ যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের প্রথম দিকে ফা-হিয়েন সিংহল হইতে ক্যাণ্টনের পথে শ্রীবিজয় ও যবদ্বীপে অবতরণ করেন। তখন যবদ্বীপে তিনি হিন্দুধর্মের প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে ইৎ-সিংয়ের (খ্রীঃ অঃ ৬৭১-৮৭) বর্ণনায় শ্রীবিজয়ের সমৃদ্ধি ও সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন শ্রীবিজয় নগরে বৌদ্ধ পুরোহিতের সংখ্যা ছিল হাজারের উপর। মধ্যদেশ (ভারতবর্ষে) যে সকল শাস্ত্র আলোচনা হইত

ও যে সকল আচার অনুষ্ঠান পালন করা হইত শ্রীবিজয়েও তাহা হইত। ইৎ-সিং বলিতেছেন, জ্ঞানলাভের জন্য কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভারতবর্ষে যাইবার পূর্বে শ্রীবিজয়ে কয়েক বৎসর থাকিয়া সেখানে শাস্ত্রালোচনা করা উচিত। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতক পর্যন্ত শ্রীবিজয় বৌদ্ধধর্ম চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকে বাংলার বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) আচার্য চন্দ্রকীর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। নেপালের ১০ম-১১শ শতাব্দীর একখানি পুঁথিতে শ্রীবিজয়পুরের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। এই উল্লেখ হইতে শ্রীবিজয়ের খ্যাতি কত দূর প্রচারিত হইয়াছিল, জানিতে পারা যায়।

শৈলেন্দ্র সম্রাটদিগের আমলে শ্রীবিজয় সমৃদ্ধির শিখরে উঠিয়াছিল। পনেরটি সামন্ত রাজ্য শ্রীবিজয়ের অধীন ছিল। এই পনেরটির মধ্যে আটটি অবস্থিত ছিল মালয় উপদ্বীপে। মগধের সম্রাট দেবপাল দেবের (খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দী) নালন্দা অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র সম্রাটগণ পাল সম্রাটগণের মিত্র ছিলেন।

থাই জাতি খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকে মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশ দখল করিয়া লইল। এদিকে যবদ্বীপের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য শ্রীবিজয়ের পতন হইল, উহা যবদ্বীপের মাজপাহিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

বোর্ণিওতে হিন্দু-প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের রাজা মূলবর্মণের যূপলিপিতে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ হইতে।

যবদ্বীপের হিন্দু উপনিবেশ প্রধানতঃ মধ্য জাভায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুরাকর্তা, জোগজোকর্তা প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুপ্রভাবাধীন নগরগুলি মধ্য-জাভায় অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতক হইতে যবদ্বীপ প্রবল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মধ্য জাভার রাজাদের অনুশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষায় কবি লিপিতে লিখিত। এই লিপির সহিত দক্ষিণ-ভারতীয় লিপির সাদৃশ্য আছে। শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র রাজাদের অনুশাসনের লিপি পূর্ব-ভারতীয় লিপির সদৃশ। বেরোবুদুরের বিখ্যাত মন্দির ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত হয়। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার পরে হিন্দুধর্ম আবার প্রবল হয়। পেরাম্বানানের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি

এই সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। আটটি মন্দিরের মধ্যে চারিটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও নন্দীকে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরগুলির প্রাচীরে রামায়ণে বর্ণিত দৃশ্যাবলী ক্ষোদিত।

খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকে পূর্ব জাভায় এক হিন্দু রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। এই রাজবংশের উৎসাহে রামায়ণ ও মহাভারত স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষে শ্রীক্ষেত্র রাজা মাজপাহিত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে এই সাম্রাজ্য সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মত যবদ্বীপে প্রবল হয়। সম্রাট হিয়াম-উরুকের (খ্রীঃ অঃ ১৪ শতাব্দী) সভাকবি প্রপঞ্চের লিখিত "নাগর কৃতাম" হইতে জানিতে পারা যায়, সেই সময়ে প্রতি বৎসর বহু গৌড়ের অধিবাসী যবদ্বীপে আসিতেন।

খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে মাজপাহিত সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের সহিত ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা বলিতে গিয়া উপনিবেশ বিস্তার ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের কথা বলা হইয়াছে, বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা বাহুল্য বোধে বলা হয় নাই। সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ ও উপনিবেশ বিস্তার যদি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে আরম্ভ হইয়া থাকে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন অবশ্য তাহার পূর্বের ব্যাপার। ভারতের বাণিজ্য জাহাজে চড়িয়া প্রথম হিন্দু ঔপনিবেশিক দল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজে চড়িয়া ফা-হিয়েন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তার ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ সম্বন্ধে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। ভারতীয় ধর্ম ও ধর্ম-সাহিত্যের প্রচার হইয়াছে মোটামুটি পশ্চিম-এশিয়া বাদে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে। প্রাচীন যুগে পূর্ব মধ্যএশিয়ার কাশগড়, খোটান, কুচার, তুর্ফান প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজ্যে বহু সংখ্যক ভারতীয় ঔপনিবেশিক গিয়াছিলেন, ভারতীয় কৃষ্টি, ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক গভীর, অনেক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। যে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ভারতবর্ষের "জাতীয় ধর্ম" বলা হয় সেই ধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই ধর্মের ধ্বজাবাহিগণ কম্বুজ, চম্পা, সুমাত্রা, যবদ্বীপে যে সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সহস্র বৎসরের অধিক কাল সেই সকল উপনিবেশ আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল। ঔপনিবেশিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে যে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক দীক্ষা দান করিয়াছিলেন তাহা যে কত অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, থাইভূমিতে পদার্পণ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়, জাভা ইসলাম-কবলিত হইলে যে সকল জাভানীজ বলী দ্বীপে পলাইয়া যান তাঁহাদের বর্তমান পূজাপদ্ধতি, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ইন্দোনেশিয়া হইতে এই ভারতীয় প্রভাব ফিলিপাইনে প্রসারিত হইয়াছিল। স্প্যানীয়ার্ডগণ যখন ১৬শ শতাব্দীতে ফিলিপাইনে হানা দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষায় ও বর্ণমালায় সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিল জানা যায়।

ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, উপনিবেশ স্থাপনের এই প্রশান্ত মহাসাগরমুখী অভিযানে ভারতবর্ষ যেন তাহার মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল। ইহার ভিতরকার রহস্য জানিতে কৌতূহল হয়, কিন্তু এ প্রশ্ন কেহ আলোচনা করেন নাই। অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া এই প্রশ্নের একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

জাতি সম্পর্কের দিক দিয়া ভারতবাসীর সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার সম্পর্ক বেশী, মোঙ্গলয়েড লক্ষণাক্রান্ত জাতিগুলি বর্তমান কালে যেমন, প্রাচীন কালেও সেইরূপ ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের বাহিরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর না হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মোঙ্গলয়েড লক্ষণাক্রান্ত জাতিগুলির সহিত অন্তরঙ্গতা স্থাপনে ভারতবাসীরা সাগ্রহে অগ্রসর হইয়াছিল কেন? অনুমান করা যায় ইহার কারণ উত্তর দ্বার দিয়া ভারতীয় সাংস্কৃতিক অভিযান দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িলেও জনপ্রবাহের নির্গমন পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল মধ্য-এশিয়ায় চির অশান্ত জাতিসমূহের চাপে।

বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, পূর্বে মোঙ্গলিয়া ও চীনের কিয়াও চাং হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাস পর্বতমালা, উত্তরে তুর্কীস্তানের মরু অঞ্চল, বলখাস হ্রদ, আলতাই, তিয়েশান পর্বতশ্রেণী ও দক্ষিণে হিমালয়-আল্লস মেরুদণ্ড এই চতুঃসীমানার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল ঐতিহাসিক

যুগের প্রথম হইতে ভাইনীর কটাহের তৈলের মত টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, উত্তপ্ত তৈল উথলাইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং যেখানকার মাটি স্পর্শ করিতেছে তাহাই পুড়াইয়া দিতেছে। সোজা কথায়, উত্তর হইতে নূতন নূতন জাতি ক্রমাগত ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ কবিতেছিল, স্বভাবতই, দেশের অভ্যন্তরের জনস্রোত সেদিক দিয়া বাহিরে যাইবার পথ পায় নাই, সে চেষ্টাও বিশেষ করে নাই। তার পর দেখা যায় যে, খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক হইতে সমগ্র মধ্য-এশিয়াব্যাপী বিশাল হূণ সাম্রাজ্য উত্তরের নির্গমন পথ রোধ করিয়া অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকে হূণ সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন, পরাক্রান্ত তুর্ক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইল সিঞ্জিবুর নেতৃত্বে। তুর্ক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে না পড়িতে হইল ইসলামের উদয়। ইসলামের আক্রমণে ইরাণের গৌরবময় সাসানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার সংবাদ রটিলে উত্তর দিক হইতে চিরদিনের জন্ম মুখ ফিরাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন কি ভারত বাসীরা? মহারাজ হর্ষবর্ধনেব নিকট বিদায় লইয়া পরিব্রাজক হুয়েন-চ্যাং যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন (৬৪৫ খ্রীঃ অঃ) কাদিসীয়া ও নেহাভেন্দের যুদ্ধে ইরাণের সাসানীয় সাম্রাজ্য পর্যুদস্ত করিয়া বিজয়ী ইসলাম তখন হিন্দু রাজা শাসিত আফগানিস্তানের পশ্চিম প্রান্তে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইহার পববর্তী যুগগুলিতে ভারতবর্ষের অধিবাসীর বিদেশে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াস এ গ্রন্থের আলোচনার বিষয় নহে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

॥ ৬ ॥

ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি

ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের প্রধান থিওরীগুলির যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে তাঁহাদের মোটামুটি ধারণা এই যে, ভারতবর্ষকে কোন প্রধান মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি বা আবির্ভাবের সম্ভাবিত ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করা চলে কিনা সন্দেহ এবং দেখা যায় একটির পর একটি গোষ্ঠী বাহির হইতে ভারতবর্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পূর্বাগতদিগের সহিত সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছে।

বাহির হইতে যে সকল গোষ্ঠী বা জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছে, আসিবার অনুমিত সময় অনুসারে তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :

১। যাহারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

২। যাহারা ঐতিহাসিক যুগে এদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আসিয়াছে।

৩। যাহারা ইহার পরে আসিয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের অধিবাসী

পণ্ডিতগণের মতে, প্রাগৈতিহাসিক আমলে যে সকল বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী বাহির হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হইতেছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনতম মনুষ্যগোষ্ঠী নেগ্রিটো, কেহ কেহ এরূপ বলিয়াছেন। কর্ণেল সেওয়েলের মতে, তাহারা উত্তর-পূর্বের পথে এশিয়ার প্রধান ভূখণ্ড হইতে প্রাচীন প্রস্তরযুগে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ইহার পরের স্তর মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাভাষী প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বা নিষাদ গোষ্ঠী। ইহাদের উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা ভারতবর্ষের নিজস্ব আদিম অধিবাসী, আগন্তুক জাতি নহে। ইহার

পরের স্তর মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ। মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের দুইটি ধারা আছে, একটি শান-ব্রহ্ম, অপরটি তিব্বতী ধারা। তিব্বতী ধারা পশ্চিম হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকার উত্তর ভাগ ও উত্তর বঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। শান-ব্রহ্ম ধারা আসামের পূর্বাঞ্চল হইতে আসিয়া আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। কোন কোন মতে, পাটকাইয়ের দক্ষিণে লুসাই পর্বত, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও আরাকান, ইয়োমা হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত যে পথ আছে, সেই পথে মালয় ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে পৃথক একটি মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের ধারা উত্তরে উঠিয়া আসিয়াছে। ইহার পরে আসিয়াছিল লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী। নাম হইতে এই গোষ্ঠীর পরিচয় কিছুটা প্রকাশ পাইতেছে। ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর পরে পামীর বা মধ্য এশিয়ার তারিম অববাহিকা অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠী (অন্য নাম পামীরী, আলপাইন, আলেপো-দিনারিক ইত্যাদি)। সিন্ধুযুগে (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ সহস্রকে) বা তাহার পূর্বে ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সময়ে সিন্ধু উপত্যকায় লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী ছাড়া দ্বিতীয় একটি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর উপস্থিতির কথা দুই একজন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী বলিয়াছেন। অনেক পণ্ডিতের মতে, প্রাগৈতিহাসিক আমলে সকলের শেষে আসিয়াছিল প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীভুক্ত আর্য জাতি।

এই সকল বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয় সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

নেগ্রিটো গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের প্রথম স্তর বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নাই। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ হয়ত রহিয়াছে এবং এই সংমিশ্রণের ধারা বাহিরের নেগ্রিটো অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। ভারতবর্ষের প্রধান ভূভাগের অধিবাসীদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের কথা উঠে না; কারণ মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠী দেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলি অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তর ভাগে কখনও প্রবেশ করে নাই। ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী সম্বন্ধে বহু অপ্রমাণিত কথা বলা হইয়াছে। সিন্ধুযুগের যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীকে ভূমধ্যসাগরীয় নাম দেওয়া

হইয়াছে, বর্তমান কালের উত্তর-পশ্চিম ভারতের জাতিগুলির সঙ্গে এই গোষ্ঠীর কতখানি সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ মত স্থির করিতে পারেন নাই।

তারপর সিন্ধুযুগের যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠী বলা হইয়াছে তাহারা বাস্তবিক বহিরাগত নয়; তাহারা আইরিয়ানার অধিবাসী এবং এই আইরিয়ানার দক্ষিণভাগে সিন্ধু উপত্যকা। দেশের নাম আইরিয়ানা হইতে ইহাদের বলা হয় আর্য। তারপরের বক্তব্য, বৈদিক আর্য জাতি ও তাহাদের প্রোটো-নর্ডিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণতঃ যাহা বলা হয় তাহা যুক্তিসঙ্গত অনুমানের পর্যায়ে উঠে না। বৈদিক আর্য জাতি বলিয়া কোন জাতির অস্তিত্ব ও তাহাদের ভারতবর্ষে আগমনের কাহিনী কল্পনার বস্তু। বেদ আর্যদের একাংশের দ্বারা রচিত, আবেস্তাও তাহাই। উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে সকল জাতিকে ইন্দো-এরিয়ান, ইন্দো-আফগান প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে এবং রিজ্‌লে প্রভৃতি পণ্ডিত যাহাদিগকে আর্য জাতির বংশধর বলিয়া মনে করেন, দেখা যায় যে, তাহারা প্রধানতঃ পাঠান, রাজপুত, জাঠ ও গুজর। পাঠান বা পাখতুন ঋগ্বেদে উল্লেখিত পাকৃটি জাতি। রাজপুত, জাঠ ও গুজর, কোন কোন মতে সিথিয়ান, অর্থাৎ শক, য়িয়ুচী ও হুণ গোষ্ঠীয়।

দেখা যাইতেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে নিষাদ গোষ্ঠি, নিষাদ গোষ্ঠির সহিত মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতিগুলিকে পাওয়া যাইতেছে। এখানে এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে যে, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ হইতে ত্রয় সহস্রকের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে কয়টি গোষ্ঠিকে দেখিতে পাওয়া যায়, বর্তমান যুগেও তাহাদিগকেই ভারতবর্ষের প্রধান অধিবাসীরূপে দেখা যায়। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলির পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই। গোল এবং লম্বামুণ্ড, সরল, উন্নতনাসা জাতিগুলি ভারতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক; কিন্তু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদান প্রদান এবং রক্তের মিশ্রণ সত্ত্বেও দুইটি গোষ্ঠীর প্রধান অংশগুলিকে চিনিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। একদিকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কন্নাড় ও তামিলনাদের গোলমুণ্ড জাতিগুলিকে প্রাগৈতিহাসিক

যুগের পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর বংশধর বলিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন, অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারত, রাজপুতানা এবং দেশের অন্যান্য অংশে নিষাদ গোষ্ঠীর বাহিরে যে লম্বামুণ্ড, সরল, উন্নতনাসা জাতিগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের লম্বামুণ্ড, উন্নতনাসা গোষ্ঠীর বংশধর বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণ ভারতের তথাকথিত দ্রাবিডিয়ান জাতির মধ্যে এই দুই গোষ্ঠী ও নিষাদ গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি আছে, দ্রাবিডিয়ান বলিয়া পৃথক কোন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব কখনও ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়।

ঐতিহাসিক যুগ

ঐতিহাসিক যুগে বৈদেশিক জাতির ভারতবর্ষে প্রবেশের কথা বলিতে হইলে প্রথমতঃ এমন একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক, যে সময় হইতে ভারতবর্ষে আগন্তুক বিদেশী জাতিদের সম্বন্ধে ও বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ সম্বন্ধে খানিকটা সংবাদ পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেকখানি স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মগধে শিশুনাগ বংশের বিম্বিসারের রাজত্বকালে আকামনি আমলের ইরাণের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগের বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতককে সীমারেখা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

ইরাণী

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ও ইরাণের মধ্যে সংযোগের প্রথম ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার বহু পূর্বে বেবিলন, আসিরীয়া ও খ্রীঃ পূঃ ১৮শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সহিত মিশরের বাণিজ্যিক সংযোগের কথা বলা হইয়াছে। ইরাণের সহিত ভারতবর্ষের যে সংযোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা ঘটিয়াছিল আকামনি সম্রাট প্রথম দারিয়ুসের রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ৫২১ অব্দ)। সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্তান এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চল দারিয়ুসের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। পারসিপোলিসে দারিয়ুসের সমাধিতে উৎকীর্ণ লিপিতে ভারতবর্ষের নাম আছে। সম্ভবতঃ প্রথম জারেক্সাসের আমল পর্যন্ত (খ্রীঃ পূঃ ৪৭০) এই সম্পর্ক বজায় ছিল। গ্রীক আক্রমণের বহু পূর্বে এই সম্পর্ক লুপ্ত হইয়াছিল।

ইরাণের সহিত সম্পর্কের ফলাফলস্বরূপ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভার উপর আকামনি আমলের রীতিনীতির প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। ইহার বহু পরে সাসানীয় আমলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইরাণী প্রভাবের কথা, ইরাণ হইতে আনীত সূর্য উপাসনার প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। ইরাণীদের অধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহাভারতে 'পারশীকদের' উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইরাণীদের সহিত ভারতবাসীর সংযোগের প্রসঙ্গে একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। আর্য জাতির বাসভূমি যে আইরিয়ানার উল্লেখ করা হইয়াছে, আবেস্তার মতে তাহার দক্ষিণ সীমানা সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম সীমানা সমগ্র পূর্ব ইরাণ ও পশ্চিম ইরাণের কয়েকটি অঞ্চল। হেলমন্দ উপত্যকার প্রাচীন গ্রীক নাম আরিয়া ও পারস্যের ইরাণ নামে এই আইরিয়ানা নামের পরিচয় রহিয়াছে। সুতরাং ইরাণ ও ভারতবর্ষের অধিবাসীর বৃহৎ অংশ একই গোষ্ঠীভুক্ত। এই গোষ্ঠী গোলমুণ্ড, সরল, উন্নতনাসা জাতি। সিন্ধুযুগে এই গোষ্ঠীর ভারতবর্ষে উপস্থিতির কথা এবং ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে তাহাদের বংশধর জাতিগুলির উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। হেলমন্দ উপত্যকা, ব্যাকট্রিয়া, পামীর, বেলুচীস্তান, সিন্ধুদেশে এই গোষ্ঠীর জাতিগুলি সংখ্যায় প্রবল। প্রাচীন ইরাণের এই গোষ্ঠীর প্রতিনিধি তাজিক জাতি এবং পার্শী সম্প্রদায়, যাহারা সাসানীয় আমলে আরবজাতি কর্তৃক ইরাণ আক্রমণের সময়ে পলাইয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর যে ঐতিহাসিক যুগে ইরাণের সহিত সম্পর্কের কথা বলা হইল, তাহার প্রায় দুই শতাব্দী পরে মৌর্য আমলে পশ্চিমে হিরাট ও উত্তরে ব্যাকট্রিয়া পর্যন্ত সমগ্র আফগানিস্তান ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত ছিল। সুতরাং প্রথম দারিয়ুসের আমলের অবস্থা এবার ভারতবর্ষের অনুকূলে উল্টাইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, বর্তমানে সেমিটিক-তুর্কী-মোঙ্গল সংমিশ্রণে পরিবর্তিত ইরাণী নহে, পূর্ব ইরাণের প্রাচীন ইরাণী গোষ্ঠীর সহিত নানা দিক দিয়া ভারতবাসীর সঙ্গে সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, সে যুগে রাজনৈতিক হিসাবে ছাড়া তাহাদিগকে বৈদেশিক জাতি বলা চলে না।

ইহার পরে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, কাল হিসাবে তাহাদের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে:[১৮]

খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী হইতে ১ম শতাব্দী গ্রীক, (সিথিয়ান) শক, পার্থিয়ান বা পহ্লব ;

খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী হইতে ৪র্থ শতাব্দী (সিথিয়ান) শক, য়্যুচী, কুশান বা তুখার ;

খ্রীষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দী (সিথিয়ান) হূণ (জেঠিয়া, কিদার, য়ুয়ান-য়ুয়ান, আবর)।

দেখা যাইতেছে, এই তালিকায় সিথিয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

গ্রীক

গ্রীকদের কথা প্রথমে বলা হইতেছে। ভারতবর্ষের সহিত গ্রীক জাতির সংযোগের সূত্রপাত আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের ফলে। খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ সনের এপ্রিল বা মে মাসে সসৈন্যে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া আলেকজাণ্ডার চিত্রল, বাজাউর, সোয়াত হইয়া পাঞ্জকোরা নদী পার হইয়া সম্ভবতঃ মালখন্দ গিরিসঙ্কটের পথে পেশোয়ার উপত্যকায় প্রবেশ করেন এবং খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিপাশা তীর হইতে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। এই এক বৎসর চারি মাস সময়ের মধ্যে তিনি যতগুলি যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন ও যতগুলি বীভৎসপূর্ণ হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট ধনরত্ন ও যাসাগা হইতে যে উৎকৃষ্ট গরুগুলি মাসিডোনে পাঠান হইয়াছিল তাহা ছাড়া আর কোন স্থায়ী লাভ হয় নাই। হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি ইরাণে ফিরিতে না ফিরিতে ভারতবর্ষে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। "Within three years of his departure his officers had been ousted, his garrisons destroyed and all trace of his rule had disappeared. The colonies that he founded in India, unlike those in the other Asiatic provinces, took no root."

ইহার পরে খ্রীঃ পূঃ ৩০৫ সনে সেলুকাস নিকেটরের সঙ্গে সন্ধির ফলে হিন্দুকুশের দক্ষিণের ও পশ্চিমে হিরাট পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। উত্তরে ব্যাকট্রিয়া গ্রীকদের দখলে থাকে। খ্রীঃ পূঃ ২৪৫ সনে বাকট্রিয়ার গ্রীক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার পর

ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক রাজাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপিত হয়। খ্রীঃ পূঃ ১২০ সনের পূর্বে শক আক্রমণে ব্যাকৃট্রিয়ায় গ্রীক আধিপত্য লুপ্ত হয়। ব্যাকৃট্রিয়া হইতে বিতাড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাকৃট্রিয়ান রাজারা কাবুল উপত্যকা হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া কিছুকাল পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভারতীয় সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর গ্রীক প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে গ্রীক জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা উঠে নাই।

পার্থিয়ান

ইহার পর পার্থিয়ানদের এবং ইন্দো-পার্থিয়ান নামে পরিচিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকজন রাজার কথা উঠে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, কান্দাহার ও সিস্টান ইরাণের আরসিকিডান রাজবংশের সম্পর্কিত বা এই রাজবংশ কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তাদিগের অধীন ছিল। সিন্ধুর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে এবং কিছুকালের জন্য সিন্ধুদেশে ইঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫০ সনে যাঁহারা তক্ষশীলা ও মথুরা শাসন করিতেন তাঁহারা জাতিতে শক, পার্থিয়ান নহেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পার্থব বা পহ্লব জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দো-পার্থিয়ান রাজাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, এই সংযোগ অতি অল্পকাল স্থায়ী, ক্ষীণ ও অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে আবদ্ধ ছিল, সুতরাং জাতি সংমিশ্রণের কথা উঠে না।

সিথিয়ান

ইহার পরে সিথিয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলির কথা বলিতে হয়।

এই সিথিয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলি ইতিহাসের ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এক রহস্য, যেমন আর এক রহস্য আরও প্রাচীন যুগের ইতিহাসের কাশাইট, মিটানী, হিটাইট, হিক্‌সস, কিমেরিয়ান জাতিগুলি। খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘকাল পশ্চিমে য়ুরোপের হাঙ্গেরী হইতে

পূর্বে চীন পর্যন্ত য়ুরোপ ও এশিয়ার বিশাল অঞ্চলে, ইরাণ ও ভারতবর্ষের অভ্যন্তর ভাগে সিথিয়ানদিগকে চলাফেরা করিতে দেখা যায়। তারপর তাহারা জনসমূদ্রে তলাইয়া গিয়াছে।

সিন্ধুদেশের দক্ষিণ অঞ্চল টলেমী প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকগণের নিকট ইন্দো-সিথিয়া নামে পরিচিত ছিল। রিজ্‌লের মতে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সিথিয়ান+দ্রাবিড় এবং সিথিয়ান+আর্য সংমিশ্রণ আছে। দ্রাবিডিয়ান মতবাদের স্রষ্টা বিশপ ক্যাল্‌ডওয়েলের মতে, প্রাচীন দ্রাবিডিয়ান জাতি সিথিয়ান, তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সিথিয়ান। রাজস্থানের কৌলিক ইতিহাসের লেখক কর্ণেল টডের এবং আরও কোন কোন মতে রাজপুত, জাঠ, গুজর, মেড়, কোলি, কাঠি প্রভৃতি জাতি মধ্য-এশিয়া হইতে আগত সিথিয়ান। অশ্বারোহণপটু মারাঠারা কোন কোন মতে সিথিয়ান। দাক্ষিণাত্যে, গুজরাটে, মালবে, তক্ষশীলায়, মথুরায় সিথিয়ান শক রাজারা বহু দিন রাজত্ব করিয়াছেন। কেহ কেহ এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় ১১শ।১২শ শতাব্দী হইতে বহিরাগত আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ ব্যাপারে দুর্বলতা ও জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে গোষ্ঠী বা কৌমগত সচেতনতার যে প্রখরতা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা গিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রচুর সিথিয়ান সংমিশ্রণ।

সে যাহা হউক, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অধিবাসীদের সঙ্গে, এই সকল মতানুসারে, ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সিথিয়ান জাতিগুলির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় কি? এশিয়ার কোন্ খণ্ডে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল? ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে ইহাদের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য কি? এই সংমিশ্রণের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যে সকল বিভিন্ন গোষ্ঠী বা রেস টাইপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতখানি পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

এই সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব কিনা জানিবার জন্য সিথিয়ান জাতিগুলি সম্বন্ধে যাহা জানা যায় সংক্ষেপে তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই।

সিথিয়ান ও সিথিয়া নাম প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের নিকট পাওয়া গিয়াছে। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হেকাটিয়াস এই নাম প্রথম ব্যবহার করেন।

তাঁহার পরে আরিষ্টিয়াস (খ্রীঃ পূঃ ৬৮৯) এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ষ্ট্র্যাবো হেরোডোটাসের লেখায় এই দুই জন ঐতিহাসিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, হোমারের (খ্রীঃ পূঃ ৮৫০) বিখ্যাত কাব্য ইলিয়ডে সিথিয়ান জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় (Illiad XIII.5)। হেরোডোটাস মীড সম্রাট সিয়াক্সজারেসের (খ্রীঃ পূঃ ৬৩৪-৫৯৪) সময় সিথিয়ানদের মিডিয়া আক্রমণের, সিথিয়ানদের সহিত যুদ্ধে সাইরাসের নিহত হইবার (খ্রীঃ পূঃ ৫২৯) এবং খ্রীঃ পূঃ ৫১১ সনে দারিয়ুসের সিথিয়া আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

আলেকজাণ্ডারের এশিয়া অভিযানের বহু পূর্বে সিথিয়ান জাতির সহিত গ্রীক ঐতিহাসিকদের এই পরিচয় হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রসঙ্গে যে সকল সিথিয়ান জাতির উল্লেখ করা হয়, ভারতবর্ষের সহিত যাহাদের সম্পর্ক খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর শেষার্ধে আরম্ভ হয়, গ্রীক ঐতিহাসিকদের পরিচিত সিথিয়ান জাতি তাহারা নহে। হেরোডোটাস দারিয়ুস কর্তৃক যে সিথিয়া আক্রমণের কথা বলিয়াছেন, সে সিথিয়া য়ুরোপে অবস্থিত। খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীকগণ যখন কৃষ্ণ সমুদ্রের উত্তর অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে তখন তাহারা দেখিতে পায় যে, দক্ষিণ রুশিয়ার ষ্টেপ বা তৃণময় অঞ্চল এক যাযাবর জাতির অধিকারে। এই জাতিকে গ্রীকগণ সিথিয়ান নাম দেয়। পশ্চিমে ষ্টেপ অঞ্চল অতিক্রম করিয়া ড্যানিউব নদী পর্যন্ত সিথিয়ানগণ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নীষ্টার ও নীপার নদীর তীরে ও দক্ষিণ-পূর্ব পোদেলিয়ায় তাহাদের বিস্তৃত উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজোভ সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে সিথিয়ানদিগের যে গোষ্ঠী বাস করিত তাহার নাম ছিল রয়েল সিথিয়ান। ঐ গোষ্ঠীর রাজ্য ক্রিমিয়ার অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দারিয়ুস কর্তৃক সিথিয়া অভিযানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, বসপোরাসের উপর সেতু বাঁধিয়া দারিয়ুস গ্রীসে উপস্থিত হন। তারপর উত্তর-পূর্ব মুখে অগ্রসর হইয়া ড্যানিউব অতিক্রম করেন। ডন নদীর কূল এবং সম্ভবতঃ ভলগা পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপের এই সিথিয়ান জাতি সম্বন্ধে জানা যায় যে, তাহারা আপনাদিগকে সে অঞ্চলের আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করিত। নীপার

নদী অঞ্চলে সিথিয়ান রাজাদের বহু প্রাচীন সমাধিস্তূপ (Kurgan) দেখিতে পাওয়া যায়। হেরোডোটাস দারিয়ুসের সিথিয়া আক্রমণের সময়কার (খ্রীঃ পূঃ ৫১১) সিথিয়ার রাজার নাম এবং তাঁহার পূর্ববর্তী পাঁচজন রাজার নাম দিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ মিলাইয়া কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, য়ুরোপে সিথিয়ান জাতির উপনিবেশ স্থাপন বহু প্রাচীন কালের ব্যাপার যদিও সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, তাহারা খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সারমাসিয়ান জাতির আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া বহু সিথিয়ান ড্যানিউব অতিক্রম করিয়া দোব্রুজায় প্রবেশ করে। এই সারমাসিয়ান সিথিয়ান গোষ্ঠীর একটি শাখা ছিল। হেরোডোটাসের সময়ে ইহারা ডন ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করিত।

ম্যাসিডোনীয় ও পার্থিয়ান আমলের ইরাণের মানচিত্রে গ্রীক ও রোমান ভৌগোলিকগণ কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বে, যাহা এখন তুর্কমানিস্তান, সেইখানে সিথিয়ার অবস্থান দেখাইয়াছেন। কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বভাগের সিথিয়ার নাম Scythia intra Imaus. Imaus বলিতে ঠিক কোন্ পর্বতশ্রেণী বুঝায় সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। মোটামুটি মত এই যে "It (Imaus) is one of those terms which the ancient geographers appear to have used indefinitely for want of exact knowledge. In its most definite application it appears to mean the western part of the Himalayas."

তারপর বলা হইয়াছে, "It must either be understood to mean the Moussour or Altai mountains or some imaginary range which cannot be identified with any actually existing mountains." ইমাউস অর্থে আলতাই পর্বতমালা ধরিলে সিথিয়ার এক অংশের মধ্যে পড়ে আরল-কাস্পিয়ান ও বলখাস নিম্নভূমি ও অপর অংশে, অর্থাৎ Scythia extra Imaus-এ পড়ে জুঙ্গেরিয়া ও মোঙ্গোলিয়া হইতে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত অঞ্চল। একটি অংশের দক্ষিণ সীমানা ইরাণ, আফগানিস্তান ও পামীর এবং অন্য অংশের দক্ষিণ সীমানা কারাকোরাম-কুয়েনলুন পর্বতশ্রেণী। মোটামুটি বলা যায় যে, পামীর ও পূর্ব তুর্কীস্থান, এশিয়ার ২১ লক্ষ ৯৫ হাজার বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চলের

ইচ্ছামত যে কোন অংশকে সিথিয়া নাম দেওয়া হইত। য়ুরোপের প্রাচীন সিথিয়াকে ইহার সঙ্গে ধরিলে হাঙ্গেরী পর্যন্ত সিথিয়ার প্রসার বাড়িয়া যায়।

সিথিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন জাতি

হেরোডোটাসের আগের গ্রীক ঐতিহাসিকেরা শুধু দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ার সিথিয়ান জাতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সারমাসিয়ানদের নিকট সিথিয়ানদের পরাজয় ও বিপর্যয়ের পরে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এশিয়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে সিথিয়ান নাম দিতে আরম্ভ করে। ক্রমে অপরিচিত ও দূরবর্তী জাতিমাত্রেই সিথিয়ান নামে অভিহিত হইতে থাকে ('their name became a favourite designation of more remote and less known nations.')। রোম সাম্রাজ্য আমলে সিথিয়া বলিতে উত্তর এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল বুঝাইত। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে কাস্পিয়ান ও উরালের পূর্বের অঞ্চল হইতে যে সকল জাতি য়ুরোপ আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদিগকে আর সিথিয়ান নামে অভিহিত হইতে দেখা যায় না, তাহাদের বিভিন্ন জাতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের নাম হুণ, আবর, তাতার বা তুর্কি, বুলগার, উগ্রিয়ান বা ফিন, খাজার, মোঙ্গোল ইত্যাদি। মোঙ্গোল, তুর্ক বা ফিনো-উগ্রিয়ান গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতিকে কেহ কেহ হুণিক বা সিথিয়ান গোষ্ঠী নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরবর্তীকালে এই হুণিক বা সিথিয়ান নামটির পরিবর্তে ইহাদের পরিচয় দিবার জন্য তুরাণী (তুর্কো-ইরাণীয়ান), উরাল-আল্‌তাইক, আল্‌তাইক, ফিনো-উগ্রিয় ইত্যাদি নামের প্রচলন হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপ অথবা পশ্চিমে ড্যানিউব হইতে পূর্বে ভল্‌গা ও উরল নদী পর্যন্ত অঞ্চল এবং কৃষ্ণ সাগর ও আজোভ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল সিথিয়ান জাতির অধ্যুষিত এলাকা ছিল। এই ঐতিহাসিকেরা সিথিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত অনেকগুলি জাতির নাম করিয়াছেন। রয়েল সিথিয়ান ও সারমাসিয়ান জাতির নাম উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। বুগ ও নীষ্টার নদীর তীরবর্তী অঞ্চল মিশ্র গ্রীক ও সিথিয়ান জাতির উপনিবেশ ছিল। নিম্ন ভল্‌গা অঞ্চলের Thyssagetae এবং ভল্‌গা ও উরলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের Iyrcae জাতির নাম পাওয়া যায়। বীজ ও আকাবনি দাহ্রাবোর

আমলে য়ুরোপের বাহিরের অঞ্চলের (মধ্য এশিয়া বা তুর্কীস্তান) দুইটি সিথিয়ান জাতির বিশিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। মিডিয়া আক্রমণকারী সিথিয়ান জাতিকে শক বলা হইয়াছে। শক নামটি কখনও সিথিয়ান গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট শাখা, কখনও সাধারণভাবে সিথিয়ান গোষ্ঠীকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মিডিয়া আক্রমণকারী শক জাতি ককেশাসের দারিয়েল পাশ বা ককেশাস ও কাস্পিয়ানের মধ্যবর্তী দারবেও পাশ অতিক্রম করিয়া মিডিয়ায় অভিযান করিয়াছিল। এই মত অনুসারে শকদের বাসভূমি দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ায় দাঁড়ায়। কোন কোন মতে, মাসাজেটের আক্রমণে বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া শক জাতি আমুদরিয়া অতিক্রম করিয়া মিডিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। ম্যাসাজেট জাতির বাসভূমি ছিল সির দরিয়া ও আরল সাগরের উত্তরে এবং আরল ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, অর্থাৎ উষ্ট উর্ট মালভূমি ও উহার উত্তরে। হেরোডোটাস সকল ট্রান্সকাস্পিয়ান যাযাবর জাতিকে এই নাম দিয়াছেন। উল্লিখিত থিসাজেট ও মাসাজেটদিগের নাম ও বাসভূমির তুলনা করিয়া উভয়কে সম্পর্কিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। শকদের সম্বন্ধে ইহার পরে বলা হইবে।

ম্যাসিডোনীয়া ও ব্যাক্ট্রিয়ায় গ্রীক শাসনের আমলে মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের আরও প্রসার হইবার ফলে গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকেরা সিথিয়ান বলিয়া অভিহিত আরও কতকগুলি জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই সময় হইতে সিথিয়া বলিতে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল বুঝাইতে আরম্ভ করে।

ব্যাক্ট্রিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করিয়া আলেকজাণ্ডার সগ্ডিয়ানার মধ্য দিয়া সির দরিয়া ও তাহার উত্তর অঞ্চলের সিথিয়ানদের দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক নোলডেক ও ভুট্স্মিডের মতে, এই অঞ্চলের সিথিয়ান ছিল তুরাণী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং "here perhaps occurs the first mention in history of the Turkish race"। তুরাণীদের দেশ আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্য ছিল মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্যপথ সুরক্ষিত করা এবং ইরাণের উত্তর সীমান্তে তুরাণী যাযাবরদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন বন্ধ করা।

প্রাচীন ইরাণের মানচিত্রে কাস্পিয়ানের পূর্বে সিথিয়া, সিথিয়ার দক্ষিণে

দাহী ও দাহীর পূর্বে ও সগ্‌ডিয়ানার পশ্চিমে কোরাসমিয়ার অবস্থান দেখান হইয়াছে। এই সমগ্র অঞ্চলের অধিবাসীর সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে সিথিয়ান। সিথিয়ার অবস্থান হইতে উহার অধিবাসীদিগকে মাসাজেট বলিয়া অনুমান করা চলে। দাহীদিগের বাসভূমি হিরকানিয়া এবং মার্গাস, আমু ও সির দরিয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বলা হইয়াছে। কোরাসমিয়ার অধিবাসী-দিগকে শক বা মাসাজেটের শাখা বলা হয়। ইরাণের পার্থিয়ানরা কোন কোন মতে দাহীদিগের শাখা ; আবার কোন কোন মতে, ইরাণী ও সিথিয়ান সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি।

সে যাহা হউক, ইরাণের উত্তরের মরুময় অঞ্চলের মাসাজেট, শক, দাহী, কোরাসমি প্রভৃতি জাতিকে সাধারণভাবে সিথিয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে। ইতিহাসের বর্ণনায় ইহারাই Nomads of the northern deserts, যাহারা পুনঃপুনঃ ইরাণ আক্রমণ করিয়াছে। ইহারা সকলেই তুর্কী গোষ্ঠীর কিনা পরে দেখা যাইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আলেকজাণ্ডার ব্যাকৃট্রিয়া আক্রমণ করিলে শক ও দাহী জাতি ব্যাকৃট্রিয়ার শাসনকর্তা বেসুসকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সগ্‌ডিয়ানার শাসনকর্তা স্পিতামেনেস পরাজিত হইয়া মাসাজেটদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকামনি আমলের শেষের দিকে কোরাসমিয়ার প্রধান পশ্চিমে ককেশাসের পাদভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর আধিপত্য করিতেন।

ব্যাকৃট্রিয়ায় গ্রীক শাসনের ঐতিহাসিকেরা কয়েকটি নূতন জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারাও সিথিয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক রাজা ডেমেট্রিয়াস তারিম অববাহিকার পথে চীনের সহিত বাণিজ্যপথ সুরক্ষিত করিবার জন্য পূর্ব তুর্কীস্থানে সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে যে সকল জাতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ফৌনী, আত্তাকোরী, তোখারি জাতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। প্লিনির মতে, আত্তাকোরী হোয়াংহো নদীর উৎপত্তিস্থানের নিকটে, অর্থাৎ কান সুর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে (কোকনরে) বাস করিত। ফৌনী জাতির বাসভূমি ছিল ইহার পশ্চিমে। তোখারি জাতির বাসভূমি ফৌনী জাতির বাসভূমির পশ্চিমে। অনুমান করা হইয়াছে যে, খোতান অঞ্চল ছিল তোখারি জাতির আদি বাসভূমি। ষ্ট্রাবোর মতে, কতকগুলি জাতি সিলিয়া ব্যাকৃট্রিয়া গ্রীকদের

হাত হইতে কাড়িয়া লয়। এই সকল জাতির মধ্যে তিনি আসিয়াই, পাসিয়ানি, তোখারি ও শাকারৌকের নাম করিয়াছেন। ইহারা সকলেই শকদের দেশে বাস করিত। ইহাদের সঙ্গে সগ্‌ডিয়ানার অধিবাসীরা যোগ দিয়াছিল। শকদের বাসভূমি সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আরল-কাস্পিয়ান অঞ্চল হইতে সরিয়া লক্ষ্যস্থল ক্রমে বলখাস হ্রদ অঞ্চল, পূর্ব তুর্কীস্তান ও চীনের সীমানা পর্যন্ত আসিয়াছে। ডিমেট্রিয়াসের অভিযান খ্রীঃ পূঃ ১৭৭ সনের ব্যাপার এবং ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক রাজত্ব ধ্বংস হয় অনুমান খ্রীঃ পূঃ ১৪০–১৩৮ সনের মধ্যে।

য়িয়ুচী (কুশান, তোখারি), শক—এইবার চীনদেশের ইতিহাসের বিবরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিথিয়ান আক্রমণের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় চীনের ইতিহাসে। চৌ-বংশের সম্রাট মূহ্‌ওয়াঙের রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ৯৩৬) সিথিয়ান বা তাতারগণ চীনের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে থাকে। ইহার পর খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকে হিয়েঙ-নু ও য়িয়ুচীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। চীন সম্রাট চে-হাং-তে (Thsin dynasty, খ্রীঃ পূঃ ২১০) হিয়েঙ-নুদের পরাজিত করিয়া মোঙ্গোলিয়ার অভ্যন্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। ইহাদের উপদ্রব বন্ধ করিবার জন্য তিনি চীনের প্রসিদ্ধ প্রাচীর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। চীন আক্রমণে ব্যর্থ হইয়া হিয়েঙ-নু জাতি সেন-সে ও কান সুর মধ্যে যে য়িয়ুচী রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আক্রমণ করে। পরাজিত ও দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া য়িয়ুচীগণ তুর্কীস্তান ও কাস্পিয়ানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) চলিয়া যায়। হান বংশের সম্রাট উ-তে হিয়েঙ-নুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে য়িয়ুচীদের সাহায্য পাইবার জন্য একজন দূতকে য়িয়ুচী রাজধানীতে পাঠান (খ্রীঃ পূঃ ১২৯)। এই রাজদূতের নাম চ্যাংকিয়েন।

চ্যাংকিয়েনের বিবরণ হইতে কতকগুলি জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। য়িয়ুচী জাতি সগ্‌ডিয়ানায়, থ্যাং-কিন সির দরিয়া অঞ্চলে, ইয়েন সাই কোরাসমিয়ায় বাস করিত। থ্যাং-কিনদের অধিকৃত অঞ্চলের (সির দরিয়ার উত্তর তীর) পূর্বে ছিল হিয়েঙ-নুদের রাজ্য। তাহিয়া (ব্যাকৃট্রিয়া) য়িয়ুচীদের অধিকারে ছিল। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, এই ইয়েনসাই গ্রীক ঐতিহাসিকদের আওরসি। আওরসিদের : পশ্চিমাঞ্চল কাস্পিয়ান সাগরের

পশ্চিম হইতে ভন নদীর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পূর্বভাগ কাস্পিয়ান সমুদ্রের উত্তর কূল হইতে সির দরিয়ার দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আওরসিদের অন্য নাম আদারসি এবং ইহারাই উল্লিখিত সারমাসিয়ান জাতি। কাস্পিয়ান সাগর ও আজোভ সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল এশিয়াটিক সারমাসিয়া। য়ুরোপীয় সারমাসিয়া বলিতে পোলাণ্ডের পূর্ব অংশ ও রুশিয়ার দক্ষিণ অংশ বুঝাইত। ককেশাসের প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কট দারিয়েল Sarmaticae Portoe নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী চীনা ইতিহাসে ইয়েন-সাই জাতির নাম হইয়াছে আ-লান-না। ষ্ট্র্যাবোর বিবরণে ব্যাকট্রিয়াব গ্রীক রাজ্য যাহারা ধ্বংস করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে শকারৌক জাতি অন্যতম। ইহারা যে অঞ্চলে বাস করিত তাহার গ্রীক নাম সাক্সিয়ানা। একজন ঐতিহাসিক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চ্যাংকিয়েনের উল্লেখিত খ্যাং-কিন জাতি ও ষ্ট্র্যাবোর উল্লেখিত শকারৌক জাতি অভিন্ন। ষ্ট্র্যাবোর বর্ণিত আসিয়াই ও আসিয়ান এবং টলেমীর বর্ণিত জাতিয়াই, অধ্যাপক নোলড্‌কের মতে তোখারি জাতির বিভিন্ন নাম। এই তোখারি জাতির চীনা নাম য়িয়ুচী।

খ্রী: পূঃ ২য় শতাব্দীতে (খ্রীঃ পূঃ ১৭৭) হিয়েঙ-নুদের প্রসঙ্গে য়িয়ুচী জাতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তোখারি, আসিয়াই, আসিয়ানি, জাতিয়াই ছাড়া য়িয়ুচীদের আরও কতকগুলি নাম আছে; যথা য়িয়ুত, য়িয়েত, ঘেত, কাওচাং, কাশান, কুশান ইত্যাদি। তা বা তোখারি বড় য়িয়ুচী নামে পরিচিত। তোখারি ভারতীয় ইতিহাসে তুখার, তুষার প্রভৃতি নামে পরিচিত। অনুমান করা হয় যে, তোখারি গোষ্ঠী বা জাতির নাম য়িয়ুচী দলের নাম। কাওচাং বা কাশান চীন ইতিহাসে হুই-খে-দের দক্ষিণ শাখা। তাহারা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে তিয়েনশানের দক্ষিণ ও পূর্বে পামীর ও কুয়েন-লুন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করিত।

য়িয়ুচী জাতি সেন-সে হইতে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিমে অগ্রসর হইবার সময় প্রথমে উস্থন ও পরে সে-জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেন-সে হইতে যাত্রা করিবার পর মরুভূমি পার হইয়া তিয়েনশানের উত্তরের পথে প্রসিদ্ধ জুঙ্গেরীয়ান গেট অতিক্রম করিয়া য়িয়ুচীরা বলখাস হ্রদ অঞ্চলে উস্থনদের (কিরাঙ-হুয়ান) দেশে প্রবেশ করে। ইহারা ইলী নদীর অববাহিকায় বাস করিত। উস্থনদিগকে পরাজিত করিয়া য়িয়ুচীরা দক্ষিণে নামিয়া কাশগড়ের

উত্তরে ও সির দরিয়ার উত্তর-পূর্বে ইসিককুল অঞ্চলে শকদের দেশে উপস্থিত হয়। উপরে বলা হইয়াছে যে, শকজাতি এই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া সম্ভবতঃ কাশগড়ের পথে পামীর অতিক্রম করিয়া কাবুলে উপস্থিত হয়। ইহার পরে দেখা যায় উস্থুন ও হিয়েঙ-নুদের মিলিত আক্রমণে য়িয়ুচী জাতি অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া তাহারা সগ্‌ডিয়ানায় প্রবেশ করে। সগ্‌ডিয়ানায় গ্রীক অধিকার লুপ্ত হয় (খ্রীঃপূঃ ১৫৯)

য়িয়ুচী শক্তির অভ্যুদয় হয় ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও ব্যাকৃট্রিয়ায়। ক্রমে আফগানিস্তান ও উত্তর ভারত য়িয়ুচী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুর্ত হয়। তাহাদের একটি শাখা তারিম অববাহিকার দক্ষিণ অঞ্চলে কুয়েন-লুন পর্বতের উত্তরের পাদভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহারা ছোট য়িয়ুচী বা কিদারাইট। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের সীমান্ত হইতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চলে স্থানে স্থানে য়িয়ুচী উপনিবেশ বর্তমান ছিল। খ্রীষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে য়িয়ুচী বৌদ্ধধর্ম প্রচারক চীনে ধর্ম প্রচারের জন্য যাইত, ইহা জানা যায়। হিয়েঙ-নুদের আক্রমণ হইতে পশ্চিম জগতের সহিত সংযোগ ও বাণিজ্য পথ রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব তুর্কীস্তানে যে সকল চীনা সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে য়িয়ুচী সৈন্য নিযুক্ত করা হইত। এই সকল সৈন্যকে সাধারণভাবে হু (হু=বার্বারিয়ান) বলা হইত।

ফরগ্‌না, সগ্‌ডিয়ানা ও ব্যাকৃট্রিয়া অধিকার করিবার প্রায় এক শতাব্দী পরে য়িয়ুচী প্রধান কিউ-সিউ-খিও (প্রথম কাডফাসিস) পাঁচটি পৃথক য়িয়ুচী রাজ্য ঐক্যবদ্ধ করিয়া কাশান বা কুশান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন (খ্রীষ্টীয় ১৫ হইতে ৩০ সনের মধ্যে)। কুশান সাম্রাজ্যের শক্তি এত প্রবল হয় যে, কুশান নৃপতি ইরাণের আরসিকিডান সম্রাটদের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। রোমের সাহায্যে ৩য় তেরিদেতিস সিংহাসন অধিকার করিলে সম্রাট ফ্রাওতেস কুশান রাজ্যে পলায়ন করেন (খ্রীঃ পূঃ ২৭)। তাঁহার সাহায্যের জন্য এক বৃহৎ য়িয়ুচী বাহিনী পার্থিয়া আক্রমণ করে। তেরিদেতিস পলায়ন করিয়া রোমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাবুল অধিকার করিবার পরে অনুমান খ্রীষ্টীয় ৪৫ সন হইতে কুশান শক্তি উত্তর ভারতে অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করে।

উত্তর ভারতে য়িয়ুচী বা কুশান প্রভাবের কথা পরে বলা হইবে। ভারতবর্ষে

কুশান শক্তি ধ্বংস হইবার পরে আফগানিস্তানে কুশান বংশীয়দের অধিকার বহুদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হুয়েন স্তাঙ্ বাদাকশানে তু-লো-পো বা তোখারি রাজ্যের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, পূর্ব তুর্কীস্তানের নিয়া ও এণ্ডিয়ার নিকটে তু-লো-পো-দের পরিত্যক্ত বসতির চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল।

য়িয়ুচীদের দ্বিতীয় সংঘর্ষ হয় সে (S'e, Se) জাতির সঙ্গে। সে ছাড়া শকি বা শকাই নামেও ইহারা পরিচিত। ইহারাই টলেমী বর্ণিত ইন্দো-সিথিয়ান।

সিথিয়ান নামে পরিচিত যে তিনটি জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুইটি, য়িয়ুচী, কুশান বা তোখারি জাতি ও শক জাতির কথা বলা হইয়াছে। এইবার হুণ জাতির কথা বলা হইতেছে।

হিয়েঙ-নু ও হুণ—পণ্ডিতগণের মতে, চীনা ইতিহাসের হিয়েঙ-নু, গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের ফুয়োনি বা উওনি ও হুনি এবং ভারতীয় ইতিহাসের হুণ এক জাতি। ইহাদের আরও কয়েকটি নাম আছে, হৈতাল, হেপথালাইট বা শ্বেত হুণ। মহাভারতে হুণ ও হার হুণ এই দুইটি নাম পাওয়া যায়।

কান সুর উত্তর পশ্চিমে হোয়াঙ-হো বা পীত নদীর উৎপত্তি স্থান কোকনরে য়িয়ুচী বিজেতা হিয়েঙ-নু জাতির বাস ছিল। এই অঞ্চল হইতে তাহারা চীনের সীমান্ত অঞ্চলগুলির উপর আক্রমণ চালাইত। খ্রীঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীতে চৌ বংশের আমলে যে সিথিয়ান বা তাতার আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার নায়ক সম্ভবতঃ এই হিয়েঙ-নু জাতি। চৌ রাজবংশ স্থাপনের সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ১১০০ অব্দ) বা স্যাং বংশের শেষ আমলে এই জাতি মোঙ্গোলিয়ায় রাজ্য স্থাপন করে। এই সময় হইতে চীনের সহিত তাহাদের বিরোধ। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে সিন বা হান বংশের আমলে তাহাদের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ইহার পরে য়িয়ুচী জাতির সহিত সংঘর্ষের ফলে এবং চীন সাম্রাজ্য পূর্ব তুর্কীস্তানে প্রসার লাভ করিতে থাকিলে হিয়েঙ-নুদের তৎপরতার বিবরণ ক্রমে অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে লাগিল। এই তৎপরতার প্রভাব পরোক্ষভাবে ইরাণ, ভারতবর্ষ ও পূর্ব য়ুরোপের ইতিহাসে লক্ষিত হয়।

চীনা ইতিহাসের এই হিয়েঙ-নু ও হুণ জাতি যে অভিন্ন এ সম্বন্ধে De Guignes-এর গ্রন্থ (Histoire Ge'ne'rale des Huns, des Turcs, des

Mongols et des autres Tartares occidentalaux 1756-58) প্রচলিত। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে হিয়েঙ-হু জাতি চীনের প্রাচীর হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে শত্রুর আক্রমণে এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং হিয়েঙ-হুদের একটি দল পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়া উরল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে।

হূণদের ইতিহাস সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার ধারণা করিতে হইলে প্রথমতঃ ভারতবর্ষ, ইরাণ, পূর্ব য়ুরোপে তাহাদের তৎপরতার কিছু বিবরণ দিতে এবং আরও কয়েকটি জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্কের কথা বলা আবশ্যক।

ভারতবর্ষে হূণদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় ৪৫৫ হইতে ৫২৮ অব্দের মধ্যে, যখন বালাদিত্য ও যশোধর্মণের আক্রমণে মিহিরগুল পরাজিত ও বন্দী হন। মুক্ত হইয়া মিহিরগুল কাশ্মীর ও গান্ধারে রাজত্ব করিতে থাকেন। সুতরাং ভারতবর্ষে হূণ প্রভাবের স্থিতিকাল ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে মিহিরগুলের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত লইয়া যাওয়া যায়। মোটামুটি ৭০ হইতে ৮০ বৎসর কাল ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে হূণদিগের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইরাণের ইতিহাসে হূণদিগের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় ৪৮৪ হইতে ৫৬০ অব্দের মধ্যে; অর্থাৎ ইরাণের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ৮০ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে হূণরা ব্যাকট্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাসানীয় সম্রাট ২য় এজাদগার্দের এক পুত্র ফিরোজ হূণদের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসন অধিকার করিবার পরে পুরস্কারের পরিমাণ লইয়া বিবাদ বাধিয়া যায়। লড়াইতে ফিরোজ নিহত হন। হূণ বাহিনী ইরাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিপর্যয় বাধাইয়া দেয়। কারেন বংশের জরমিহ্‌র হূণদিগের দাবী মিটাইয়া রাজ্যে শান্তি ফিরাইয়া আনেন। ইহার পর ফিরোজের পুত্র ১ম কবধ অসন্তুষ্ট সামন্ত ও পুরোহিত গোষ্ঠীর দ্বারা রাজ্যচ্যুত হইলে হূণদের সাহায্যে রাজ্য পুনরধিকার করেন (খ্রীষ্টীয় ৪৯৬)।

এই সাসানীয় সম্রাট ১ম কবধের সম্বন্ধে একটা কৌতুকজনক বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখনকার ভাষায় ইনি একজন সাম্যবাদী ছিলেন।

মাজদাক নামে এক ব্যক্তি একটি নূতন মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং কবধ তাঁহার উৎসাহদাতা ছিলেন এই নূতন মত "demanded in the name of justice that he who had a superfluity of goods and wives should impart to those who had none". এই নূতন মত অনুসারে কাজও আরম্ভ হয়। অভিজাত সম্প্রদায় ও পুরোহিত গোষ্ঠীর সহিত বিবাদ আরম্ভ হয় এই নূতন মত লইয়া। রাজ্যচ্যুত হইয়া সম্ভবতঃ সাম্যবাদী সম্রাটের মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কারণ তাঁহার অনুমতি অনুসারে তাঁহার পুত্র (খসরু অনোসর্বান, ৫১৩-৫৭) মাজ্‌দাকের ক্রমবর্ধমান অনুচরমণ্ডলীকে একবারে উৎসাদিত করিয়া দেন।

খসরু হূণদের হাত হইতে ব্যাকৃট্রিয়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন (খ্রীষ্টীয় ৫৬০)। ব্যাকৃট্রিয়ার উত্তরে তাহাদের রাজ্য তুর্কীরা অধিকার করিয়াছিল। ইহার পরে ইরাণের ইতিহাসে হূণদের তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পূর্ব য়ুরোপে হূণদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় ৩৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ইহার পূর্বে তাহারা কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরের অঞ্চলে এবং ভল্‌গা ও ডন নদীর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে বালামির নেতৃত্বে তাহারা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। ভিসি ভিসিগথ, গথ ও বাইজানটাইন সম্রাটদিগের সঙ্গে তাহাদের ক্রমাগত সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে। আটিলার প্রতাপে বাইজানটাইন সম্রাট হূণ প্রধানকে বার্ষিক কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে আটিলার মৃত্যুর পর পূর্ব য়ুরোপে হূণ প্রভাব নষ্ট হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই প্রভাব ৮০ বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই।

ভারতবর্ষ, ইরাণ ও পূর্ব-য়ুরোপ, এই তিন অঞ্চলেই হূণ প্রভাব ৭০ হইতে ৮০ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। এই তথ্যটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

আটিলার মৃত্যুর পরে হূণদের কয়েকটি দল সাভিয়া, মোলডেভিয়া ও ওয়ালেশিয়ায় বসবাস করিতে আরম্ভ করে। প্রধান দল উরল অঞ্চলে তাহাদের পূর্ব বাসভূমিতে ফিরিয়া যায়। বুলগারি নামে ইহারা এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করে ও শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। আবরদের হাতে এই রাজ্য ধ্বংস হয়। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি বুলগারি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই সময়ে তাহারা খাজারদিগের সম্পর্কে আসে।

ভারতবর্ষ, ইরাণ ও পূর্ব য়ুরোপে হূণদের কার্যকলাপের যে বিবরণ দেওয়া হইল দেখা যাইবে যে, De Guignes-এর বর্ণিত চীনের প্রাচীর হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হূণ সাম্রাজ্য খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর শেষভাগে ধ্বংস হইবার কাহিনীর সঙ্গে ইহা মিলে না। ভারতবর্ষ ও ইরাণে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে তাহাদের তৎপরতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই জন্য সন্দেহ হয় যে, চীনা ইতিহাসের য়িয়ুচী বিজয়ী হিয়েঙ-নু ও ৫ম শতাব্দীর এই হূণ এক জাতি নহে। এই বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য আরও কয়েকটি জাতির কথা বলিতে হইতেছে। এই জাতিগুলির নাম ছোট য়িয়ুচী বা কিদারাইট, য়ুয়ান-যুয়ান, তুকিউ। আবর ও খাজারদের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইবে।

য়িয়ুচীরা কানসু হইতে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার সময়ে তাহাদের কয়েকটি দল পূর্ব তুর্কীস্তানের দক্ষিণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথম দিক (কোন কোন মতে ৪র্থ শতাব্দীর ৩য় ভাগ) পর্যন্ত তাহারা এই অঞ্চলে থাকিয়া যায়। এই সময়ে য়ুয়ান-য়ুয়ান জাতি তাহাদের আক্রমণ করে। তাহারা পামীর অতিক্রম করিয়া কাবুল ও ব্যাকট্রিয়ায় প্রবেশ করে। য়ুয়ান য়ুয়ান জাতির নাম হইতে অনুমান করা হইয়াছে, ইহারা মোঙ্গোল গোষ্ঠীর লোক। ইহারা তিয়েনশান পর্বতের দক্ষিণ অঞ্চলে বাস করিত। তুকিউ জাতিও তাহাদের অধীনে এই অঞ্চলে বাস করিত।

য়ুয়ান-য়ুয়ানগণ ব্যাকট্রিয়া হইতে ছোট য়িয়ুচীদলের প্রধান কিদারদিগকে (চীনা নাম কি-তো-লো) কাবুলে বিতাড়িত করে। কাবুল হইতে ইহাদের একটি দল গান্ধারে আসিয়া সেখানে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। একটি মত অনুসারে শ্বেত হূণ জাতি যখন ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে অক্সাস অতিক্রম করে তখন তাহারা ব্যাকট্রিয়ায় য়ুয়ান-য়ুয়ানদিগকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায়। অন্য একটি মত অনুসারে হূণ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া য়ুয়ান-য়ুয়ান জাতি অক্সাসের উত্তরে আপনাদিগের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহাদের সাম্রাজ্যও হূণ সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।

তুকিউ জাতি—৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (খ্রীষ্টীয় ৫৫২) য়ুয়ান-য়ুয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া তুকিউ জাতি এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে।

De. Guignes-এর মতে এই তুকিউ জাতিই তুর্ক জাতি। তুকিউ সম্রাট খাকান বা ইলিখান নামে পরিচিত ছিলেন। খাকান সিঞ্জিবু অক্‌সাসের পূর্ব ও উত্তরের অঞ্চল অধিকার করেন এবং সাসানীয় সম্রাট খসরু ব্যাক্‌ট্রিয়া দখল করেন। অক্‌সাস নদী ইরাণ ও তুরাণের সীমা নির্দেশক হইয়া দাঁড়ায়।

এই তুকিউ (চীনা নাম) জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই সম্বন্ধে অনেক রকম মত প্রচলিত আছে। একটি মত অনুসারে তাহারা আসোনা হূণদের বা হিয়েঙ-নুদের একটি শাখা। অন্য মত অনুসারে তাহারা কারলুক (তুর্ক গোষ্ঠীয়)। তৃতীয় মত অনুসারে তাহারা প্রাচীন উইগুর জাতি, হুই-খে, হোয়া-হো বা খোই-খু, এই সকল নামে চীনা ইতিহাসে পরিচিত ছিল। একজন পণ্ডিত এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই উইগুর বা হুই-খে জাতির দুইটি শাখা ছিল। দক্ষিণ শাখা চীনের কাওচাংয়ে বাস করিত। ইহাদের অন্য নাম কাশান বা কুশান কাওচাং হইতে আসিয়াছে। কাশান বা কুশান যে য়িয়ুচী গোষ্ঠীর একটি নাম উপরে তাহা বলা হইয়াছে। তিয়েনশান পর্বতশ্রেণীর পূর্ব ও দক্ষিণ হইতে পামীর ও য়ুয়েন-লুন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাহারা বাস করিত।

আবর জাতি—আবর জাতি য়ুয়ান-য়ুয়ানদের সহিত সম্পর্কিত বা তাহাদের একটি শাখা। কেহ কেহ বলেন যে, মধ্য এশিয়ায় য়ুয়ান-য়ুয়ান জাতি পূর্ব য়ুরোপে আবর নামে পরিচিত। পূর্ব য়ুরোপে আবর জাতির তৎপরতা প্রকাশ পাইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ৬৯ শতাব্দীতে। আবরদের পশ্চাদানুসরণ করিয়া তুর্কী জাতি পূর্ব য়ুরোপে অগ্রসর হয়, ক্রিমিয়ান বসফোরাস অধিকার করে ও হেপথালাইট হূণ জাতি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

খাজার জাতি—কেহ কেহ খাজারদিগকে শ্বেত হূণদের সহিত সম্পর্কিত বলিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাদিগকে উগ্রিয়ান বা তুর্কী গোষ্ঠীয় বলিয়া মনে করেন। কোন কোন মতে, তাহারা বর্তমান কালের জর্জিয়ার অধিবাসীদিগের পূর্ব পুরুষ। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কাম্পিয়ান সাগর খাজার সাগর নামে পরিচিত ছিল। সে যাহা হউক, অতি প্রাচীনকাল হইতে খাজারগণ আর্মেনিয়া, ইরাণ ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত। পূর্ব য়ুরোপে হূণ, আবর সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পরে খাজারদিগের অভ্যুদয় ঘটে (খ্রীঃ ৭০০-৯৫০)। মধ্যযুগের ইরাণের সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া

শাহনামায় উত্তরের সকল গোষ্ঠীর যাযাবর আক্রমণকারী জাতিকে নির্বিচারে খাজার নাম দেওয়া হইয়াছে।

উপরের বিবরণে শক, য়িয়ুচী ও হূণদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দেওয়া হয় নাই। এই সুদীর্ঘ বিবরণ দিবার উদ্দেশ্য, সিথিয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলির সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়া। এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় হইতে দেখা যাইতেছে যে, য়ুরোপের কার্পেথিয়ান পর্বতশ্রেণী হইতে উত্তর-পশ্চিম চীন ও মোঙ্গোলিয়া পর্যন্ত পশ্চিম হইতে পূর্বে এবং সাইবেরিয়ার দক্ষিণ হইতে এশিয়ার কেন্দ্রীয় পর্বতবলয়ের উত্তর পাদভূমি পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাচীন যুগের ও খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত পরিচিত অধিবাসী জাতিগুলিকে সিথিয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে। এই জাতিগুলি প্রধানতঃ তুর্ক-মোঙ্গল গোষ্ঠীর লোক। তারপর দেখা যাইতেছে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত চীন, পূর্বয়ুরোপ, ইরাণ, ব্যাকট্রিয়া, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ইহাদের তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সিথিয়ান নামে অভিহিত শক, য়িয়ুচী ও হূণদিগের তৎপরতার কাল। ইহার পরে তাহাদের আর কোন উল্লেখ নাই, ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই, আফগানিস্তান, ইরাণ ও পূর্ব য়ুরোপের ইতিহাসেও নাই।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে, এই তিনটি জাতির বৃহত্তর কার্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের বাহিরে। একটি জাতি আর একটি জাতির চাপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিতে ও বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়; ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাদের কেহই সরাসরি অভিযান করে নাই। এই তিনটি জাতির মধ্যে হূণ জাতির অধিকাংশ দল পশ্চিমদিকে চলিয়া যায়। কাস্পিয়ানের উত্তর হইতে বল্‌কান পর্যন্ত অঞ্চল তাহাদের এক শতাব্দীব্যাপী কর্মক্ষেত্র ছিল। আটিলার মৃত্যুর পর ছত্রভঙ্গ হইবার পরেও তাহারা কাস্পিয়ানের পূর্বে আর ফিরে নাই। য়িয়ুচীদের একটি অংশ ট্রান্স-অক্সিয়ানা, ব্যাকট্রিয়া ও কাবুলে এক শতাব্দী কাটাইয়া ভারতবর্ষের উত্তর সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে। শক জাতি সগ্‌ডিয়ানা, ব্যাকট্রিয়া, কাবুল ও হেলমণ্ড উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়ে। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী (৫০) পর্যন্ত

ইরাণের ইতিহাসের সঙ্গে তাহাদের যোগ রহিয়াছে। ইহাদের একটি দল ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল।

সিথিয়ান জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়—গ্রীক ইতিহাসের বিবরণে খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী হইতে যে সিথিয়ান জাতির পরিচয় পাওয়া যায় প্রথমে তাহাদের কথা বলা হইতেছে।

খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীকরা কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ঔপনিবেশিকেরা ছিল ব্যবসায়ী। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তাহারা নিয়মিত বাণিজ্য করিত। এই বাণিজ্যপথের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে: তানাইস বা ডন নদী হইতে উত্তর-পূর্বের প্রান্তরভূমিতে ১৫ দিনের পথ পর্যন্ত সারমাসিয়ানদের অধিকৃত এলাকা। তারপর ভল্‌গা অঞ্চলে বুদিনীদের দেশ। এই অঞ্চলে গ্রীক বাণিজ্য কেন্দ্র গেলোনাস অবস্থিত। এখান হইতে সাত দিন মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিলে থিসাজেইটদের দেশ। ইহার পর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলিয়া বন ও মরুভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্টোরিয়ায়দের দেশ। ইহার পর ওরেনবার্গের নিকটে উরাল নদী অতিক্রম করিবার পর উহার শাখা ইলেক নদীর গতি অনুসরণ করিয়া মুগোয়ার পর্বতশ্রেণী পার হইলে পুনরায় প্রান্তরভূমিতে পৌছানো যায়। এখান হইতে সির দরিয়া ও আমু দরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল সিথিয়ানদের অধিকৃত।

এই অঞ্চলের সিথিয়ানরা য়ুরোপের সিথিয়ানদের শাখা। অনুমান করা হইয়াছে খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর কয়েক শতাব্দী পূর্বে পূর্ব-য়ুরোপের সিথিয়ান জাতি পূর্ব-তুর্কীস্তান হইতে বিতাড়িত হইয়া ক্রিমিয়া অঞ্চলে প্রবেশ করে ও কিমেরিয়ানদের বিতাড়িত করিয়া সেখানে বাস করিতে থাকে। এই সিথিয়ান জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করা হইতেছে: "The whole steppelands from the Oxus and the Jaxartes to the Hungarian pusztas seem to have been held at an early date by a chain of Aryan nomad races". সারমাসিয়ানরা ভাষায় ও কৃষ্টিতে সিথিয়ান ছিল। প্লিনির মতে, তাহারা মীড জাতির শাখা। নীপার ও ডোকযাক নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের কুরগান নামে পরিচিত সমাধিস্তূপগুলি সিথিয়ান রাজাদের সমাধি। Zenas-এর মতে সিথিয়ানরাও জাতিতে আর্য ও

ইরাণী জাতির সহিত সম্পর্কিত ছিল ("From the remains of the Scythian language Zeuss came to the conclusion that the Scythians were Aryans and nearly akin to the settled Iranians.")। তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের দেবদেবী আর্য জাতির দেবদেবীর সহিত এক গোত্রীয় বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন ঐতিহাসিকদের উল্লেখিত এই যাযাবর আর্য জাতির নীপার উপত্যকার কুরগান বা সমাধিস্তূপ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

এখানে Aryan nomad races বলিতে ঐতিহাসিকেরা Iranian nomad races বুঝাইতে চাহিয়াছেন, অর্থাৎ এই সকল যাযাবর জাতি যাহাদিগকে সিথিয়ান বলা হয়, তাহারা ইরাণী গোষ্ঠীভুক্ত এবং তাহাদের ভাষাও ইরাণী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ইরাণ, আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়ার মালভূমির আদিম অধিবাসীরা মূলে একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, ইহাই নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের অভিমত। ইরাণের মালভূমি পূর্বে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইরাণের উত্তরে বর্তমান বোখারা, মার্ভ, খিবা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকালে ইরাণী গোষ্ঠীর লোক বাস করিত। পরবর্তী কালে তুর্ক-মোঙ্গল গোষ্ঠীর জাতিসমূহ এই সকল অঞ্চল অধিকার করিয়াছে। ইরাণী মালভূমির পূর্বাংশ প্রাচীনকালে (আবেস্তার রচনাকালে) আইরিযানা বা আরিয়া বা আর্যদের দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল।

পূর্ব-য়ুরোপের সিথিয়ান জাতির আদিবাস ছিল পূর্ব-তুর্কীস্তানে, পণ্ডিতদের এই মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই অনুমান করিতে হয় যে, ইরাণী বা আর্য গোষ্ঠীর লোকেরা পূর্ব-তুর্কীস্তান হইতে পূর্ব-য়ুরোপে অভিযান করিয়াছিল।

প্রচলিত য়ুরোপীয় আর্যবাদ ইহার বিপরীত কথা বলে। য়ুরোপীয় আর্যবাদ অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপ হইতে আর্য জাতি ইরাণের উত্তরে উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে এক শাখা ইরাণে ও অন্য শাখা ভারতবর্ষের দিকে চলিয়া যায়। এই মতের কোন কোন সমর্থক প্রমাণ হিসাবে কুরগান বা সমাধিস্তূপে প্রাপ্ত নিদর্শন-সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন—"In the Kurgans of southern Russia···skeletons conforming to *this type* have been found together with evidence of horse-sacrifice." *

---

* বিরজাশঙ্কর গুহ "*Racial Elements of the Population of India.*"

"This type" মানে লম্বামুণ্ড আর্য জাতির টাইপ। কিন্তু সমাধিস্তূপের কঙ্কালগুলি আসলে সিথিয়ান রাজাদের। আর অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রমাণ হিসাবে যে অশ্বমুণ্ড প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা সিথিয়ান রাজাদের প্রিয় বাহন অশ্বের মুণ্ড। সিথিয়ান রাজাদিগের সমাহিত করিবার সময়ে তাহাদের প্রিয় অশ্ব, ব্যবহৃত তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অনুচর ও রাণীদিগকে এক সঙ্গে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা ছিল।

শক, য়িয়ুচী, হিয়েঙ-নু—পূর্ব-য়ুরোপের সিথিয়ান ছাড়িয়া শক, য়িয়ুচী ও হিয়েঙ-নুদের কথায় আসা যাউক।

শক ও দাহীদিগের পরিচয়প্রসঙ্গে Prof. Noldeke ও Prof. Gut-chmid বলিতেছেন—"They belonged to the nomads of Iranian kin, who in antiquity were widely spread from the Jaxartes as far as the steppes of South Russia"। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেডনের মত অনুরূপ। তাঁহার মতে, শকদের বর্তমান বংশধর বাল্টি জাতি ("The Sakas are indentified with the Sacae, whose modern desendants seem to be the Balti".)। প্রোটো-নর্ডিক থিওরীর প্রচারক ডাঃ হেডন বলেন শক জাতির প্রধানগণ ছিল প্রোটো-নর্ডিক। বাল্টি জাতির সম্বন্ধে তিনি আরও বলিতেছেন যে, তাহারা রাজপুত, শিখ, কাশ্মিরী প্রভৃতি জাতির মত ইন্দো-আফগান গোষ্ঠীভুক্ত। বাল্টি জাতি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বাল্টিস্তানের অধিবাসী। বাল্টিস্তান ছোট তিব্বত নামে পরিচিত এবং বাল্টি ও লাডাকী উভয়েই ভোট জাতি বা তিব্বতী। বাল্টিস্তানের ব্রুকপা জাতি দরদ গোষ্ঠীয়। ডাঃ হেডন বাল্টিদের পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ রাখেন না বলিয়া মনে হয়। রাজপুত, জাঠ, গুজর প্রভৃতি জাতি হূণ গোষ্ঠীভুক্ত, এই মতের প্রতিবাদ করিয়া তিনি অন্যত্র বলিতেছেন যে, এই সকল জাতির মধ্যে হূণ সংমিশ্রণ থাকিলে ইহাদের সকলের মধ্যে যে একটি সাধারণ টাইপ, সেই টাইপের পরিবর্তন হইত, মাত্র শক সংমিশ্রণের ফলে টাইপের বিশেষ পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা ছিল না ("Only the Saka could have mixed with them without seriously modifying the 'original' type, if such a type existed.")। এখানেও দেখা যাইতেছে ডাঃ হেডনের মতে, শক জাতির টাইপ আর্য টাইপের কতকটা অনুরূপ ছিল। বেহিস্তনের পর্বতগাত্রে আঁকামনি আমলের শিলালিপি-

প্রসিদ্ধ। লিপির সঙ্গে কতকগুলি মনুষ্য মূর্তিও আছে। একটি মনুষ্য মূর্তির নীচে শকুক নাম দেখা যায়। এই মূর্তিটিকে কোন শকের প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী উজ্‌ফালভীর মতে, মূর্তির মুখে আর্য ও মোঙ্গল জাতির সংমিশ্রণ আছে বলিয়া মনে হয়।

য়িয়ুচী জাতি যে ব্যাকৃট্রিয়া ও বোখারার পশ্চিমে কখনও গিয়াছিল তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। একটি মত অনুসারে তাহারা তিব্বতীদের সমগোষ্ঠীয়, "a nomad people akin to the Tibetans who lived at first between Ten-huang and Tienshan mountains"। এই মতে য়িয়ুচী হইতেছে প্রধান দলের নাম; জাতির নাম তোখারী। দ্বিতীয় মতানুসারে য়িয়ুচীরা তুর্কী গোষ্ঠীভুক্ত; কুশান বা কাশান একটি দলের নাম। তৃতীয় মতানুসারে তাহারা হুই-খে বা উইগুর জাতির দক্ষিণ শাখাভুক্ত। এই মতে তাহাদিগকে তুকিউ বা তুর্ক গোষ্ঠীর লোকের সহিত সম্পর্কিত দেখা যাইতেছে। Stein Konow-এর মতে য়িয়ুচীরা গ্রীক ঐতিহাসিকদের Asii ও তোখারী এবং চীনা ইতিহাসের তা-হিয়া। কিন্তু বহু পণ্ডিতের মতে, চীনা ইতিহাসের তা-হিয়া হইতেছে তাজিক ও তোখারী তু-হি-লো।

তোখারী নাম যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখিত তুষার ও তুখার, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষা-বিজ্ঞানীরা এই তোখারী জাতি কোন্ গোষ্ঠী ভুক্ত সে সম্বন্ধে একটা নূতন সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রসিদ্ধ খোটান ও কুচা হইতে কতকগুলি প্রাচীন লেখন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, খোটান ও কুচায় যে ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহার সহিত প্রাচীন ইরাণীয় বা ভারতীয় ভাষা (ইন্দো-এরিয়ান) অপেক্ষা য়ুরোপীয় বা সেন্টুম্ গোষ্ঠীর (ইন্দো-য়ুরোপীয়) ভাষার বিশেষ করিয়া ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর ইটালো-কেল্টিক শাখার সঙ্গে সম্পর্ক দেখা যায়। এই মতের প্রধান প্রচারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভী। তিনি এই ভাষার নাম দিয়াছেন তোখারীয়ান। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুমান করিতে হয়, পূর্ব-তুর্কীস্থানের যে জাতি ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করিত তাহারা তুর্কী গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারে না।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুচায় ব্যবহৃত ভাষা তোখারীয়ান ইন্দো-য়ুরোপীয়ান ভাষা গোষ্ঠী ভুক্ত এই কথা মানিয়া লইলেও খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে যে কুশান, য়িয়ুচী বা তোখারী ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ও খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত যে তোখারী (তু-হি-লো) বাদাকশানে রাজত্ব করিয়াছিল তাহারা যে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাভাষী ছিল তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষভাগে হিয়েঙ-নু জাতি মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে য়ুয়ান-য়ুয়ান জাতি মধ্য এশিয়ার তোখারী সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী শ্বেত হুণ জাতি মধ্য এশিয়ায় প্রবল হয় এবং খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তুকিউ জাতি অক্সাসের পূর্ব তীর হইতে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে। পর পর এই বিপ্লবের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুচায় কি ভাবে ধর্মে, সংস্কৃতিতে, আচারে, নামে ভারতীয়, ভারতীয় ব্রাহ্মী (ও খরোষ্ঠী) লিপি ব্যবহারকারী উইগুর বা তোখারী গোষ্ঠীর মধ্যে ইন্দো য়ুরোপীয় ভাষাভাষী একটি জাতির আবির্ভাব হইল তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে পূর্ব-তুর্কীস্তানের আদিবাসী একটি শ্বেত জাতির কথা উঠিয়াছে।

স্যর অরেল ষ্টাইন কর্তৃক পূর্ব-তুর্কীস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ আবিষ্কারের ফলে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাকলা মাকান ও লব নর মরুভূমির শহরগুলির অধিবাসী আর্য টাইপের ছিল, এবং ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে ইহাদের যোগাযোগ ছিল। ইহারা পামীরী-ইরাণো অর্থাৎ গোলমুণ্ড জাতি। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে, এই টাইপ চীনের হোনান ও মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আর একটি প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী উজ্ফালভী জুঙ্গেরিয়ার (মোঙ্গলিয়ার পশ্চিমে ও তিয়েনশান পর্বতশ্রেণীর উত্তরে) অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, মোঙ্গলিয়ান ও আলতাইক ছাড়া অন্য একটি টাইপের সংমিশ্রণ ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে, একটি আদিবাসী শ্বেত জাতির সঙ্গে শক, য়িয়ুচী, হিয়েঙ-নু ও উইগুর জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। শক, য়িয়ুচী, হিয়েঙ-নু ও উইগুর জাতি তাঁহার মতে, পীত গোষ্ঠীর জাতি। এই আদিবাসী শ্বেত জাতি কাহারা ছিল তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী জিউক্রিদা রুগ্গেরী।

তাঁহার মতে, পূর্ব-তুর্কীস্তানের তোখারী ভাষাভাষী জাতি এই আদিবাসী শ্বেত জাতি। তুর্কীস্তানের এই তোখারী ভাষার সঙ্গে এশিয়া মাইনরের হিটাইট ভাষার সম্পর্ক বাহির হইয়াছে। অর্থাৎ এই ভাষা ইন্দো-এরিয়ান বা satem ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা নহে, ইন্দো-য়ুরোপীয়ান centum ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা। জিউক্রিদা রুগ্‌গেরী এই শ্বেত জাতির নাম দিয়াছেন Aryan Leucoderm- of the Desert of Takla Makan (Language, Tokhari)।

এই ভাবে তোখারী ভাষা হইতে আর্য গোষ্ঠীর পূর্ব-তুর্কীস্তানের অধিবাসী একটি পৃথক শাখার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই গোষ্ঠীকে আর্য বলা হইতেছে কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাওয়া কঠিন। কঠিন, কারণ য়ুরোপীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের আর্য জাতি ভাষা-বিজ্ঞানীদের নিকটে ধার করা একটা কল্পিত জাতি, যাহাকে বাস্তবরূপ দিবার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ায় স্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। এখানে শুধু এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে যে, পূর্ব-তুর্কীস্তানের তোখারী জাতিকে ইরাণ ও ভারতবর্ষের আর্য জাতি হইতে পৃথক একটি আর্য জাতি বলা হইতেছে ভাষার কথা তুলিয়া এবং এ কথাও বলা হইতেছে যে এই জাতির সঙ্গে পূর্ব তুর্কীস্তান হইতে বহুদূরে অবস্থিত এশিয়া মাইনরের লুপ্ত হিটাইট জাতির যতটা সম্পর্ক আছে ককেশাস হইতে আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের আর্য জাতির সঙ্গে ততটা সম্পর্ক নাই।

ভারতবর্ষে তোখারী বা য়িয়ুচী শক্তি বিলুপ্ত হইবার পরে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত কাবুল ও বাদাকশানে তোখারী রাজ্য বর্তমান ছিল এবং বাদাকশান তোখারীস্তান বলিয়া পরিচিত ছিল। কাবুলের এই তোখারী রাজাদিগকে সাধারণ ইতিহাসের পুস্তকে তুর্কী শাহী বংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের য়িয়ুচী আক্রমণকারীরা কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে, আর্যগোষ্ঠীর হইলেও সাধারণতঃ সিথিয়ান বলিয়া বর্ণিত।

এখন হূণ জাতির কথায় আসা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে হূণ আক্রমণকারীদের আগমনের সময় হইতেছে খ্রীষ্টীয় ৪৫৫ অব্দ, কোন কোন মতে ৪৬৮ অব্দ। চীনা ইতিহাসের বাহিরে হিয়েঙ-নুদের উল্লেখ দেখা যায় না। De Guignes-এর মত মানিয়া লইলে অনুমান করিতে হয়, হিয়েঙ-নু সাম্রাজ্য

ধ্বংসের পরে তাহাদের কতকগুলি দল উরাল অঞ্চলের দিকে প্রস্থান করিয়াছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে য়ুরোপে হূণ জাতির তৎপরতার কাল খ্রীষ্টীয় ৩৭২ অব্দ। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে ভারত সীমান্তে হূণদের আবির্ভাব হয়। সঠিক বিবরণের অভাবে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন, মধ্য এশিয়ার হূণ জাতি দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল ভল্‌গা ও অপর দল অক্‌সাস অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু কাস্পিয়ান অঞ্চলে হূণ জাতি খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় (Dionysius Periegetes খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দ)। সুতরাং একই সময়ে দুই দলের ভল্‌গা ও অকসাস অভিমুখে অভিযান করিবার কাহিনী অগ্রাহ্য করিতে হয়।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তুর্কিউ জাতি যে সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল তাহা হূণ সাম্রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা আলতাই অঞ্চলের য়ুযান-য়ুযান জাতির প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য। ভিনসেন্ট স্মিথ অনুমান করিয়াছেন যে, ব্যাক্‌ট্রিয়া ও কাবুল উপত্যকায় যে হূণ জাতি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ও যাহারা শ্বেত হূণ নামে পরিচিত তাহারা সম্ভবতঃ পূর্ব-য়ুরোপের হূণ জাতি হইতে ভিন্ন জাতি ছিল। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত বৈদেশিক জাতিমাত্রকেই হূণ বলিযা বর্ণনা করা হইয়াছে এককালে যেমন যবন শব্দ ব্যবহৃত হইত। এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না; কারণ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যবন পারশীক, পহ্লব, শক, তোখারী বা তুষার, হূণ, হার হূণ প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হূণ নামটি জাতিবাচক নহে, উহা রাজনৈতিক ও সমষ্টিগত অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। হূণ বলিতে এপথালাইট, আবর, বুলগার, খাকিয়ার, খাজার ও পেচেনেগ বুঝায়। যে সকল জাতির নাম করা হইল তাহাদের মধ্যে শুধু এপথালাইটরা ভারতবর্ষে পরিচিত এবং এই এপথালাইটরা যে য়ুয়ান-য়ুয়ান জাতি, ইতিহাসের বিবরণ হইতে তাহা অনুমান করা চলে। এই এপথালাইটরা চীনা ইতিহাসে হোয়া নামে পরিচিত।

য়ুয়ান-য়ুয়ান জাতি সম্বন্ধে ডাঃ হেডন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,— "A mixed people probably partly Sienpi (অর্থাৎ তুঙ্গুজ) attained to power at the close of the 4th century by the subjugation of the Altai tribes and extended their power over Mongolia as far

as Korea.” এই জাতি সম্বন্ধে আরও জানা যায় যে, তাহাদের দ্বিতীয় সম্রাটের নাম হইতে তাতার নামটি আসিয়াছে। এই নামটি পরে মোঙ্গলদের সম্বন্ধে তাহাদের পশ্চিম অঞ্চলের জাতিরা করিত। তারপর য়ুরোপীয়দের দ্বারা ইহা তুর্কী ও মিশ্র মোঙ্গল-তুর্কী জাতীয় লোকের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

হূণ-জাতি সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের মতের আর অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক। উপরের আলোচনা হইতে এই পর্যন্ত নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের আক্রমণকারী হূণ জাতির সঙ্গে চীনা ইতিহাসের হিয়েঙ-নু ও পূর্ব য়ুরোপের হূণ জাতির সম্পর্ক দূর এবং তাহারা সম্ভবতঃ চীনা ইতিহাসের হোয়া (য়ুয়ান-য়ুয়ান) জাতি। আরও জানা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই হূণ জাতি তুর্ক ও মোঙ্গল (উরাল-আলতাইক) গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। তাহাদের আদি বাসভূমি মোঙ্গলিয়া, কোকনর বা আলতাই অঞ্চল যেখানেই হউক, তাহারা সির দরিয়ার উত্তরের সমতলভূমি হইতে ব্যাক্‌ট্রিয়া ও কাবুলে ছড়াইয়া পড়ে এবং কাবুল হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে। তুর্ক-মোঙ্গল গোষ্ঠীর এই জাতি সম্বন্ধে শক, য়িয়ুচী ও তোখারী বা তুষারদের মত কোন “আর্য” সম্পর্কের কথা উঠে নাই। শক ও য়িয়ুচীদের টাইপ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু হূণদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন না। কিন্তু দেখা যায় যে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা এই জাতিকেই সিথিয়ান', এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে শক, য়িয়ুচী ও হূণ জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত যে সকল মতের আলোচনা করা হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

খ্রীঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীতে শক জাতি কাফিরীস্তান, কাবুল, গান্ধার ও সম্ভবতঃ হাজারায় গ্রীক আধিপত্য ধ্বংস করে। তাহারা কাবুল হইতে গান্ধার ও হেলমন্দ উপত্যকা বা সিস্টান (শকস্তান) হইতে সিন্ধুদেশে প্রবেশ করে। চীনা ঐতিহাসিকের মতে, কাশ্মীরও তাহাদের অধিকারে আসিয়াছিল। টলেমীর মতে পাতালেন (সিন্ধু নদের ব-দ্বীপ), আভীরিয়া (পশ্চিম ভারতের আভীর দেশ) ও সিরাষ্ট্রেন বা কাথিয়াবাড়ে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে শকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ কয়েকটি অঞ্চলের ইতিহাসের বিষয়। এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে পাওয়া যায় তক্ষশীলা ও মথুরার শক রাজবংশের কথা, দ্বিতীয় ভাগে পাওয়া যায় নাসিক ও উজ্জয়িনীর শক রাজবংশের কথা। প্রথম ভাগের ইতিহাসে ছেদ পড়ে খ্রীঃ পূঃ ৫৮ সনে শকারি বিক্রমাদিত্যের বিজয়ের ফলে, দ্বিতীয় ভাগে ছেদ পড়ে খ্রীষ্টীয় ১২৬ ও ৩৮৮ সনে গৌতমীপুত্র শ্রীশাতকর্ণি ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেব বিজয়ের ফলে। নাসিক ও উজ্জয়িনীর রাজবংশ খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পবে স্থাপিত হইয়াছিল। তক্ষশীলা ও মথুরার শক রাজত্ব এক শতাব্দী স্থায়ী হইয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরে শকদের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রথম দফায় যে সকল দল কাবুল হইতে গান্ধার ও মথুরা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের আধিপত্য খ্রীঃ পূঃ ৫৮ সনেব মধ্যে শেষ হইয়াছিল। ইহার পরে সিষ্টান (বা শকস্তান) হইতে যে সকল দল সিন্ধুদেশে ও পশ্চিম উপকূল বাহিয়া কচ্ছ, গুজবাট, মহারাষ্ট্র ও মালবে প্রবেশ করে তাহাদের বাজনৈতিক প্রভাব খ্রীষ্টীয় ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। মহাভারত বচনার সময়ে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে তাহারা এ দেশে বাস করিত ঐ মহাকাব্য হইতে জানা যায়।

যিয়ুচী (কুশান, তোখারী, তুষার) সম্ভবতঃ ১২০ বৎসরের অনধিককাল ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং এই ক্ষমতা প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম কুশান সম্রাট কাডফাসিস সিন্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চলে গান্ধার হইতে কাবুল পর্যন্ত এলাকায় গ্রীক ও পার্থিয়ান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে বিতাড়িত করেন। দ্বিতীয় কাডফাসিস ও কনিষ্কের আমলে পাঞ্জাবে কুশান শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কনিষ্কের সময়ে সম্ভবতঃ বিন্ধ্য পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূ‌র্ত হয়। কাশ্মীরও সাম্রাজ্যেব অন্তর্ভূ‌র্ত ছিল। কনিষ্কের পরে ভারতবর্ষে কুশান শক্তি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, অনুমান করা হয়।

ভারতবর্ষে হূণ প্রভাব ৬০ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। যিয়ুচী বা কুশান গোষ্ঠীর কিদারাইটগণ খ্রীষ্টীয় ৪৫২ অব্দে গান্ধারে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৪৫৫ হইতে ৪৬৮ অব্দের মধ্যে স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে যে দুইটি হূণ

আক্রমণ ঘটে বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ উহা কিদারাইট, হূণ প্রভৃতির মিলিত আক্রমণ। খ্রীষ্টীয় ৪৭০ অব্দের দিকে আক্রমণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিরোধ শক্তি পর্যুদস্ত করিয়া আক্রমণকারীরা দেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়। খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দে দেখা যায় আক্রমণকারী দলের নেতা তোরমান মালবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গান্ধার, পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও মধ্যভারতের অংশ হূণদের অধিকারে আসিয়াছিল, এই রূপ অনুমান করা হয়। ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তোরমানের পুত্র মিহিরগুল রাজা হইয়া পাঞ্জাবের সাকালায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পর মালবের যশোধর্মণ ও মগধের নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য মিহিরগুলকে পরাজিত করিয়া দেশের অভ্যন্তর ভাগে হূণশক্তি ধ্বংস করিয়া দেন (৫২৮ খ্রীঃ অঃ)। এই পরাজয়ের পরে কাশ্মীর ও গান্ধারে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে মিহিরগুল মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ ইহার পরেও সীমান্ত অঞ্চলে হূণদের ছোট ছোট উপনিবেশ রহিয়া যায়, হর্ষবর্ধনের সময় পর্যন্ত।

খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর তিন দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষে শক, য়ুয়ুচী ও হূণ জাতির যে কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শকজাতির তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় সিন্ধুদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, পশ্চিম যুক্তপ্রদেশ, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র ও মধ্য ভারতের অংশে। য়ুয়ুচীদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় গান্ধার, পশ্চিম পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশের অংশ এবং কাশ্মীরে। হূণদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় গান্ধার, পশ্চিম পাঞ্জাব, মধ্য ভারতের অংশ, রাজপুতানা এবং কাশ্মীরে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এই বিদেশী গোষ্ঠীগুলির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলির রচনায় বহু গ্রন্থকারের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার ঋণ গ্রন্থের মধ্যে যথারীতি স্বীকার করিতে গেলে অনেকগুলি পৃষ্ঠা যাইত। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের গ্রন্থ ছাড়া ভূগোল, ভূ-বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাসের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কয়েকটি সর্বভারতীয় লোকসংখ্যা গণনার রিপোর্ট, প্রাচীন ইম্পিরীয়াল গেজেটিয়ার (প্রাদেশিক সিরিজ), প্রেসিডেন্সী বিভাগগুলির প্রাচীন জেলা গেজেটিয়ার, জার্ণাল অব দি রয়াল ইনষ্টিটিউট অব এনথোপোলজি, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের বিভিন্ন জার্ণালে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এইগুলি ছাড়া ষ্ট্রাবো, টলেমী, হেরোডোটাস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকের রচনা এবং আরবী ও ফার্শি ভাষায় লিখিত মধ্যযুগের ইতিহাসের কয়েকখানি গ্রন্থ ও সংস্কৃত এবং আবেস্তার ভাষায় লিখিত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

এখানে কয়েকজন গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

A. C. Haddon. Races of Man ; The Wanderings of Peoples. The Study of Man.

Giuffrida-Ruggeri. The First Outlines of a Systematic Anthropology of Asia. Tr. by H. C. Chaklader.

R B. Dixon. The Racial History of Man.

J. Deniker. Les Races et les Peuples de Terre.

G. Sergi The Mediterranean Races.

C E. Ujfalvy. Les Aryans du nord et sud del'Hindoukouch.

Elliot Smith. Migration of Early Cultures.

E. I. Dalton. Descriptive Ethnology of Bengal

H. H. Risley. People of India ; Tribes and Castes of Bengal.

B. S. Guha. Racial Elements in the Population ; An Outline of the Racial Ethnology of India ; Progress of Anthropology in the last twenty-five years in India ; Census of India 1, pt. 3 1935 ; Guha and Sewell, Human Remains discovered by H. Hargreaves at Nal ; Arch. Survey of India, Memoir No. 43 ; Guha and Basu, Further Excavation at Mohenjo Daro by E. Mackay.

R. P. Chanda. The Indo-Aryans ; Survival of the Prehistoric Civilisation of the Indus Valley ; Indus Valley in the Vedic Period.

J. H. Hutton. Census Report of India, 1934 ; Angami and Sema Nagas ; A Negrito substratum in the Population of Assam.

S. C. Roy. The Oraons of Chota Nagpur ; The Mundas and their Country.

Aurel Stein. Jounrney of Exploration in Central Asia ; Ruins of Cathay ; Memoirs of A. S. I. No. 39.

S. C. Das. Narration of the Journey to Lhasa.

B. N. Datta. Races of India (Refs. to the views of E. F. Eickstedt ; Von Luschen ; Eugen Fischer ; P. and F Sarasins ; J. L. de Quatrefages).

J. Biddulph. The Tribes of the Hindookoosh.

T. A. Joyce. Notes on the Physical Anthropology of the Pamirs and Amu Daria Basin. Physical Anthropology of races of Khotan and Keria (Jour, of R. A. I. Vol. LVI : XXX 3)

W. Crooke. Castes and Tribes of N. W. Provinces and Oudh. 4 Vols.

Denzil Ibbetson. Punjab Ethnography.

E. Thurston and K. Rangachari. Castes and Tribes of Southern India. 7 vols.

R. E. Russell and Hiralal. Tribes and Castes of Central India. 4 Vols.

R. E. Enthoven. Tribes and Castes of Bombay.

Denis Bray. Ethnological Survey of Baluchistan.

H. A. Rose. Tribes and Castes of the Punjab and N. W. Frontier Provinces.

L K. Anantha Krishna Iyer and another. The Mysore Tribes and Castes.

E. H. Mann. Aboriginal Inhabitants of the Andaman Islands.

R. Caldwell. A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages.

Grierson. Linguistic Survey of India.

Martin Haug. Essays on the Sacred Language, writings and Religion of the Parsis. Tr E. W. West

A. Cunnigham. Ancient Geography of India.

E. A. Gait. A History of Assam.

V. Smith. Early History of India.

L. A. Waddel. Tribes of Brahmaputra Valley (J. A. S. I. LXIX. pt. 3).

H. Pocker. Ancient Ceylon.

Mirza Md. Haider Dughlat Tarikh-i-Rashidi Tr. by D. Ross.

Cambridge Ancient History. 4 vols.

P. C. Bagchi. Indo-China (Bengali). India and China.

S. Levi. Pre-Aryans and Pre-Dravidians in India Tr. P. C. Bagchi.

Sukumar Basu. Himalaya (Bengali).

R. C. Mazumdar. Ancient Indian Colonies in the Far East. Vols.

N. M. Chaudhuri. The Aryan Theory. The Dravidian Theory. *Science and Culture* (Vol. 6, February and March ; Vol. 13, March.).